ইতিহাস

দ্বি বার্ষিক **সেমেস্টার ভিত্তিক** স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

এম এ তৃতীয় সেমেস্টার

সাধারন নির্বাচিত পাঠ - **৩১০**

COR-310

West Bengal Since 1947

পাঠ সহায়ক গ্রন্থ

Directorate of Open and Distance Learning (DODL),

University of Kalyani,

Kalyani, Nadia.

বিষয় সমিতিঃ

১) শ্রী অলোক কুমার ঘোষ (প্রধান, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়) – সভাপতি।

২) ডঃ সুতপা সেনগুপ্ত (ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)- সদস্য।

৩) অধ্যাপক অনিল কুমার সরকার (ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৪) অধ্যাপক রূপকুমার বর্মণ (ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)- সদস্য।

৫) অধ্যাপক মনশান্ত বিশ্বাস (ইতিহাস বিভাগ, সিধু-কানহু-বিরশা বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৬) শ্রী সুকৃত মুখাজ্জী (চুক্তিভিত্তিক সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৭) শ্রীমতী পুবালি সরকার (চুক্তিভিত্তিক সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৮) অধিকর্তা, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়) - আহ্বায়ক।

- মুদ্রণ জুন ২০২৩ ।
- গ্রন্থটি বিভিন্ন বই ও ইন্টারনেট সূত্র থেকে তথ্য একত্র করে নির্মিত।
- প্রণেতাগণ এর মৌলিকত্ব দাবী করেন না।

Director's Note

Open and Distance Learning (ODL) systems play a threefold role- satisfying distance learners' needs of varying kinds and magnitudes, overcoming the hurdle of distance and reaching the unreached. Nevertheless, this robustness places challenges in front of the ODL systems managers, curriculum designers, Self Learning Materials (SLMs) writers, editors, production professionals and other personnel involved in them. A dedicated team of the University of Kalyani under the leadership of Hon'ble Vice-Chancellor has put its best efforts, professionally and in unison to promote Post Graduate Programmes in distance mode offered by the University of Kalyani. Developing quality printed SLMs for students under DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2020 had been our endeavour and we are happy to have achieved our goal.

Utmost care has been taken to develop the SLMs useful to the learners and to avoid errors as far as possible. Further suggestions from the learners' end would be gracefully admitted and to be appreciated.

During the academic productions of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) Amalendu Bhunia, Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded

directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Due sincere thanks are being expressed to all the Members of PGBOS (DODL), University of Kalyani, Course Writers- who are serving subject experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have been utilized to develop these SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would like to convey thanks to all other University dignitaries and personnel who have been involved either at a conceptual level or at the operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their concerted efforts have culminated in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Date: 24.06.2023

Director
Directorate of Open & Distance Learning
University of Kalyani,
Kalyani, Nadia,
West Bengal

COR-310: West Bengal since 1947

Block- 1: Journey begins

Unit-1: West Bengal during the Chief Ministry of Bidhan Chandra Ray (1948- 1962).

Block 2: Political developments

Unit-2: Political developments till 1977-people in Power, people in Opposition, challenging the Power

Unit-3: The Age of Consolidation of Power, 1977-2011.

Unit-4: Change in Power, 2011-2021.

Block- 3: Economy

Unit-5: Land reforms-agriculture

Unit-6: Trade and industry

Unit-7: Organized & unorganized labour-trade union movement.

Block- 4: Society

Unit-8: Questions of caste, class, gender and religion

Unit-9: The refugee factor

Block- 5: Development of education

Unit-10: School education, higher Education-

Unit-11: Development of science and technology

Unit-12: Public understanding of science.

Unit 6: Culture

Unit-13: Literature

Unit-14: Visual art

Unit-15: Performing art

Unit-16: Sports.

ACKNOWLEDGEMENT

Block- 1: Journey begins Unit-1: West Bengal during the Chief Ministry of Bidhan Chandra Ray (1948- 1962).	**Compiled by Faculties of DODL,KU.**	
Block 2: Political developments Unit-2: Political developments till 1977-people in Power, people in Opposition, challenging the Power Unit-3: The Age of Consolidation of Power, 1977-2011. Unit-4: Change in Power, 2011-2021.	**Dr. Shubhajit Biswas** **SACT-I, History Department.** **Jalangi Mahavidyalaya**	
Block- 3: Economy Unit-5: Land reforms-agriculture Unit-6: Trade and industry Unit-7: Organized & unorganized labour-trade union movement.	**Dr. Shubhajit Biswas** **SACT-I, History Department.** **Jalangi Mahavidyalaya**	

Block- 4: Society Unit-8: Questions of caste, class, gender and religion Unit-9: The refugee factor	**Dr.Ajit Ravidas** **Guest Faculty** **DODL,KU**	
Block- 5: Development of education Unit-10: School education, higher Education- Unit-11: Development of science and technology Unit-12: Public understanding of science.	**Dr.Ramu Kumar Das** **Guest Faculty** **Sanskrit College & University** **&** **DODL,KU**	
Unit 6: Culture Unit-13: Literature Unit-14: Visual art Unit-15: Performing art Unit-16: Sports.	**Compiled by Faculties of DODL,KU**	

পর্যায় গ্রন্থ - ১

একক -১

West Bengal during the Chief Ministry of Bidhan Chandra Roy (1948-1962)

১.১.১.১.০: উদ্দেশ্য

১.১.১.১.১: সূচনা

১.১.১.১.২: প্রথম পর্ব

১.১.১.১.৩: দ্বিতীয় পর্ব

১.১.১.১.৪ : তৃতীয় পর্ব

১.১.১.১.৫: উপসংহার

১.১.১.১.৬: সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১.১.১.১.৭: সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১.১.১.১.০ : উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন:

১. ১৯৪৮-১৯৬২ এর সময়পর্বে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা সম্পর্কে।

২. ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের বাংলার মুখ্যমন্ত্রীত্ব লাভ।

৩. ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনটি পর্ব।

৪. ১৯৪৮-১৯৬২ সময়পর্বের গঠনমূলক কাজ এবং খাদ্য, বাসস্থান, উদ্বাস্তু এবং অন্যান্য সমস্যাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত গণ আন্দোলন

১.১.১.১.১ সূচনা:

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কালে পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে অবশ্যই ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সময়পর্বের কথা উল্লেখ করতে হয়। এই পর্যায়টিতে আমরা সংক্ষেপে ১৯৪৮-১৯৬২ অর্থাৎ ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বের সময়পর্ব নিয়ে আলোচনা করবো। তাঁর সময়কালকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় যথা:

১. প্রথম পর্যায় - ১৯৪৮-১৯৫২

২.দ্বিতীয় পর্যায় - ১৯৫৩-১৯৫৭

৩. তৃতীয় পর্যায় - ১৯৫৮-১৯৬২

তবে এই আলোচনার পূর্বে বিধানচন্দ্রের পূর্ববর্তী মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের পর্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজনীয়। কোন অবস্থায় ডঃ রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন তা জানা আবশ্যক।

ড. প্রফুল্ল ঘোষের সময়পর্ব :

ড. প্রফুল্ল ঘোষ তাঁর পর্বের প্রথম দিনই বিতর্কের সম্মুখীন হন। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে, পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বিধানসভা অধিবেশনের দিনে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বের রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ২০০০ জন কৃষক বিধানসভা অভিমুখে মিছিল করে আসেন নতুন মন্ত্রিসভাকে স্বাগত জানানোর উদ্দেশ্যে । কিন্তু সরকারের নির্দেশে পুলিশ এসপ্লানেড ইস্টে তাঁদের গতিরোধ করে বিধানসভায় প্রবেশে বাধা দেয়। কেবলমাত্র তাদের বাধা প্রদান করা হয়েছিল তাই নয়, কৃষক উপর পুলিশী অত্যাচারও চালানো হয়েছিল। উল্লেখ্য প্রথম দিনের ঘটনাটিই পরবর্তী কংগ্রেসী সরকারগুলির দমনপীড়ন ও জনবিরোধী সন্ত্রাসের ইঙ্গিত বহন করে।

এহেন পুলিশী অত্যাচারের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে ড. প্রফুল্ল ঘোষ বলেন, "যদি আপনারা আগে বলতেন তা হলে হ'তো।" যদিও তাঁর বক্তব্য থেকে জানা যায় তিনি পূর্বেই কৃষকদের আগমন সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তবে

নিরস্ত্র কৃষকদের বিধানসভা দখলের ও সশস্ত্র সন্ত্রাসের অমূলক ভয় এর ফলেই সরকার এই পুলিশী অত্যাচার চালায়। কৃষকরা মন্ত্রিসভাকে স্বাগত জানাবার শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে আসলেও ডা: ঘোষ ও কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা তাঁদের প্রতি নূন্যতম সৌজন্য দেখাননি। বরং পুলিশী অত্যাচারের মুখে নিরস্ত্র কৃষকদের ঠেলে দিয়ে জনবিরোধী চরিত্র উন্মোচন করেন। এই প্রথম ঘটনা যাতে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার দমনমূলক চরিত্র স্পষ্ট হয়। এই ঘটনায় সরকার কৃষকদের সহানুভূতি হারায়।

১৯৪৭ সালের ১০ ডিসেম্বর ছাত্ররা 'পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা আইন' নামক জনবিরোধী দমনমূলক আইনের প্রতিবাদে সরব হলে, তাদের দমন করতেও নতুন সরকার পিছপা হয়নি। ছাত্র আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করতে পুলিশী তাণ্ডব চরমে ওঠে, এম্বুলেন্স গাড়ীকেও তারা রেহাই দেয়নি। এই ঘটনায় স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গে প্রথম পুলিশের গুলিচালনার ঘটনা ঘটে এবং রিলিফ এবং ওয়েলফেয়ার এম্বুলেন্স কপস ক্যাডেট শিশির মণ্ডল নিহত হন। তিনিই স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গের গণআন্দোলনের প্রথম শহিদ। উত্তেজিত ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে পুলিশের উপর ইট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকে। হোম সেক্রেটারী রঞ্জিতগুপ্ত ও পুলিশ কমিশনারের উপস্থিতিতে সমস্ত ঘটনা ঘটে। পার্শ্ববর্তী অফিসেও পুলিস হানা দেয়। শেষপর্যন্ত পুলিশ ১০২ জনকে গ্রেপ্তার করে এবং তার মধ্যে ৫০ জন আহত হন। ড. ঘোষ বিধানসভায় এই ঘটনা সম্পর্কে বিবৃতি দিতে গিয়ে তাঁদের সরকারকে কলঙ্কিত করার এক ষড়যন্ত্র রূপে এবং সশস্ত্র সন্ত্রাসের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা বলে আখ্যা দেন। এই মর্মান্তিক ঘটনার পরের দিন ১১ ডিসেম্বর জ্যোতি বসু বিধানসভায় এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপনের নোটিশ দিয়েছিলেন।

স্পেশাল পাওয়ার্স বিলের (পরবর্তীকালে সংশোধিত নাম পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা বিল) প্রতিবাদে ১০ হাজার নাগরিকের শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বিশাল সভা অনুষ্ঠিত হয় (৬ ডিসেম্বর, ১৯৪৭ সালে)। এই সভাটি সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টি কর্তৃক আহুত হয়। এই সম্ভার সভাপতি শ্রী শরৎচন্দ্র বসু উক্ত বিলের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন— "এই বিল পাস হইলে পশ্চিমবঙ্গে ব্যক্তি স্বাধীনতা বলিতে কিছু থাকিবে না।"

কংগ্রেস দলের মধ্যেও এই বিলের বিরোধিতা ও গুলি চালনার প্রয়োজনীয়তা ছিল না বলে নিন্দা লক্ষ্যণীয়। ড. ঘোষের বিরোধী কংগ্রেস লবী এই বিরোধিতাকে কাজে লাগিয়ে তাঁকে পদচ্যুত করতে সক্রিয় হয়। ড. প্রফুল্ল ঘোষের বিরুদ্ধে এই দমনমূলক বিলটিই কংগ্রেসের অন্তর্দলীয় গোষ্ঠী রাজনীতিকে দানা বাঁধতে সাহায্য করে। তাঁর পতনের পিছনে অন্যতম ফ্যাক্টর হিসাবে এই বিলটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। বলাবাহুল্য এতকিছু সত্বেও, ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে বিলটি পাশ হয়। এই নিপীড়নমূলক আইনটি ১৯৬৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত বলবৎ ছিল। যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে তা বাতিল করে।

ড. ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করতে এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের কালোবাজারী রোধের চেষ্টা করেন। তিনি নিরাপত্তা আইনের মাধ্যমে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ দ্বারা রেড করিয়ে আটার সঙ্গে তেঁতুল বীজের গুড়ো মেশানোর প্রচেষ্টা হাতে-নাতে ধরেন। বহু অসাধু ব্যবসায়ী এর ফলে

ধরা পড়েন। এরপরই কংগ্রেসের একটি গোষ্ঠী তাঁকে সরাতে উঠে পড়ে লাগে। অতীতের এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতগুলি ছাড়াও সমসাময়িক পরিস্থিতি ও বাস্তব ঘটনাবলীও ডা: প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের অপসারণের পিছনে দায়ী ছিল।

১.১.১.১.২: প্রথম পর্ব (১৯৪৮-১৯৫২)

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের প্রথম পর্যায়টি (১৯৪৮-৫২) বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাঁর পথ মোটেও সহজ ছিলনা। কেন্দ্র-রাজ্য দ্বন্দ্ব, কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব, একাধিক গণঅভ্যুত্থান, উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্য সমস্যা প্রভৃতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ড. প্রফুল্ল ঘোষের শাসনপর্বে বিভিন্ন সমস্যার কথা। এর ফলস্বরূপ পাঁচমাসের মধ্যেই তাঁর শাসনপর্বের অবসান ঘটে। এক্ষেত্রে শূন্যতার সৃষ্টি হলে, গান্ধীর এবং কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নেতাদের অনুরোধে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ১৯৪৮ এর ২৩ শে জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় নিজের ইচ্ছায় ১২ জন সদস্য নিয়ে নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করেন। এই নতুন মন্ত্রীসভার সদস্যরা ছিলেন—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, শ্রীযুক্ত রায় হরেন্দ্রনাথচৌধুরী, শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন বর্মণ, শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখার্জী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর, শ্রীযুক্ত ভূপতি মজুমদার, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী মাইতি, শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীত্ব লাভের পর ডাঃ রায় যদিও সমস্যাকীর্ণ পশ্চিমবঙ্গের সমাজ, রাষ্ট্রিক ও আর্থিক জীবনের রোগ নির্ণয়ে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন এবং বিভিন্ন পদক্ষেপও গ্রহণ করেছিলেন। তবে তাঁর সব কার্যকলাপ যে সফল হয়েছিল এমন বলা চলেনা বরং তাঁর আমলে দমন পীড়ন মূলক কিছু নীতিও গ্রহণ করা হয়েছিল।

প্রথম পর্বের কার্যকলাপ (১৯৪৮-১৯৫২):

ডাঃ রায় ক্ষমতায় আসার পর ১৯৪৮ সালের ২৬ শে মার্চ ব্রিটিশ আমলের বঙ্গীয় ফৌজদারী বিধি (সংশোধন) আইন বলে কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করেন। বলাবাহুল্য, বহু গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ, এমনকি যারা কমিউনিস্ট ছিলেন না তারাও এই পদক্ষেপের তীব্র বিরোধীতা করেন। জওহরলাল নেহেরুর আপত্তি সত্ত্বেও, ড: রায় কিরণশঙ্কর রায়ের পরামর্শেই কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য, ড: বিধানচন্দ্র রায় এরপরও বহুবার বিরোধী আন্দোলন ও গণসংগ্রামের কণ্ঠরোধ করেন বলপ্রয়োগ করেই। তাঁর আমলেই কংগ্রেস অপশাসন, দুর্নীতি ও দমনপীড়নের বিরুদ্ধ গণতন্ত্রপ্রিয় শ্রমজীবী, কৃষক, বৃত্তিজীবী, ছাত্র, শিক্ষকসহ আপামর জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল এবং সরকারের তরফ থেকে তা দমনের ব্যর্থ চেষ্টাও করা হয় একাধিকবার । বলাবাহুল্য, এই প্রচেষ্টাই ধীরে ধীরে কংগ্রেসের গণসমর্থনের ভিত্তি আলগা করে দিয়েছিল । কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করে ড:

রায়ের প্রশাসন কমিউনিস্ট ও বিরোধী আন্দোলনকে পরোক্ষে ইন্ধনই জুগিয়েছিল এবং এরফলে ক্রমশ জনমানসে কংগ্রেস বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিল।

একথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় ডাঃ রায়ের এই দমনপীড়ন মূলক নীতির সাথে স্বাধীনতা পূর্ব কংগ্রেস মনোভাবের অনেকাংশেই মিল ছিল। স্বাধীনতার পূর্বেই কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা শ্রেণীসংগ্রামের পক্ষে ছিলেন না। সেইজন্য স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বারংবার কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের বিরোধীতা করতে দেখা গিয়েছিল কংগ্রেস নেতৃবৃন্দদের। এক্ষেত্রে তাদের ধারণা ছিল শ্রেণী সংগ্রাম স্বাধীনতা আন্দোলনকে ব্যাহত করবে। তবে এর পিছনে আর একটি কারণ ছিল অনেক কংগ্রেস নেতাই উচ্চবিত্ত জমিদার ও পুঁজিপতি ছিল এবং নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থেই তারা শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের বিরোধীতা করতো। বলাবাহুল্য স্বাধীনতা পরবর্তী কালেও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে দমন পীড়ন মূলক নীতি গ্রহণ এবং গণ আন্দোলনকে দমন করার প্রচেষ্টা পুঁজিপতি, জমিদারদের স্বার্থ রক্ষার প্রচেষ্টা ছিল। এর ফলস্বরূপ কংগ্রেসের সাথে কমিউনিস্টদের দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে পড়ে।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীনে কৃষক, শ্রমিক আন্দোলন বৃদ্ধি পেলে, কংগ্রেস সরকার দমন পীড়ন মূলক নীতি গ্রহণ করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিরাপত্তা আইনের সুযোগে বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেপ্তার করে যথেচ্ছভাবে এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এই সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র অগণতান্ত্রিক ও হঠকারী ছিল তাই নয় বরং পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের ভূমিকা রচনা করেছিল বলা চলে। এর ফলস্বরূপ কংগ্রেস বিরোধীতা এবং কমিউনিস্ট পার্টির জনসমর্থনের ভিত্তি মজবুত হয়েছিল। তবে উল্লেখ্য ১৯৬৭ সালের আগে পর্যন্ত কংগ্রেস শাসনকাল অব্যাহত ছিল পশ্চিমবঙ্গে। এইসমস্ত সমস্যা ছাড়াও ১৯৪৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি দমদম বিমানবন্দরে রেভলিউশনারি কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া এর এক অংশ পান্নালাল দাশগুপ্তর নেতৃত্বাধীনে দমদম বিমানবন্দরে আন্দোলন শুরু করে এবং সরকারি অস্ত্রনির্মান কারখানা ও জেশপ কোম্পানি আক্রমণ করে বসে। অস্ত্র লুণ্ঠন, ইঞ্জিনিয়ারদের হত্যা এবং বিমান বন্দরে আগুন ধরিয়ে দেন তারা। এছাড়াও বসিরহাট, গৌরীপুর থানায়ও আক্রমণ করেন। যদিও তারা আক্রমণের পর পূর্ব পাকিস্তানে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল কিন্তু পুলিশি তৎপরতায় তা ব্যর্থ হয়। উল্লেখ্য, ঘটনার মাথা পান্নালাল দাশগুপ্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীত্ব লাভের পর এই সমস্ত সমস্যা ডাঃ বিধানচন্দ্রের আসন টলমল করে তোলে।

কেবলমাত্র বাহ্যিক সমস্যায় নয় বরং অন্তর্দলীয় সমস্যাও এইসময় তীব্রতা লাভ করে। ডাঃ রায়ের বিরোধী গোষ্ঠী এইসময় আরোও সক্রিয় হয়ে ওঠে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ডাঃ রায় স্বেচ্ছায় নিজের পছন্দ মত মানুষদের নিয়ে তাঁর মন্ত্রীসভা গঠন করেছিলেন, সেই নিয়ে এক চাপা ক্ষোভ দলের মধ্যে ছিলই, পারিপার্শ্বিক সমস্যার মধ্যে সেই ক্ষোভ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রধানমন্ত্রীও ক্রমে ডাঃ রায়ের উপর ভরসা হারাচ্ছিলেন। এর মধ্যেই ঘটে যায় আর একটি ঘটনা, ১৯৪৯ সালের ১২ই জুন দক্ষিণ কলকাতার বিধানসভাকেন্দ্রের উপনির্বাচনে সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী শরৎচন্দ্র বসুর সমর্থনে কংগ্রেস বিরোধীরা সকলে একজোট হয় এবং তিনি বিপুল ভোটে কংগ্রেসপ্রার্থী সুরেশ দাশকে পরাস্ত করেন। বলাবাহুল্য ডাঃ রায়ের ক্ষেত্রে এই পরাজয় ছিল খুব অপমানজনক।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্ব খুব সহজ ছিল না। গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের পাশাপাশি পারিপার্শ্বিক সমস্যার জেরে তাঁর পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল একাধিকবার। তাঁর মুখ্যমন্ত্রীত্ব পর্বের তিনমাসের মাথায় প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতি সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ এবং ভূপতি মজুমদার উদ্যোগী হয়েছিলেন ডাঃ রায়কে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে অন্য মন্ত্রীসভা গঠনের ক্ষেত্রে। বলাবাহুল্য প্রধানমন্ত্রীও খুব একটা যে প্রসন্ন ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এর উপর তা বলা চলে না। এক্ষেত্রে অবশ্যই একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে হয়:

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁর চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশে গেলে নেহেরু সেই সময় কলকাতা সফরে আসেন এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থা লক্ষ্য করে তৎক্ষণাৎ ডাঃ রায়কে দেশে ফায়ার আসার বার্তা পাঠান। যদিও ডাঃ রায় জানান সেইসময় তাঁর পক্ষে আসা সম্ভব নয় কারণ ইতিমধ্যে তাঁর একটি চোখ নষ্ট হয়ে গেছে এবং সেইসময় যদি সঠিক চিকিৎসা না পান তবে তাঁর আর একটি চোখও নষ্ট হয়ে যাবে। নেহেরু তাঁকে ওয়ার্কিং কমিটি ও মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠকে থাকার জন্য বার্তা পাঠিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, শেষমেশ তাঁর অনুপস্থিতিতেই সেইসময়েই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ছয়মাসের মধ্যে একটি সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তাব পাশ করে। শুধুমাত্র তাই নয় এর পাশাপাশি প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পুনর্বিন্যাসের এবং অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভা গঠনেরও প্রস্তাব রাখে।

জওহরলাল নেহেরুর ডা: রায়ের এবং তাঁর মন্ত্রীসভার উপর থেকে ভরসা উঠে গেছিল, এছাড়াও তৎকালীন অন্তর্দ্বন্দ্ব, এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনে জেরবার হয়ে ডাঃ রায়ও দমনপীড়নকেই হাতিয়ার হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। এই সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারও বিভিন্ন দমনমূলক নীতি নিয়ে কমিউনিস্ট ও বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করতে তৎপর হয়েছিল। একটি ইংরাজি সংবাদপত্রের ১৯৫০ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি রিপোর্ট থেকে জানতে পারা যায় যে, ২৫ ফেব্রুয়ারি উপপ্রধানমন্ত্রী সর্দার প্যাটেল পার্লামেন্টে একটি অধিবেশনেই "নিরাপত্তামূলক আটক আইন' (Preventive Detention Bill) পাশ করান। এই বিল উত্থাপন করে বক্তব্য পেশ করে বলেন যে কমিউনিস্টদের সন্ত্রাসের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতেই এই আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। পরবর্তীকালে এই কালা কানুনটি সারা ভারতেই বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করতে ব্যবহৃত হয় সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিকভাবে। ১৯৫০ সালে কমিউনিস্ট পার্টি হাইকোর্টের রায়ে আইনসম্মত হলেও ১৯৫২ সাল ও তারও পরে বহু রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়নি। এর পিছনে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ১৯৫২ সালের নির্বাচনে বিরোধী পক্ষের শক্তিহ্রাস ও কণ্ঠরোধ। ডাঃ বিধানচন্দ্রের কংগ্রেস সরকার বিরোধী রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে আগ্রহী ছিল না। ফলে, প্রথম সাধারণ নির্বাচন অবাধ, গণতান্ত্রিক, নিরপেক্ষ হতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন সরকারী নথিপত্রেও কমিউনিস্টদের অভিযোগের সমর্থন পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস দল ও সরকারের ১৯৫২ সালে প্রথম নির্বাচন পার করার একটি অন্যায় কৌশল ছিল এটি। বহু রাজনৈতিক বন্দীকে নির্বাচনের সময়ও বন্দী রাখেন। কোনো কোনো ব্যক্তিকে মুক্তি দিলেও সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে কংগ্রেস সরকার মুক্তি দেননি।পরবর্তীকালেও বিভিন্ন অন্যায় কৌশলের দ্বারস্থ হয়েছিল কংগ্রেস সরকার নিজেদের ক্ষমতায় টিকিয়ে

রাখার জন্য। ১৯৬২ সালের নির্বাচনেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এইসময় রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন তীব্র হলে এবং আইনি লড়াইয়ে জেরবার হয়ে শেষমেশ ডাঃ রায় নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দিতে বাধ্য হন। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন - জ্যোতি বসু, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, মুজফফর আহমদ।

দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব, কমিউনিস্ট আন্দোলনের তীব্রতার পাশাপাশি স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু সমস্যা এবং খাদ্য সমস্যাও তীব্র হয়ে ওঠে। বিশেষ করে ১৯৫১ সাল নাগাদ পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য সমস্যা চরমে ওঠে। উদ্বাস্তুদের স্রোত অব্যাহত ছিল। ডাঃ রায়ের সরকার খাদ্য সমস্যা, উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে হিমসিম খেতে থাকে। খাদ্য, বস্তু, কেরোসিন তেল, বেবি ফুড প্রভৃতি অত্যাবশ্যক জিনিসগুলি নিয়ে চরম কালোবাজারী চলতে থাকে। । রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও এলাকায় ভূখ-মিছিল শুরু হয়। জনসাধারণের দাবি : খাদ্য নেই, খাদ্য চাই। অনেক জায়গায় বুভুক্ষ মানুষরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে জোতদার ও চোরাকারবারিদের মজুতে চাল, কেরোসিন, ইত্যাদি উদ্ধার করে বন্টন করতে থাকে । অনেক জায়গা থেকে খাদ্য-সংঘর্ষের খবরও আসে । এক্ষেত্রে অবশ্যই কোচবিহারের কথা উল্লেখ করতে হয়:

"১৯৫১ সালের ২১ এপ্রিল কোচবিহার শহরে পাঁচহাজার মানুষের এক ভূখমিছিল বের হয়। এই ভুখমিছিলের উপর পুলিশ বেপোরোয়া লাঠি চার্জ করে ও গুলি চালায়। গুলিতে ৫জন নিহত এবং অন্তত ৪০ জন আহত হন। '

“স্বাধীনতা পত্রিকা'র ১৯৫১ সালের ২৩ এপ্রিলের রিপোর্ট:

“আইন-শৃঙ্খলার জন্য কোচবিহার শহরে আজ (২২ এপ্রিল) সেনাবাহিনী তলব করা হয়েছে। তারা কোচবিহার শহরের রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। সেক্রেটারিয়েটের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী জনসাধারণের উপর পুলিশের বেপরোয়া গুলিবর্ষণের ফলে শহরের পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করেছে বলে সরকারী মুখপাত্র জানান।

বিক্ষুব্ধ মানুষ আজ সকালে কোচবিহারের পুলিস সুপারের গৃহ আক্রমণ করেন। এস পি'র গৃহের আসবাবপত্র বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষুব্ধ মানুষ কোচবিহার, মাথাভাঙ্গা ও দিনহাটার কংগ্রেস অফিসেও হানা দেন এবং কংগ্রেস অফিসের নথিপত্র ও আসবাবপত্র নষ্ট করেন। শহরের বিভিন্ন এলাকা হতে খাদ্য সংঘর্ষের সংবাদও পাওয়া গেছে।

কোচবিহার জেলার সমস্ত দলের নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট নাগরিকগণ হত্যাকারীদের প্রকাশ্য বিচারের দাবি জানান। সরকার জনগণের কাছে কিছুটা নতিস্বীকারে বাধ্য হয়, শহর থেকে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহৃত হয় এবং জেলার আংশিক রেশন ব্যবস্থা চালু হয়।”

নির্বাচনের মুখে এই ঘটনার তীব্র প্রতিক্রিয়া কংগ্রেস দলেও লক্ষ্য করা যায়। কংগ্রেসের অন্তর্দলীয় দ্বন্দ্ব পুনরায় এর ফলে তীব্রতা লাভ করে । কংগ্রেসের একটি শক্তিশালী অংশ ডা: বিধানচন্দ্র রায়ের সরকার ও পুলিশ বাহিনীর ভূমিকার

তীব্র সমালোচনা করে গুলি চালনার নিন্দা করে। ফলে, ডা: রায়ের সরকার সঙ্কটের মুখে পড়ে। ডা: রায় পদত্যাগ করতে উদ্যত হন।

কোচবিহারের মর্মান্তিক হত্যাকান্ডের প্রায় এগারো মাস পরে ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের ১৩ মার্চ বিধানসভায় কোচবিহারের খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মন্ডলের একটি প্রশ্নের জবাবে তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন বিস্তারিতভাবে কোচবিহারের খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। সেই সঙ্গে তিনি ঐ প্রশ্নের জবাবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় চালের খুচরা দরের সর্বোচ্চ দর সমগ্র ১৯৫০ সাল এবং ১৯৫১ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কি হারে ছিল একটি টেবিলে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করেন। এই টেবিল থেকেই স্পষ্ট যে, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে র অন্যান্য জেলার তুলনায় কোচবিহারের খাদ্য পরিস্থিতি ভয়াবহ ছিল। যেখানে ১৯৫০ সালে কোচবিহার সদরে চালের দাম ছিল মন প্রতি ৫০ টাকা, তাই ১৯৫১ সালে বেড়ে হয়েছিল ৬৫ টাকা। প্রকৃতপক্ষে, কোচবিহার দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পড়েছিল। কিন্তু, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সরকার সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। ফলে, পরিস্থিতি ক্রমে আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। এইভাবেই, কোচবিহারের ঘটনার পটভূমি গড়ে ওঠে। ঘটনা ঘটে যাবার পর মন্ত্রীসভার চোখ খোলে।

কোচবিহারের খাদ্য সমস্যা ভয়াবহ হওয়া সত্ত্বেও যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বিরোধী দলগুলি (বিশেষত কমিউনিস্ট দল) এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আন্দোলনমুখর হয় বিধানসভার অভ্যন্তরে ও বাইরে। আন্দোলনের চাপে কোচবিহারে সরকার সংশোধিত রেশনিং চালু করে। ২৪ পরগণা ও নদীয়াতে সবথেকে বেশী মানুষকে সংশোধিত রেশনিং-এর আওতায় আনা হয়। ২৪ পরগণায় ১,৪৪৫, ৭৯৯জন এবং নদীয়ায় ১,০৮৮১৭৮ জনকে এই আওতায় আনা হয়েছিল। হুগলী জেলায় ৬,২১,৫১৬ জন, হাওড়ায় ৩,৯৯,৮১৬ জন, দার্জিলিং জেলায় ২,৭৯,৪২০ জন, বর্ধমান জেলায় ৯২,৩২৮ জন, মেদিনীপুর জেলায় ৫,০৫১ জন, পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় ৪৫,৩১৮ জন, মালদা জেলায় ১,৭৪,২৫৭ জন, জলপাইগুড়ি জেলায় ৩,৩৭,৭২১ জন, মুর্শিদাবাদ জেলায় ২,১৫,৪৭৩ জন সংশোধিত রেশনিং-এর আওতায় আনা হয়।

উপরের আলোচনায় স্পষ্ট যে, ডা: রায়ের শাসনকালের প্রথম পর্যায়ে (১৯৪৮-৫২ সাল) সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগজনক ছিল। ঐ পর্যায়ের সব থেকে উদ্বেগজনক সময় ছিল আবার ১৯৫০-৫১ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর। এই সময়ে খাদ্যের জন্য সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক আন্দোলন ডাঃ বিধানচন্দ্রের সরকারের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল।পরিস্থিতি এমন সঙ্কটজনক ও জটিল হয়ে পড়ে যে, ঘরে- বাইরে সমস্যা ও দ্বন্দ্বে জর্জরিত ডা: বিধানচন্দ্র রায় তিতিবিরক্ত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিতে উদ্যত হন। সুতরাং, বলা যায় যে, তাঁর এই প্রথম পর্যায়ের শাসনকাল খুব সহজ ও সম্পূর্ণ সাফল্যমন্ডিত ছিল না। এই বাস্তব পরিস্থিতির জন্যই কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বিরোধী দলের আন্দোলন ব্যাপক আকার নেয়।

প্রথম পর্যায়ে আর একটি সমস্যার কথা উল্লেখ করলেই নয়। সেটা হল স্বাধীনতা-উত্তর ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল পূর্ব পাকিস্তান থেকে সেখানকার সংখ্যালঘুদের ব্যাপক হারে ঘর-বাড়ি ছেড়ে ছিন্নমূল অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা। কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী নেতৃত্ব তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রথম প্রধানমন্ত্রী শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতেন যে, দাঙ্গা শেষ হয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে যাঁরা ভিটেমাটি ছেড়ে এদেশে এসেছে তারা পুনরায় পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যাবেন। ফলে সেই সময়ে কোন ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর তৈরী হয়নি পশ্চিমবঙ্গে। ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের এই অদূরদর্শী নীতি কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের উদাসীনতার ও বঞ্চনার পথ প্রশস্ত করে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তু যাঁরা পূর্ব পাঞ্জাব, দিল্লী, হরিয়ানা প্রভৃতি অঞ্চলে এসে আশ্রয় নেন তাঁদের ক্ষেত্রে অনেক উদার ও বাস্তববাদী নীতি গ্রহণ করে। পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনে দেদার অর্থ ও সাহায্য দেওয়া হয়। তুলনামূলকভাবে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুরা বঞ্চিতই হন।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ক্ষমতালাভের পর থেকেই বারংবার এই বৈষম্যের দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই নিয়ে বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর দ্বন্দ্বও দেখা দিয়েছিল। তাঁর মুখ্যমন্ত্রীত্বের প্রথম দু-এক বছর উদ্বাস্তু সমস্যা ততটা জটিল আকার ধারণ করেনি। কিন্তু ১৯৫০ সালের পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপক দাঙ্গার ফলশ্রুতিতে উদ্বাস্তুর প্লাবন শুরু হয়। ১৯৫০ সালের জানুয়ারিতে বাগেরহাট অঞ্চলে দাঙ্গার ফলে বহু হিন্দু নিহত হন। এরপর রাজশাহী, বরিশাল ইত্যাদি পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার জন্য দলে দলে হিন্দু শরণার্থী উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেন। এরই প্রতিক্রিয়ায় এই রাজ্যেও ভ্রাতৃঘাতি দাঙ্গা শুরু হয়। কলকাতা ও মুর্শিদাবাদের দাঙ্গায় সন্ত্রস্ত মুসলমানরা পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে পূর্ব পাকিস্তানে আশ্রয় নেন। দাঙ্গা হাঙ্গামার ফলে মার্চ মাস থেকে ব্যাপক হারে উদ্বাস্তুরা আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় নিতে থাকে। যে সমস্ত উদ্বাস্তু নিজস্ব উদ্যোগে পুনর্বাসন করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁদের সংখ্যা জানা সম্ভব না হলেও আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় প্রার্থীদের হারের বৃদ্ধি থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এই সময়ে কি হারে উদ্বাস্তু স্রোত ঘটেছিল।

ডা: বিধানচন্দ্র রায় আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও উদ্বাস্তু সমস্যাকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় বৈষম্যমূলক নীতির বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। তা সত্ত্বেও, ডাঃ রায় রাজ্যের সীমিত সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে এই বিরাট সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালিয়ে অংশত হলেও সাফল্য লাভ করেন। যদিও এই সমস্যাই পরবর্তীকালের রাজনৈতিক গতিধারাকে অনেকটাই প্রভাবিত করেছিল। কমিউনিস্ট ও বিরোধীরা উদ্বাস্তু সমস্যাকে রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত করে প্রবল আন্দোলন শুরু করে। পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট ও বামপন্থীরা পূর্ব পাঞ্জাবের উদাহরণ তুলে ধরে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের বঞ্চনার প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়। এই আন্দোলনের হাত ধরেই ক্রমশ কংগ্রেস বিরোধী শক্তি একজোট ও শক্তিশালী হয়। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সরকার ও কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে স্বাভাবিকভাবেই ছিন্নমূল মানুষেরা কমিউনিস্ট তথা বামপন্থীদের পতাকা তলে সমবেত ও সঙ্ঘবদ্ধ হতে থাকে। এইভাবেই পরবর্তীকালে রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে উদ্বাস্তু সমস্যা এবং এর সূত্র ধরে বেকার সমস্যা, খাদ্য সমস্যা, বাসস্থান সমস্যায় পশ্চিমবঙ্গ জর্জরিত হয়। এই সমস্যাই বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনকে ইন্ধন জুগিয়েছিল বলা চলে। বিভিন্ন ঘটনার

মধ্যে দিয়ে বামপন্থীরা প্রাদেশিক কংগ্রেস সরকারের দুর্বলতাকে জনসমক্ষে তুলে ধরে এবং শুধু তাই নয় পরবর্তীকালে জনগণের মধ্যে বামপন্থী ভাবধারার প্রতি আস্থাও গড়ে তোলে।

১৯৫২ এর সাধারণ নির্বাচন:

স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবিধান অনুসারে প্রথম পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে। বলাবাহুল্য, কংগ্রেস সরকার এবং বিরোধী বামপন্থী দলগুলি উভয়েই প্রচার চালিয়েছিল নিজেদের সমর্থনে এবং বিরোধীর ত্রুটি জনসমক্ষে তুলে ধরতে। কংগ্রেস একদিকে সমবায়মূলক কৃষি ব্যবস্থার প্রসার, কুটির শিল্পের বিকাশ, আবাদী জমি বন্টন, কর্ম সংস্থান, অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন, শরণার্থীদের পূর্ণবাসনের কথা তাদের ভোটের প্রচারে তুলে ধরে অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টি ব্যক্তি স্বাধীনতা, শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, কৃষকদের ঋণ মকুব এবং তাদের সরকারি ঋণ এবং সেচের ব্যবস্থা করে দেওয়া, কর্ম সংস্থান, দ্রব্য মূল্য হ্রাস, দুর্নীতি, কালোবাজারি, এবং চোরাবাজারী দমন, শিল্পায়ন, এবং বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদের দাবি তোলে তাদের ইস্তাহারে।

১৯৫২ সালের বিধানসভা ভোট বিভিন্ন দিক থেকে উল্লেখের পরিচয় রাখে। প্রথম প্রাপ্তবয়স্কের ভোট দান এবং নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া, কমিউনিস্টদের ২৮ টি আসন লাভ এবং কংগ্রেসের জয় হলেও বিভিন্ন গণ্যমান্য নেতাদের পরাজয়। কংগ্রেস যেখানে নির্বাচনে জয়লাভের জন্য অর্থের ব্যবহার করে, সরকারি প্রশাসন যন্ত্রকে ব্যবহার করে এবং জাল ভোটও দেয় , তা সত্ত্বেও বিরোধীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি ছিল এই নির্বাচনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তবে শেষমেশ কংগ্রেস ২৩৮ টি আসনের মধ্যে ১৫১ টি আসন পেয়ে জয়লাভ করেছিল। এক্ষেত্রে উল্লেখ করতে হয়, দুর্নীতির পাশাপাশি স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেসের ভূমিকা, গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা, সাংগঠনিক শক্তি এবং প্রশাসনিক সুবিধাও তাদের সাহায্য করেছিল ১৯৫২ এর নির্বাচনে জয়লাভ করতে।

১৯৫২ সালের ২৬ শে মার্চ কংগ্রেসের এক সভায়, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় দ্বিতীয়বার কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হন এবং ১১ই জুন, ১৯৫২ সালে তিনি নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করেন ও তার তালিকা পেশ করেন তৎকালীন রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রনাথ মুখার্জির কাছে।

১.১.১.১.৩: দ্বিতীয় পর্ব (১৯৫৩-১৯৫৭)

১৯৫২ সালের প্রথম নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিধানচন্দ্রের দ্বিতীয় পর্বটিও (১৯৫৩-১৯৫৭) ছিল বিভিন্ন দিক থেকে ঘটনাবহুল এবং তাৎপর্যপূর্ণ। এই সময়কালে কংগ্রেস শাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্তরের মানুষ

সংঘবদ্ধভাবে বিভিন্ন গণ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন যথা - ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন (১৯৫৩), শিক্ষক আন্দোলন (১৯৫৪, ১৯৫৭-৫৮), বাংলা-বিহার সংযুক্তি বিরোধী আন্দোলন (১৯৫৬) । স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গের বহুবিধ সমস্যা সমাধানে ও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা সচেষ্ট হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ছিলনা। বরং বিভিন্ন সরকারি পদক্ষেপের বিরুধী জনসাধারণ কমিউনিস্ট ও বিরোধী দলগুলির গণআন্দোলনের ডাকে ব্যাপক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেয় । অপরদিকে, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই পর্বের শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গ পুনর্গঠনের এক সদর্থক প্রয়াস চালান। কারণ, তিনি বুঝেছিলেন পশ্চিমবঙ্গে আর্থ-সামাজিক উন্নতি ঘটাতে না পারলে তার রাজনৈতিক ফলাফল হবে ভয়াবহ। এর ফলে, পশ্চিমবঙ্গ অবক্ষয়ের মুখে পড়বে শুধু নয়, কংগ্রেস দলের ও শাসনের পক্ষে তা চরম ক্ষতি বয়ে আনবে। দূরদর্শী প্রশাসক ও সংগঠক বিধানচন্দ্র তাই জনগণের দৃষ্টি ফেরাতে বহু জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনায় হাত দেন। তাঁকে অনেকে 'পশ্চিমবঙ্গের রূপকার' আখ্যা দেন। এক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য কিছুটা পরিমাণে ঘটলেও, তিনি সম্পূর্ণ সার্থক একথা বলা চলে না ।

তাঁর শাসনকালের দ্বিতীয় পর্বে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বিভিন্ন নদী-বাঁধ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, যার মধ্যে অন্যতম ছিল ১৯৫১ সালের ময়ূরাক্ষী প্রকল্প, ১৯৫৩ সালের দামোদর ভ্যালি প্রকল্প এবং তার পাশাপাশি বোকারোতে তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র উদ্বোধন। উল্লেখ্য, এই দামোদর ভ্যালি প্রকল্পের হাত ধরেই দুর্গাপুরে নগর নির্মাণের ভিত্তি স্থাপন হয়েছিল। এই শাসনপর্বেই ডাঃ রায় কল্যাণী নগর নির্মাণের কাজেও ব্রতী হয়েছিলেন। এই পর্বের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূত্রপাত। সারা ভারতের উন্নয়নে একটি পাঁচ বছর মেয়াদী পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরী হয়। ভারতের অংশ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গেও প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে গতি সঞ্চারিত হয়েছিল। তবে, এ কথাও ঠিক, পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপক সমস্যার নিরিখে এই গতি একান্তই অপ্রতুল ছিল। কলকাতা শহরে খাটাল এবং সেই সংক্রান্ত দূষণ এড়ানোর উদ্দেশ্যে ডাঃ রায় হরিণঘাটায় দুগ্ধ প্রকল্প নির্মাণ করেন তাঁর দ্বিতীয় শাসনকালে। ১৯৫৪ সালে এই প্রকল্পের ভিত্তি স্থাপন হয় হরিণঘাটায়। অবশ্য উল্লেখ্য, ডাঃ রায়ের মতে কেবলমাত্র খাটাল উচ্ছেদের জন্য নয় বরং গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের জন্যও এই প্রকল্প তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তবে এই প্রকল্পও ত্রুটিহীন ছিলনা। হরিণঘাটা থেকে সুদূর কলকাতায় দুধ নিয়ে আসার পরিকল্পনা ত্রুটিপূর্ণ ছিল বলে মনে করেন অনেকে কারণ এতে দুধ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল এছাড়াও বিদেশী গরু এনে রাখা হয়েছিল হরিণঘাটায়, পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশে তাদের দেখভাল এবং প্রতিপালন করাও ছিল কষ্টকর এবং সমস্যাজনক। বলাবাহুল্য এই প্রকল্পের ত্রুটি ডাঃ রায়ের শাসনপর্বেই জনসমক্ষে আসার দরুণ পুনরায় বেলগাছিয়ায় মিল্ক কলোনী গড়ে তোলেন। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে বিভিন্ন ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই এই প্রকল্প গুলি গ্রহণ করেছিলেন তাঁর শাসনকালে। এই পর্বের আর একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল ১৯৫৪ সালে চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানার উদ্বোধন। বলাবাহুল্য এটিই ছিল তৎকালীন ভারতে প্রথম রেল ইঞ্জিন নির্মাণ কারখানা। যদিও এর কাজ প্রায় পাঁচ বছর আগেই শুরু হয়েছিল, তবে তার ভিত্তি স্থাপন এবং উদ্বোধন উভয়ই হয়েছিল ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বকালে।

দ্বিতীয় পর্বের অন্যতম আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল জমিদারি উচ্ছেদ বিল উত্থাপন এবং ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে জমিদারি উচ্ছেদ আইন বা West Bengal Estates Acquisition Act পাশ করা। এই আইনের আওতায় জমিদারির উচ্ছেদ ঘটিয়ে সমস্ত জমিকে সরকারি আওতায় আনা হয়েছিল। যদিও কংগ্রেস সরকার এটিকে একটি জনকল্যাণমূলক এবং যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে মনে করেছিল, তবে বিরোধীরা বিভিন্ন যুক্তি দেখিয়েছিলেন এই আইন প্রণয়নের বিরুদ্ধে। যেমন প্রজা সোশ্যালিস্ট নেতা সুধীরচন্দ্র চৌধুরী বলেছিলেন সরকার নিজের আওতায় সব জমি নিয়ে এসে নিজের ইচ্ছা মত তার বন্টন করবে এবং এর ফলে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে, হেমন্তকুমার বসুর মতে এই বিলে ভূমি উন্নয়ন সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি আবার অন্যদিকে জ্যোতি বসু এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন বেনামী জমি উদ্ধারে এবং ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমি বন্টনে সরকার কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এছাড়াও এই বিলটিতে জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথাও বলা হয়েছিল। যদিও স্বাধীনতার পর থেকেই সাধারণ জনগণ এবং বিরোধী দলগুলি জমিদারি ব্যবস্থা উচ্ছেদের জন্য আন্দোলনে রত হয়েছিল কিন্তু উপরিউক্ত কারণগুলির জন্যই তারা এই বিলের তীব্র সমালোচনাও করেছিল।

১৯৫৭ সালের নির্বাচন:

১৯৫৭ সালের নির্বাচনের পূর্বে খাদ্য, মূল্য বৃদ্ধি, বাসস্থান প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে একাধিক গণ আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল এবং কেবলমাত্র তাই নয় কংগ্রেস সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প এর দুর্বলতাও জনসমক্ষে চলে এসেছিল এই সময়ে। এর ফলস্বরূপ একদিকে যেমন কংগ্রেস সরকার নিজেদের সফল কার্যকলাপ জনগণের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিল অন্যদিকে বিরোধীরা তৎকালীন সরকারের দুর্বলতা এবং ১৯৫২ এর সাধারণ নির্বাচনের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি গুলি পূরণ করতে না পারায় কংগ্রেস সরকারের তীব্র বিরোধীতায় সরব হয়েছিল। বলাবাহুল্য খাদ্য, বাসস্থান, উদ্বাস্তু সমস্যা, শিক্ষা সমস্যা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে জনমানসে যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল তা আসলে কমিউনিস্টদের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল। যেখানে ১৯৫২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস পেয়েছিল ২৩৮ টি আসনের মধ্যে ১৫১ টি আসন, অন্যদিকে কমিউনিস্টরা পেয়েছিল ২৮ টি আসন, ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে ২৫২ টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ১৫২ টি পেলেও, কমিউনিস্টদের আসনের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৪৬ টিতে। উল্লেখ্য, উদ্বাস্তু, শ্রমিক এলাকায় এবং কলকাতায় সি.পি. আই বেশি আসন পেয়েছিল গ্রামাঞ্চলের তুলনায়। ড. নীলেন্দু দাশগুপ্তর মতে, সি.পি. আই তাদের সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্য গ্রামাঞ্চলে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি ১৯৫৭ এর নির্বাচনে। এছাড়াও বামপন্থীরা কংগ্রেসের অপপ্রচার, ভীতিপ্রদর্শন, কৃষক সমিতির দুর্বলতা এবং যোগ্য কংগ্রেস বিরোধী প্রার্থীর অভাবকে দায়ী করেছিলেন গ্রামাঞ্চলে পরাজয়ের জন্য। ১৯৫৭ এর নির্বাচনে গ্রামাঞ্চল এবং মফস্বলে কংগ্রেসের প্রভাব বজায় থাকে।

১.১.১.১.৪: তৃতীয় পর্ব (১৯৫৮-১৯৬২)

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বের তৃতীয় পর্বটিও ছিল ঘটনাবহুল। এই পর্বে ১৯৫৮ সালে দন্ডকারণ্য পরিকল্পনা, হলদিয়া বন্দর পরিকল্পনা, কলকাতা বন্দরের অস্তিত্ব রক্ষার্থে এবং হুগলী নদীর নাব্যতা বজায় রাখতে গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণ, উত্তরবঙ্গ, রবীন্দ্রভারতী, কল্যাণী, বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা, ১৯৫৮-৬০ সালে লবণহ্রদ উপনগরী বা সল্টলেক সিটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন ডাঃ রায়। এছাড়াও পর্যটন শিল্পের উন্নতিসাধনের জন্য দীঘার সৌন্দর্যায়ন, কলকাতা-দীঘা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, সড়ক, সেতু নির্মাণ, বাস সার্ভিস শুরু করা, হোটেল নির্মাণ প্রমুখ পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তার বাস্তবায়নও করেছিলেন এই পর্বে। চলচ্চিত্র শিল্পেও তিনি বিভিন্ন কলাকুশলীদের অর্থ সাহায্য করেছিলেন বলে জানা যায় ডঃ নীলেন্দু দাশগুপ্তর লেখা থেকে। এই পর্বে ডাঃ রায়ের অন্যতম কৃতিত্ব ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান। ১৯৬১ সালের ২৫ শে সেপ্টেম্বর ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বিধানসভায় 'The West Bengal Official Language Bill, 1961' উত্থাপন করেন এবং সরকারি কাজে বাংলা ভাষাকে ব্যবহার করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বিভিন্ন গঠনমূলক কার্যকলাপের পাশাপাশি এই পর্বেও ডাঃ রায় বিভিন্ন কংগ্রেস বিরোধী গণ আন্দোলনের সম্মুখীন ও হয়েছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখ্য, স্বাধীনতা-উত্তর কালের শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন (১৯৫৮-৬২); ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলন, ১৯৫৯ সালে কেরালার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত কমিউনিস্ট সরকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন, ১৯৫৯ সালের ২৭ জুলাই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য শাখার ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে ডা: রায় পরিচালিত কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে ১৪ দফা অভিযোগপত্র পেশ; ১৯৫৯ সালে চীন-ভারত তিক্ততা এবং এই বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব; এবং পশ্চিমবঙ্গ মিছিল ও সমাবেশ নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৬০-এর বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন। এক্ষেত্রে অবশ্যই উল্লেখ্য, স্বাধীনতা পরবর্তী কালে পঞ্চাশের দশকের গণ আন্দোলনের ধারা এই পর্বেও অব্যাহত ছিল।

১৯৬২ সালের নির্বাচন:

১৯৬২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস জয়ী হলেও, গ্রামাঞ্চলে বামপন্থীরা পূর্বের তুলনায় অনেকটাই সাফল্য লাভ করেছিল। বলাবাহুল্য, ১৯৫০ এর দশক জুড়ে বিভিন্ন সমস্যাকে কেন্দ্র করে যে গণ আন্দোলন গুলি চলেছিল অনেকাংশেই তা কংগ্রেসের ভিত দুর্বল করতে এবং জনমানসে বামপন্থী মনোভাব গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। তৃতীয় নির্বাচনে কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে কংগ্রেসে প্রতিপত্তি বজায় থাকলেও, কোচবিহার, বীরভূম, বর্দ্ধমানে বামপন্থী প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী নির্বাচনের থেকে ১৯৬৭ এর নির্বাচনে গ্রামাঞ্চল এবং মফস্বলে বামপন্থীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি অদূর ভবিষ্যতে রাজনৈতিক পরিবর্তনের দিকেই ইঙ্গিত করেছিল। তবে এতদসত্ত্বেও, ১৯৬২ সালেও বামপন্থীরা বিকল্প সরকার গঠনে ব্যর্থ হয়েছিল। এর পিছনে অবশ্য কমিউনিস্টদের সাংগঠনিক দুর্বলতা, চীন-ভারত যুদ্ধের দরুণ কমিউনিস্ট বিরোধী প্রচার, কংগ্রেস সরকারের দমনপীড়ন, প্রশাসনিক শক্তিকে নির্বাচনে ব্যবহার, নির্বাচনে

দেদার অর্থব্যয়, এই কারণগুলির কথা উল্লেখ করা যায়। এছাড়াও ১৯৬২ সালে কমিউনিস্ট পার্টি দু ভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং দুর্বল হয়েও পড়েছিল, যার ফলস্বরূপ ১৯৬২ সালেও কংগ্রেস সফল হয় নিজের সরকার গঠন করতে।

তৃতীয় নির্বাচনে জয়লাভের পর ১৯৬২ সালের ১ জুলাই ডা: রায় তাঁর ৮১তম জন্মদিনের দিন মৃত্যুবরণ করেন।

১.১.১.১.৫: উপসংহার:

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যেমন একদিকে ছিলেন সুচিকিৎসক, প্রশাসক, সংগঠক, এবং নতুন বাংলার রূপকার তেমনি তাঁর শাসনপর্বের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় তাঁর পরিকল্পনাগুলির সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন সবক্ষেত্রে হয়নি। এছাড়াও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সমস্যার সঙ্গেও যে তিনি সবসময় লড়তে পেরেছেন এমন নয়, বরং তাঁর শাসনপর্বেই একাধিক বার বিভিন্ন সমস্যাকে কেন্দ্র করে একাধিক গণ আন্দোলন সংগঠিত হয় পঞ্চাশের দশক জুড়ে এবং পরিশেষে বলতেই হয় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বাংলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তার বাস্তবায়ন করলেও তার পর্বেই কংগ্রেস সরকারের ভিত নড়বড়ে হয়েছিল এবং পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী ভাবধারার পথ সুপ্রশস্ত করেছিল।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

নীলেন্দু সেনগুপ্ত, বিধানচন্দ্র ও সমকাল (১৯৪৮-১৯৬২), একুশ শতক, কলকাতা, ২০১০

১.১.১.১. ৬: সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. নীলেন্দু সেনগুপ্ত, বিধানচন্দ্র ও সমকাল (১৯৪৮-১৯৬২), একুশ শতক, কলকাতা, ২০১০
২. নগেন্দ্রকুমার গুহরায়, ডাক্তার বিধান রায় জীবন-চরিত, কলকাতা, ১৯৫৭
৩. জ্যোতি বসু, যতদূর মনে পড়ে, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৮
৪. মণিকুন্তলা সেন, সেদিনের কথা, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮২
৫. নীতিশ সেনগুপ্ত, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়: জীবন ও সময়কাল, কলকাতা, ২০০৩

১.১.১.১. ৭: সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১. ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের তিনটি শাসন পর্ব সম্পর্কে আলোচনা করো।
২. ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের শাসন পর্বে সংঘটিত গণ আন্দোলন গুলি সম্পর্কে আলোচনা করো।
৩. ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় তাঁর শাসন পর্বে কী ধরণের গঠনমূলক কার্যকলাপে ব্রতী হয়েছিলেন?
৪. কীভাবে ১৯৪৮-১৯৬২ এর কংগ্রেস শাসন বাংলার রাজনীতিতে বামপন্থীদের প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করেছিল?

পর্যায় – ২

Political Development

রাজনৈতিক অবস্থা

সূচিপত্র

২১০.২.২.০ উদ্দেশ্য

২১০.২.২..১ ১৯৭৭ পর্যন্ত রাজনৈতিক অবস্থাঃ ক্ষমতাসীন ও বিরোধী

২১০.২.২.২ ক্ষমতার কেন্দ্রিকরণের যুগ ১৯৭৭-২০১১

২১০.২.২.৩ রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তন

২১০.২.২.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলী

২১০.২.২.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

২১০.৬.১৪.০ উদ্দেশ্যঃ-

বর্তমান পর্যায়টির উদ্দেশ্য হল স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন ও সেই সংক্রান্ত আলোচনা করা।

২১০.২.২..১ ১৯৭৭ পর্যন্ত রাজনৈতিক অবস্থাঃ ক্ষমতাসীন ও বিরোধী

১৯৪৭ সালের দুর্ভাগ্যজনক দেশভাগ ভারত রাষ্ট্রের চরিত্রকে যেভাবে বদলে দিয়েছিল তা পূর্বে কখনো হয়নি এ কথা বলা যেতেই পারে, ফলস্বরূপ সৃষ্টি হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের। দেশভাগ পূর্ববর্তী কালের অবিভক্ত বাংলার অস্থিরতা, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা,জনমানুষের ক্রোধ, হতাশা নতুন ভাবে দেখা যায় স্বাধীনতা উত্তরকালের পশ্চিমবঙ্গে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, উদ্বাস্তু সংকটের পাশাপাশি যে সমস্যা সদ্যগঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে দেখা যায় তা হল অন্নবস্ত্রের সংকট। আসলে, ১৯৪৩ সালের মন্বন্তর বাংলা প্রদেশকেঅনেকাংশে নিঃস্ব করে দিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে খাদ্য সমস্যার সংকট কিছুটা কমে গেলেও, বাংলা এই সমস্যা থেকে পুরোপুরি পরিত্রাণ পায়নি। স্বাধীনতার বছরেই প্রবাসী পত্রিকায় লেখা হয়েছিল –'বাংলার (অন্নবস্ত্র)সমস্যা ক্রমেই জটিলতর হইয়া উঠিতেছে।' এছাড়াও ঐ বছরই শারদীয়া স্বরাজ পত্রিকায় শৈল চক্রবর্তীর একটি ব্যঙ্গচিত্রে নগ্নভাবে খাদ্য সংকটের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছিল। যেখানে দেখানো হয়েছিল, লোককে ভিক্ষা পাত্র নিয়ে খাদ্য চাইছে আর উঁচু ব্যালকনি থেকে রাজেন্দ্রপ্রসাদ গাইছেন–'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক।' আসলে ঘুষ, দুর্নীতি, ভেজাল চোরাকারবার আর খাদ্য সংকট ছিল স্বাধীনতা পরবর্তী পাঁচ বছরের পশ্চিমবঙ্গের প্রধান খবর। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে ঋত্বিক ঘটকের 'নাগরিক' চলচ্চিত্রে এক বৃদ্ধ পিতার মুখে শোনা যায় - চাকরি পাওয়াটা এখন লটারি বা জুয়া খেলার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসলে অর্থনৈতিক দুর্গতির চেয়েও সেই সময় বড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল নৈতিক চরিত্রহানির

দুর্গতি। নতুন পাওয়া স্বাধীনতার মোহ এইভাবে ক্রমশ কেটে যাচ্ছিল। অসন্তোষ, ক্ষোভ ক্রমশ জমা হচ্ছিল বাংলার মানুষের মনে, বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন জায়গায় তা প্রকাশও পাচ্ছিল। বিভিন্ন গণ-আন্দোলনকেপুলিশ দিয়ে দমন করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষের নবগঠিত কংগ্রেস সরকারের কার্যকলাপে। ১৯৪৮ সালের ২৬ মার্চ বিরোধী দল পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।১৯৪৯ সালের ২৭ এপ্রিল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির, বন্দিমুক্তির দাবিতেমিছিলে গুলি চলে কলকাতার রাজপথে।লতিকা সেন, প্রতিভা রায়চৌধুরী, গীতা সরকার ও অমিয়া দত্ত চারজন কমিউনিস্ট নেত্রী নিহত হন। এছাড়াও জারি করা হয় 'পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ ক্ষমতা আইন'। এইভাবে কংগ্রেস পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেশ কিছুটা 'পুলিশ রাষ্ট্রের' চরিত্র অর্জন করে ফেলে। এরই পাশাপাশি নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির একাংশের নেতৃত্বে ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপে তেভাগা সংগ্রামের এক নতুন পর্ব শুরু হয়। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে বর্গাদার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে কৃষক প্রতিরোধ দেখা যায়। পুলিশি নির্যাতনও ছিল অব্যাহত। যদিও এই ধরনের সশস্ত্র কৃষক আন্দোলন কমিউনিস্ট গণ্ডির বাইরের বৃহত্তর জনসাধারণকে খুব বেশি প্রভাবিত করতে পারেনি।পরবর্তীতে ১৯৫০ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে কমিউনিস্ট পার্টির উপর বিধিনিষেধ উঠে যায়।

স্বাধীনতার আগে থেকেই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার প্রেক্ষিতে পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দু উদ্বাস্তু মানুষের আসার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। দেশভাগের পর উদ্বাস্তু মানুষের স্রোত যেন পশ্চিমবঙ্গে আছড়ে পড়ে। কিন্তু বাস্তহারা মানুষের দাবি নিয়ে তখন খুব বড় কোন আন্দোলন সংগঠিত হয় নি। ১৯৫০-এর দশকের প্রথম থেকেই বাস্তহারা আন্দোলন ক্রমশ সংগঠিত হতে থাকে।বিভিন্ন বামপন্থী দলের সংগঠিত উদ্যোগে, সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ (United Central Refugee Council), পূর্ববঙ্গ রিলিফ কমিটি, সারা বাংলা বাস্তুহারা সংসদ, বাস্তুহারা কল্যাণ - এই সংগঠনগুলি গড়ে ওঠে।জবরদখল কলোনি স্থাপন আর তার স্বীকৃতির দাবিই ছিল এই ধরনের সংগঠনগুলির প্রথম দিককার কর্মসূচি। বিভিন্ন বামপন্থী দলের উদ্বাস্তু সংগঠনের প্রবল আন্দোলনের চাপেই ১৯৫৪ সালে সরকার জবরদখল কলোনি গুলিকে স্বীকৃতির সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। পঞ্চাশের দশকে বাস্তহারা মানুষের দাবী-দাওয়া, চাওয়া-পাওয়া নিয়ে এই আন্দোলনে উদ্বাস্তু মানুষ ছাড়া অন্যান্য মানুষও যোগ দিয়েছিল। বামপন্থীরা উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন দাবি দাওয়ার সাথে অন্যান্য আন্দোলনের বিষয়গুলিকে জুড়ে দিতে পেরেছিল। তার ফলে পরবর্তীআন্দোলনগুলি গতি পেয়েছিল। এই উদ্বাস্তু আন্দোলন ও উদ্বাস্তু যুব সমাজই পরবর্তীতে বিভিন্ন বামপন্থী দলের একটি প্রধান শক্তি হয়ে দাঁড়ায়।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় আবিভক্ত বাংলা প্রদেশের বিভিন্ন জেলাতে কমিউনিস্ট পার্টির কম-বেশি জনভিত্তি ছিল।কমিউনিস্ট পার্টি স্বাধীনতার আগে বিভিন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ও জয়ী হয়। বঙ্কিম মুখার্জি ১৯৩৭-১৯৪৫ সাল পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলার আইনসভার সদস্য ছিলেন। ১৯৪৬-এর সাধারণ নির্বাচনে বাংলা প্রদেশে কুড়িটি আসনে কমিউনিস্ট পার্টি প্রার্থীদের সক্ষম হয় তার মধ্যে তিনটি আসনে জ্যোতি বসু, রতনলাল ব্রাহ্মণ, রূপনারায়ণ রায় জয় লাভ করে। বেশ কিছু আসলে তারা দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান লাভ করে। নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিভিন্ন বিষয়ে তারা সোচ্চার হয়। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার কমিউনিস্টরানতুনমুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের বিরুদ্ধে সংঘাত জারি রাখলেও, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের উপনির্বাচনে হিন্দু মহাসভার প্রার্থীর বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা প্রফুল্ল ঘোষকেই সমর্থন করে। ১৯৪৮ সালে ২৩ জানুয়ারি প্রফুল্ল ঘোষ পদত্যাগ করলেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী হন কংগ্রেসের বিধানচন্দ্র রায়।

১৯৫১ সাল থেকেই বিভিন্ন জেলার পৌর নির্বাচনে 'নাগরিক সমিতির'- নামে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে কমিউনিস্টরা কিছু সাফল্য পায়। ১৯৫২-তে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের লোকসভায় ৫ টি আসন ও বিধানসভায় ২৮ টি আসনে জয়ী হয়,

ফরওয়ার্ড ব্লক ১৪ টি আরএসপি ও এস ইউ সি ১ করে আসনে জয়ী হয়। ১৫০ টি আসনে এককভাবে জয়ী হয় কংগ্রেস। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বামপন্থীরা একটি শক্তিশালী বিরোধী পক্ষ হয়ে ওঠে।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বিভিন্ন নাগরিক আন্দোলন কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে বামপন্থী আন্দোলনের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৫৩ সালের দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রাম ভাড়া এক পয়সা বাড়ানোর সিদ্ধান্তের ফলে এক ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে কলকাতাও হাওড়া জুড়ে। বিভিন্ন বামপন্থী দলের উদ্যোগে একটি প্রতিবাদ কমিটিও তৈরি করা হয়। এই প্রতিবাদ আন্দোলন এক মাস ব্যাপী নাগরিক জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল। সরকার এই আন্দোলন দমন করতে চাইলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। কমিউনিস্ট নেত্রী মণিকুন্তলা সেন লিখেছিলেন –'পুলিশের লাঠি, গুলি, গ্রেফতার যত বেশি চলে, ততই আগুন জ্বলে'। দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকায় লেখা হয় –'পেশাদার গুন্ডারা আন্দোলন হাতে তুলে নিয়েছে'। তৎকালীন কংগ্রেস নেতা বিজয় সিং নাহার এই আন্দোলন সম্পর্কে বলেছিলেন–'সামাজিক অরাজকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আন্দোলনের নামে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালানো হয়েছে।' কমিউনিস্ট পার্টি ভাষায় এই আন্দোলনছিল-রক্তক্ষয়ী জুলাই।
আসলে পরিস্থিতি এতটাই উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে যে বিদেশে চিকিৎসারত মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধান চন্দ্র রায় ফিরে আসার কথা ভেবেছিলেন। পরবর্তীতে বিধান রায় ফিরে এসে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বৈঠক করলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।
এই আন্দোলনে বাস্তহারা মানুষজন উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিল এ কথা বলা যেতে পারে। পুলিশি হানা, আক্রমণ আর ধরপাকড়ের প্রধান জায়গা ছিল উদ্বাস্তু কলোনিগুলি। এই আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব ছিলেন যেমন গণেশ ঘোষ, সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিল দাস- এঁরা প্রথম জীবনে চরমপন্থী বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ফলে সেই অভিজ্ঞতাকে ভর করে তাঁরা আন্দোলনকে একটা মারমুখী চেহারা দিতে চেয়েছিলেন এমন মনে করা অসঙ্গত হবে না। ট্রামভাড়াকে কেন্দ্র করে জনবিক্ষোভের এই আগুন কলকাতার বুকে বিয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের স্মৃতিকে আবার জাগিয়ে তুলেছিল। আসলে ট্রাম-বাস জ্বালানো পরবর্তীকালের কলকাতার গণ আন্দোলনের একটি প্রতিবাদ রূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।
কলকাতার রাজনৈতিক পরিমণ্ডল কেঁপে উঠেছিল ১৯৫৪ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে শিক্ষক ধর্মঘটে। মূলত মাধ্যমিক বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী বেতন ও মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির দাবিতেশিক্ষক সম্প্রদায় অনির্দিষ্টকালীন ধর্মঘট শুরু করে ও বিধানসভা অভিযান করে। বিভিন্ন বামপন্থী দলের উদ্যোগে অচিরেই এই আন্দোলনকে গণ-আন্দোলনের একটা রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র সংগঠন বি পি এস এফ একটি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল ছাত্র-ছাত্রীদের এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার ক্ষেত্রে। বিধানসভা অভিযানকালে পুলিশের গুলিতে অন্তত ৪ জন মারা যান আহত হন প্রায় ৬৫ জন। ১৭ ফেব্রুয়ারি স্টেটসম্যান পত্রিকায় লেখা হয় 'ওয়াইল্ড স্প্রেড ভায়োলেন্স ইন ক্যালকাটা'। ১৮ ফেব্রুয়ারি স্বাধীনতা পত্রিকায় পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে 'বিবেকহীন বিচারহীন' শিরোনাম দিয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা হয়েছিল। তাতে লেখা হয়েছিল –'আপনি রাস্তাতেই থাকুন আর ঘরেই থাকুন বিধান সরকারের বন্দুক আপনার হৃদপিণ্ড লক্ষ্য করে উদ্যত হয়ে আছে'। প্রায় ৪০০ জন মাস্টারমশাইকে জেলবন্দি করেছিল সেই সময়কার পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পরবর্তীতে ধর্মঘটের দাবি কিছু মেনে নেওয়া হয় ও শিক্ষকদের পালা করে মুক্তি দেওয়া হয়। যদিও একেবারে রাজনৈতিকপন্থায় শিক্ষকদের আন্দোলন চালনার বিষয়টি অনেকাংশে সমালোচনার যোগ্য।
এই সমস্ত আন্দোলন গুলিতে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল উদ্বাস্তু যুবসমাজ। আসলে জীবন যন্ত্রণায় অস্থির বাস্তুহারা যুব সমাজের সাথে বেকার বস্তিবাসী লুম্পেনরা মিলে কলকাতায় জঙ্গি যুব বাহিনী গড়ে উঠেছিল। কোন না কোন রাজনৈতিক আন্দোলনেই তারা

জড়িয়ে যাচ্ছিল, কখনো কখনো ভেঙে দিচ্ছিল আন্দোলনের নির্ধারিত সীমারেখা। কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষেই এই যুবশক্তিকে উপেক্ষা করা সম্ভব হচ্ছিল না। যেকোনো হিংসাত্মক ঘটনাকে মহিমান্বিত করা হচ্ছিল 'মরদের' লড়াই বলে। পরবর্তীকালে ১৯৫৯ ও ১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলনে এই প্রবণতা আরও বেশি দেখা যায়।পরবর্তী ১৯৫৭ সাধারণ নির্বাচনের পর দেখা গেল কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি ৫২-এর নির্বাচন থেকে বৃদ্ধি পায়। বিধায়কের সংখ্যা ২৮ থেকে বেড়ে হয় ৪৬। এছাড়াও অন্যান্য বাম দলগুলিরও শক্তি বেড়েছিল। এই থেকে বোঝা যায় লড়াই আন্দোলনের
মধ্যে দিয়ে বামপন্থী দলগুলি ক্রমশপশ্চিমবঙ্গে শক্তি বৃদ্ধি করছিল।
১৯৫০ দশকের শুরুতেই গ্রামাঞ্চলে এমনকি শহরেও খাদ্যাভাব তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল। একদিকে সংগ্রহ আর সরবরাহ ব্যবস্থার চূড়ান্ত ব্যর্থতা, অন্যদিকে চোরাকারবারে মদত এই পরিস্থিতি ধাপে ধাপে আরও বিপর্যস্ত হয়ে প্রচন্ড বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে ১৯৫৯-র খাদ্য আন্দোলনে। বামপন্থীদের প্রস্তাব ছিল, পঞ্চায়েত এবং গণ কমিটির মাধ্যমে চাল সংগ্রহ করা হোক। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায় সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। অন্যদিকে সরকার পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে ব্যর্থ হয়েছিল। প্রায় দুর্ভিক্ষের মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ২৭ আগস্ট ১৯৫৯ স্বাধীনতা পত্রিকা তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের নাম দেয় 'দুর্ভিক্ষ মন্ত্রী'। এই সময় কেরালায় কমিউনিস্ট সরকারকে বরখাস্ত করার ফলে পরিস্থিতি আরো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। খাদ্য আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বামপন্থীরা তাদের শক্তি প্রদর্শনের একটা প্রস্তুতি নিচ্ছিল। বিপুল সংখ্যক মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে বামপন্থীরা রাইটার্স অভিযানের ডাক দিয়েছিল। আন্দোলনের মোকাবিলা করতে কলকাতার রাজপথে নামানো হয়েছিল সেনাবাহিনীকে। এই আন্দোলন হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগনার শিল্পাঞ্চল, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ এমনকি উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতেও ছড়িয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে দিল্লিতে দরবার করে চাল নিয়ে আসার ব্যাবস্থা করে কিছুটা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে বিধান রায়। কংগ্রেসের বেহাল অবস্থা সুযোগ নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত গণ বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে বামপন্থীরা আগামী নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, তারা শ্লোগানও তুলেছিল –'বুলেটের জবাব ব্যালটে দেব'। ১৯৬২ নির্বাচনেও বামপন্থীফ্রন্ট ৭৭ টি আসনে জয়ী হয়। বামেদের শক্তি ক্রমশ বাড়তে থাকে। পূর্বেরতিনটি বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলপর্যালোচনা করলে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কংগ্রেসের বিকল্প হিসেবে বামপন্থী জোটকে দেখতে চেয়েছিল।
১৯৫৯ সালের মতো ১৯৬৬ সালেও খরার কারণে সারা ভারতে খাদ্যে উৎপাদনের ঘাটতি দেখা দেয়। আর পশ্চিমবঙ্গে মজুতদার, মিল মালিকদের তৈরি কৃত্রিম অভাব ও মূল্যবৃদ্ধি এই সংকটকে আরও বাড়িয়ে তোলে। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল কেরোসিনের দাবিতে আন্দোলন। ১৯৬৬-এর ফেব্রুয়ারি মাস থেকে এই আন্দোলন শুরু হয়। সামনে স্কুল ফাইনাল ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ছিল অথচ কেরোসিনের অভাবে গ্রামাঞ্চলের ছাত্ররা পড়তে পারছে না। চালের দাবির সাথে কেরোসিনের দাবিও যুক্ত হয়ে এক ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হয়। বিক্ষোভ চলাকালীন১৯৬৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি বসিরহাটের স্বরূপনগরের পুলিশের গুলিতে নুরুল ইসলাম নামে এক কিশোর নিহত হলে এই স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ ব্যাপক আন্দোলনের রূপ নেয়। পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম-মফস্বলে তা ছড়িয়ে পড়ে। বামপন্থী দলের জনপ্রতিনিধিরা সমস্ত দাবিগুলোকে একজোট করে বিধানসভার ভিতর ও বাইরে আন্দোলনকে চরমে নিয়ে যেতে তৎপর হয় এবং অনেকাংশ সফলও হয়। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন জোর দিয়েছিলেন চাল কিনে গণবন্টন ব্যবস্থার সাহায্যে বিতরণের উপর। কিন্তু এই নীতি ব্যর্থ হয়। তাঁর উদ্দেশ্য হয়তো সৎই ছিল। গান্ধীবাদী প্রফুল্ল সেন সবাইকে মোটামুটি সমানভাবে খাদ্য বন্টন করার উপর জোর দিয়েছিলেন। এই নীতি কার্যকর করার মত লোক তাঁর পাশে ছিল না। বড় জোতদারদের বাধা, পুলিশ, অমলাবর্গ, সহকর্মীদের অসহযোগিতার ফলে সরকারের অসহায় অবস্থা ফুটে ওঠে। তৎকালীন গুরুত্বপূর্ণ কংগ্রেস নেতা অতুল্য ঘোষ সংবাদপত্রে লিখেছিলেন-

একচেটিয়া সংগ্রহ সমাধানের একমাত্র পথ নয়, পূর্ণ রেশনিং চালু করতে হবে এবং বীজধান, সার ইত্যাদি দিয়ে কৃষকদের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য উৎসাহিত করতে হবে। প্রফুল্ল সেনের দলের লোকেরাই সরকারী নীতির বিরুদ্ধে মতামত দিতে শুরু করে। ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি বলতে থাকেন লোকে কাঁচকলা খায় না কেন, কাঁচকলাতে অনেক খাদ্যগুণ থাকে। ব্যঙ্গ করে তাঁকে অভিহিত করা হয় 'কাঁচকলা মন্ত্রী' বলে। বামপন্থীরা প্রফুল্ল চন্দ্রকে নিয়ে বিদ্রুপ যতটা করেছিল, গান্ধীবাদী নেতার ভিতরের নীতির আদর্শটা ততটা বুঝতে চাননি।

পুলিশের লাঠি, গুলিকে উপেক্ষা করে খাদ্যের দাবিতে মিছিল আন্দোলন ১৯৫০-এর দশকের শুরু থেকে বারবারই হয়েছে, কিন্তু ১৯৬৬ সালের আন্দোলন পূর্বের সমস্ত আন্দোলনের ধারাকে অতিক্রম করে গেছে। প্রকার ও প্রকৃতির দিক থেকে অভিনবত্ব দেখা গেছে এই আন্দোলনে। ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টিরবিভক্তি আন্দোলনের মাত্রাকে বাড়িয়ে তুলেছিল। কোনটি আসল কমিউনিস্ট পার্টি এবং কারা মানুষের পাশে বেশি দাঁড়াতে পারে এইপ্রতিযোগিতা সিপিআই ও সদ্যগঠিত সিপিআই (এম) এর মধ্যে ছিল। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই সময় লিখেছিলেন –'লাল নিশানে এখন গর্জে উঠছে, রাতকে দিন করার শপথ'। কলকাতা, বসিরহাট, কৃষ্ণনগর, রাণাঘাটের মিছিলের মেজাজ যেন কবির কথারই প্রতিধ্বনি ছিল।

স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবাংলায় ১৯৬৬ সাল একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনাপর্ব এ কথা বলা যেতেই পারে। রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে শিল্পী মহলের ধিক্কারের সূত্রপাত অনেকটা হয় এই আন্দোলন প্রসূত নিন্দনীয় ঘটনাবলীর কারণে। অবশ্য খাদ্য আন্দোলনের আগেই 'কল্লোল' নাটকের সূত্রে উৎপল দত্ত গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ায় সংস্কৃতি জগতের একটি বড় অংশ 'নাট্য সংগ্রাম সমিতি' গঠন করে প্রতিবাদী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিল। খাদ্য আন্দোলনেপুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে একটি খোলা চিঠি লেখেন পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন চলচ্চিত্র-পরিচালক ও শিল্পীরা; স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখরা। খাদ্য আন্দোলনের শহীদ পরিবারের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল যাতে যোগ দিয়েছিলেন উত্তম কুমার,সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, অনুপ কুমার প্রমূখরা। বামপন্থীরা খাদ্য আন্দোলনের বিষয়টিকে গণ-আন্দোলনের রূপ দিতে পেরেছিলেন এবং তার ফলে এসেছিল নির্বাচনকেন্দ্রিক রাজনৈতিক সাফল্য। ১৯৬২ সালের ভারত- চীন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে একশ্রেণীর কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যে দেশ বিরোধীতার কদর্য প্রচার চলেছিল, খাদ্য আন্দোলনের সাফল্য তা অনেকটা ভুলিয়ে দিয়েছিল মানুষকে। বামপন্থী নন এমন অনেক শিল্পী সংস্কৃতি জগতের মানুষরা খাদ্য আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। কংগ্রেসী ভোটারদের একটা অংশ সমর্থন করেছিল বামপন্থীদের। পথসভায় জনপ্রিয় হয়েছিল সলিল চৌধুরীর গান –'পথে এবার নামো সাথী, পথেই হবে পথ চেনা'। একটা বামপন্থী মেজাজ যেন পশ্চিমবঙ্গকে গ্রাস করেছিল। আন্দোলন তৈরি করেছিল প্রতিবাদের নতুন স্বর, নতুন ভাষা, তলায় তলায় রাজনৈতিক পরিমন্ডলে সংগঠিত হয়েছিল নতুন কিছু রূপান্তরের আকাঙ্ক্ষা, যা শহরে নাগরিক পরিমণ্ডলকে অতিক্রম করে গ্রামাঞ্চলেও পৌঁছে গিয়েছিল।১৯৬৭ সালেরসাধারণ নির্বাচন কমিউনিস্ট পার্টির কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। পার্টি ভাগ হয়ে যাওয়ার পর এটি ছিল প্রথম নির্বাচন। সি পি আই ও সি পি আই এম-এর নেতৃত্বে দুটি নির্বাচনী জোট গঠিত হয় কংগ্রেসের বিপক্ষে। কংগ্রেস ত্যাগ করে অজয় মুখার্জি 'বাংলাকংগ্রেস' নামে দল গঠন করে, যা সিপিআই-এর সাথে নির্বাচনী জোটে ছিল। স্বাধীনতার পর কংগ্রেস ১২৭ টি আসন পেয়ে এই প্রথম একক সংখ্যাগরিষ্ঠ পেল না। একটি অ-কংগ্রেসী সরকার হওয়ার সম্ভাবনা দেখা গেল। অজয় মুখার্জিকে ফ্রন্টের নেতা গ্রহণ করে দুই বামপন্থী জোট সমর্থন দিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করল।এই সরকার অবশ্য বেশিদিন টেকেনি (২ মার্চ ১৯৬৭-২০ নভেম্বর ১৯৬৭)। এই সরকারেরমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ১৭ জন বিধায়ক নিয়ে পদত্যাগ করলে

অজয় মুখার্জি সরকারের পতন ঘটে। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ‘প্রগ্রেসিভ ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট’ নামে একটি দল তৈরি করে, কংগ্রেস পার্টি এই দলকে সমর্থন দেওয়ার কথা ঘোষণা করলে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী আসনে বসেন। পরবর্তীতে অবশ্য প্রফুল্ল ঘোষের সরকার স্থায়ী হয়নি, ১৯৬৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি প্রফুল্ল ঘোষ পদত্যাগ করলে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়।বামপন্থীদের একাংশ চাইছিল শোষণের যন্ত্রকে সমূলে উৎপাটিত করতে। ১৯৬৭-এর যুক্তফ্রন্ট সরকার বিপ্লবকামী অংশের আশা আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করতে পারেনি।সিপিআই (এম)-এর সরকারে যাবার সিদ্ধান্তের ফলে পার্টির মধ্যেকার একশ্রেণীর বিপ্লবী অংশ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সিপিআই (এম)-এর মধ্যে এক মতাদর্শগত সংঘাত চলতে থাকে। বিপ্লবপন্থী অংশ কমিউন, ছাত্র ফৌজ, দক্ষিণ দেশ, বিদ্রোহ, সন্ত্রাস, চিন্তা প্রভৃতি পত্রপত্রিকার মাধ্যমে তাদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করছিল। সিপিআই(এম) নেতৃত্ব এই বিপ্লবকামী অংশকে ‘হঠকারী’,‘অতি বিপ্লবী’, ‘রেডিমেড বিপ্লবী’, ‘বামপন্থী গোঁড়ামি সংকীর্ণতায়’ আবদ্ধ বলে অভিহিত করেন। এমতাবস্থায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়িতে সশস্ত্র কৃষক আন্দোলন শুরু হলে। চীনের পিপলস ডেইলি(৫ জুলাই, ১৯৬৭) পত্রিকায় –‘ভারতের বুকে বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ’- শিরোনামে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানানো হয়, যা আন্দোলনকে একটি আন্তর্জাতিক মাত্রা দেয়। ‘বন্দুকের নলই রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস’-চীনের বিপ্লবী নেতা মাও-জে-দং-এর স্লোগানকে সামনে রেখেই এক হিংসাত্মক রাজনৈতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলেন আন্দোলনকারীরা।এই চরমপন্থী অংশ১৯৬৯ সালে ২২ এপ্রিল সিপিআই (এম) ভেঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি(মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) নামে একটি বামপন্থী পার্টি তৈরি করে। এই দলের নেতা ছিলেন, চারু মজুমদার, কানু স্যান্যাল, সৌরেন বসু, সরোজ দত্ত, সুশীতল রায়চৌধুরী, আজিজুল হক, অসীম চ্যাটার্জী, জঙ্গল সাঁওতাল,শান্তি মুন্ডা প্রমূখরা। সংসদীয় রাজনীতির অতি বিরোধিতা করে কৃষি বিপ্লব, শ্রেণি সংগ্রাম, সমাজ পরিবর্তনের আমূল বদল এই দলের অন্যতম মূল কথা ছিল। যদিও পরবর্তীতে অবশ্য মতাদর্শগত কারণে এই দল ভেঙ্গে খন্ড-বিখন্ড হয়। এই অতিবামপন্থী সশস্ত্র রাজনীতি সেই সময় পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিমন্ডলে এক অস্থিরতার সৃষ্টি করে।পরবর্তী ১৯৬৯ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২১৪আসন পেয়ে বিপুলভাবে জয়ী হয়। কংগ্রেস মাত্র ৫৫ টি আসনে জয়যুক্ত হয়। নতুন মুখ্যমন্ত্রী হন মাত্র ৩৩ আসন জয়ী বাংলা কংগ্রেসের অজয় মুখার্জি, জ্যোতি বসু উপমুখ্যমন্ত্রী হন। নবগঠিত দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার ১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিধান পরিষদের অবসান ঘটায় যা গঠিত হয়েছিল ১৯৫২ সালে। পরবর্তীতে মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি বিভিন্ন কারনে, বিশেষত ব্যাপক ঘেরাও, আন্দোলনে নিজের সরকারকে ‘অসভ্য, বর্বরদের সরকার’ বলে অভিহিত করে পদত্যাগ করেন ১৬ মার্চ ১৯৭০ সালে। পশ্চিমবঙ্গে আবার শুরু হয় রাষ্ট্রপতি শাসন।১৯৭১ এর নির্বাচনে আবার মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন হোন ৫ আসনে জয়ী বাংলা কংগ্রেসের নেতা অজয় মুখার্জি, যাকে সমর্থন করে কংগ্রেস, সিপিআই, ফরওয়ার্ড ব্লক, মুসলিম লীগ। ১৯৬৭,১৯৬৯, ১৯৭১ পরপর তিনটি নির্বাচনের যুক্তফ্রন্ট সরকারের কার্যাবলী ও সিপিআই (এম)-এর নির্বাচনী শক্তিবৃদ্ধি ক্ষমতাশীল কংগ্রেস সরকার ভালো চোখে দেখেনি। কংগ্রেস বাম পরিচালিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনকেরাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে পারছিল না। বিরোধী শক্তিকে দমন করার জন্য বিভিন্ন কৌশল শাসক কংগ্রেস অবলম্বন করে। কমিউনিস্টদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বকে তারা উৎসাহিত করতে থাকে। ১৯৭০-১৯৭১ সালে নকশালপন্থী অতিবাম রাজনীতি কার্যতপারস্পরিক খুনোখুনির আন্দোলন, প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের আন্দোলন, মূর্তি ভাঙ্গার রাজনীতিতে পরিণত হয়েছিল। রাষ্ট্রবিরোধী হিংসাত্মক ‘খতমের’ এই রাজনীতিকেপ্রশাসন ছেড়ে কথা বলেনি। পুলিশি ধরপাকড়, নকশালপন্থী শিক্ষিত যুবকদের প্রতি মানুষের সম্ভ্রম,অন্যদিকে মানুষের ভীতি - বাংলার জনমানসে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল।

পাশাপাশি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধপশ্চিমবঙ্গ মানুষের কাছে এক আবেগ উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করেছিল। বঙ্গপ্রদেশের এইরকম রাজনৈতিক দোলাচলেরআবহে ১৯৭২ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে অজয় মুখার্জি তাঁর দলকে কংগ্রেসের সঙ্গে মিশিয়ে দেন। সিপিআই, কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে নির্বাচনের লড়াই করে। ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ নিয়ে এই জোট ক্ষমতা লাভ করে ও মুখ্যমন্ত্রী হন সিদ্ধার্থ শংকর রায়।এই নির্বাচনে রিগিং, পেশী শক্তি ও প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে পশ্চিমবঙ্গে একচেটিয়া ভাবে ক্ষমতায় আসে কংগ্রেস, এই অভিযোগ করেসিপিআই (এম)।১৯৭২ - ১৯৭৭ সিদ্ধার্থ রায়ের স্বৈরতান্ত্রিক ধাঁচের শাসনে বিরোধী বামপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গের সেভাবে কোন গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। প্রেসিডেন্সি, মেডিকেল কলেজের ছাত্র সংগঠনগুলি থেকে ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মীদের কাছে থেকে কিছুটা বিরোধিতা এসেছিল। বিভিন্ন কারণে শহর মফস্বলের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মীদের উপর কংগ্রেসের গুন্ডাদের হামলা শুরু হয়। ১৯৭৪ সালে কার্জন পার্কে নাটক চলাকালীন পুলিশি আক্রমণে নিহত হন প্রবীর দত্ত নামে এক যুবক। এই ঘটনার প্রতিবাদে শিল্প-সংস্কৃতির জগতের মানুষেরা একজোট হয়ে প্রতিবাদ মিছিল করেছিলেন, তাতে যোগ দিয়েছিলেন উৎপল দত্ত, মৃণাল সেন, বাদল সরকার, বিভাস চক্রবর্তী, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখরা। ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর শাসনে জরুরী অবস্থা জারি হলে সারা দেশের মতো পশ্চিমবঙ্গকেও বাঁচতে হয় এক বদ্ধ প্রাণান্তকর অবস্থায়। রাজনৈতিক কর্মসূচি, সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা নিষিদ্ধ করা হয়। গৌরকিশোর ঘোষ, দীপঙ্কর চক্রবর্তী, জ্যোতির্ময় দত্তের মত লেখক, সাংবাদিককে এবংজ্যোতির্ময় বসুর মত বামপন্থী নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। এই অগণতান্ত্রিক জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে মিছিল করেন প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা ও মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন, সেই মিছিলে যোগ দিয়েছিল বামপন্থীরাও। আসলে সারা দেশজুড়ে বিরোধী নেতাদের যেমন গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তেমনি জেলবন্দি করাহয়েছিল ইন্দিরা গান্ধী বিরোধী কংগ্রেস নেতাদেরও। জরুরী অবস্থা ইন্দিরা ও কংগ্রেসের পক্ষে ভালো হয়নি। বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা অতুল্য ঘোষ কংগ্রেসের নির্বাচনী পরাজয়ের জন্য সমস্ত স্তরের কংগ্রেসের নেতাদের ইন্দিরা গান্ধীরকাছে আত্মসমর্পণের বিষয়টিকে দায়ী ধরেছেন, কংগ্রেস বলে তখন কিছু ছিল না, ভিতরটা ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। আসলে কংগ্রেস তখন মোহগ্রস্তছিল দেবকান্ত বড়ুয়ার ‘ইন্দিরা ইজ ইন্ডিয়া’ স্লোগানে। ফলস্বরূপ ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতার পালা বদল ঘটে। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসে সিপিআই(এম)নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট, মুখ্যমন্ত্রী হন জ্যোতি বসু।

২১০.২.২.২ ক্ষমতার কেন্দ্রিকরণের যুগ ১৯৭৭-২০১১

ভারতবর্ষের একটি অঙ্গরাজ্যের ক্ষমতায় এত দীর্ঘক্ষমতায় থাকার নজির আর কোন দলের নেই, যা বাস্তবায়িত করেছিল সিপিআই (এম) নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার। ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর অপারেশন বর্গা, ভূমি সংস্কার, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, সুনির্দিষ্ট জল সেচের নীতি, বনসৃজন, মৎস্য চাষের অধিকার, আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা খর্ব করে জনগণের প্রশাসনে ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে একশ্রেণীর প্রান্তিক মানুষকে কিছুটা রিলিফ দিতে পেরেছিল বামফ্রন্ট সরকার। নেতৃত্বের সামাজিক ভিত্তি অনেকাংশে পরিবর্তিত করতে পেরেছিল এই সরকার। প্রান্তিক গ্রামীণ মানুষের ক্ষমতায়নে

অনেক উৎসাহিত হয়ে একে বিবেকানন্দের 'শূদ্র জাগরণের' সঙ্গেও তুলনা করেছেন। ১৯৭৭ সালে সিপিআই(এম)নেতৃত্বাধীন বাম জোটের সরকার গঠন কেবলমাত্র একটা নির্বাচন জেতার প্রশ্ন ছিল না, কংগ্রেস আমলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্যের অধিকার, নারীর মর্যাদা, কৃষক তথা প্রান্তিক মানুষের দাবি দাওয়া যেভাবে লুন্ঠিত হয়েছিল সেগুলি থেকে মুক্তি দেওয়ার প্রশ্নও ছিল। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ চাইছিল কংগ্রেস শাসনের অরাজক অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে। মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েই জ্যোতি বসু বলেন–'এই বামফ্রন্ট সরকার শুধু মহাকরণ থাকে কাজ পরিচালনা করবে না, স্বয়ংশাসিত সংস্থাসমূহের নির্বাচনগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত করে তাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সরকারের কাজ পরিচালিত হবে'। এছাড়াও, আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সরকার পরিচালিত হবে না বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। এই চিন্তাভাবনার ফলশ্রুতি ছিল ১৯৭৮ সালে দলীয় প্রতীকের ভিত্তিতে ত্রিস্তর সাধারণ পঞ্চায়েত নির্বাচন। এই নির্বাচনে বামপন্থীরা বিপুল ভোটে জয়ের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে তাদের ভিত শক্ত করে তোলে। কংগ্রেস ১৯৭৮-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে খুব বেশি গুরুত্ব সহকারে দেখেনি, ফলে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে তাদের ভিত অনেকটা দুর্বল হয়ে যায়, এর ফল ছিল সুদূরপ্রসারী। পরবর্তীতে সিপিআই-এর বামফ্রন্টভুক্তি বামপন্থীশক্তি ও ঐক্যকে মজবুত করে। ১৯৭৮ থেকে ২০১১র আগে পর্যন্ত কোন নির্বাচনেই বিরোধী শক্তি কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপিআর সেভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। ১৯৮৪, ১৯৯১ লোকসভায় সারা দেশের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস কিছুটা ভালো ফল করলেও বিধানসভা নির্বাচনগুলিতে কংগ্রেস ক্ষমতা দখলের জায়গায় পৌঁছাতে পারেনি। নির্দিষ্ট কিছু জেলা ও কিছু পৌরসভাতে কংগ্রেসের রাজনৈতিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।

যদিও ১৯৯০-এর দশকের শুরু থেকেই পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ এলাকার একশ্রেণীর মানুষের সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। গবেষক নিল ওয়েস্টার দেখিয়েছেন কিভাবে- পূর্ব কর্মসূচির আওতা থেকে বাদ পড়ে যাওয়া বা অবহেলিত গ্রামের মানুষের এক বড় অংশের বৈষয়িক এবং রাজনৈতিক অবস্থার গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে।

গিরিশ কুমার ও বুদ্ধদেব ঘোষ 'ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত ইলেকশন ১৯৯৩ ঃ এ স্টাডি ইন পার্টিসিপেশন' গবেষণাপত্রে দেখিয়েছেন, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য পঞ্চায়েতের উপর নির্ভরশীল। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা পঞ্চায়েতের বিধিবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে ছিল না। আসলে পুলিশপ্রশাসনের পাশাপাশি দলনির্ভর সমান্তরাল প্রশাসন চলতে থাকে কোন কোন ক্ষেত্রে এ কথা বলা যেতেই পারে। এই একচেটিয়া ক্ষমতা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতার পরিবেশ সৃষ্টি করে। একচেটিয়া দলনির্ভর ক্ষমতা রাখার প্রবণতা এক রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি করে পশ্চিমবঙ্গে এ কথা বলা যায়।

বামফ্রন্ট শাসনকালের তাদের পূর্বের উদ্বাস্তু নীতির অনেক পরিবর্তন হয়, যারা ফল আমরা দেখতে পায় ১৯৭৯ সালের বিতর্কিত মরিচঝাঁপি হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত ঘটনা। বামফ্রন্ট সরকারের 'অপারেশন মরিচঝাঁপি' প্রয়োগের পদ্ধতি অবশ্যই সমালোচনার যোগ্য, এই অপারেশনের মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকার বুঝিয়েছিল তারা যেকোনো আন্দোলনকে দমন করতে সক্ষম। এছাড়াও সিপিআই(এম)-র সাথে আনন্দমার্গী সম্প্রদায়ের সংঘাতের ঘটনার ফলস্বরূপ বিজন সেতু হত্যাকান্ডের(১৯৮২) মতো অমানবিক বিষয় আমরা দেখতে পাই। আসলে এই সংঘাতের প্রতিরোধের রূপরেখা ঘোষিত হয়নি, তার ফলেই এই হত্যাকাণ্ড, কলকাতা নাগরিক সমাজ এর বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি অভিযোগ করে যে, এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে সিপিআই (এম) পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকার বোঝাতে চেয়েছিল তাদের মতাদর্শের ও সরকারের বিরুদ্ধে যে কোন ঘটনাকে এইভাবেই মোকাবিলা করা হবে। এছাড়াও পুরুলিয়া অস্ত্রবর্ষণ (১৯৯৫) সংক্রান্ত ঘটনার মাধ্যমে অস্থিরতা তৈরি করে নির্বাচিত বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করার একটি নির্লজ্জ প্রয়াস এটাও পাশাপাশি বলা

দরকার। কোন ধর্মীয় সংগঠনকে ব্যবহার করে একটি অঙ্গরাজ্যের গণতান্ত্রিক নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করার চেষ্টা স্বাধীন ভারতবর্ষে একটি বিরল ঘটনা বলেই মনে হয়।
৯০-এর দশকের একদম শুরুতে বাস ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে একজোট হয়ে আন্দোলন করেছিল এসইউসিআই ও কয়েকটি নকশালপন্থী সংগঠন। প্রতিবাদ মিছিলের উপর পুলিশ গুলি চালালে একজনের মৃত্যু হয় সেই সময় কয়েক দিন কলকাতা বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল।। আসলে বাম আমলে বিরোধীদের বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিবাদ বিভিন্ন ঘটনায় বিভিন্ন সময়ে হয়েছে, কিন্তু কোন আন্দোলনেই সংঘটিতভাবে দানা বাঁধেনি। ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিভিন্ন দাবি নিয়ে যুব কংগ্রেসের মহাকরণ অভিযানকে কেন্দ্র করে ঘটনাবলী পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। পুলিশের গুলিতে মারা যান ১৩ জন যুবক, আহত হন নেত্রী। এই ঘটনার প্রতিবাদে সেই রকম কোনো নাগরিক প্রতিবাদ সেই সময় দেখা যায়নি। আসলে শিক্ষা,সংস্কৃতি সব ক্ষেত্রেই তখন ছিল বামেদের একচেটিয়া আধিপত্য। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি মেনে নেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই মহাকরণ অভিযান অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। এই ঘটনায় নেতৃত্ব দানকারী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এই আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনে অনেকটা প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।১৯৯৮ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস ভেঙে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস নামে নতুন দল গঠন করে লোকসভাতে ৭টি আসন জয়লাভ করে সবাইকে চমকে দেয়। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নতুন শক্তি হিসেবে উঠে আসে এই দল।পরবর্তীতে, কেশপুর-গড়বেতার রাজনৈতিক সংঘর্ষ (২০০০-২০০১), ছোট আঙারিয়ার হত্যাকাণ্ড (২০০১), নানুর হত্যাকাণ্ড (২০০০) পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকে উদ্বেলিত করলেও সার্বিক ভোট বাক্সে তার কোন প্রতিফলন ঘটেনি সেইভাবে। ইতিমধ্যে ২০০০ সালের ৬ই নভেম্বর জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী পদে অবসর নিলে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস দল ৬০টি আসন পেয়ে কংগ্রেসকে সরিয়ে বিধানসভায় প্রধান বিরোধীদলের মর্যাদা পায়। বামফ্রন্ট বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়, নতুন মুখমন্ত্রী হন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ২০০৬-এর বিধানসভা নির্বাচনেও বামফ্রন্টের এই জয়যাত্রা অব্যাহত থাকে, মিডিয়ার ভাষাতে এই জয় ছিল 'ব্রান্ড বুদ্ধের' জয়। প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেসের আসন কিছু কমে যায়, মাত্র ৩০ টি আসনে জয়লাভ করে।
বিপুল সংখ্যাগরিষ্ট বামফ্রন্ট সরকার - কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ, নীতির উপর জোর দিতে থাকে। আধুনিক শিল্পায়নের বাস্তবায়নের উপর জোর দিতে থাকে। ফলস্বরূপ, ২০০৬ সালের মাঝামাঝি থেকে কৃষি জমি অধিগ্রহণ করে শিল্প স্থাপনের বিরুদ্ধেপ্রতিবাদ আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। বিরোধী দলের উদ্দেশ্যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্টতা নিয়ে মুখমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কিছু মন্তব্য এইসময় রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে বিতর্কের সৃষ্টি করে।'পরিবর্তনপন্থী' নামধারী একদল বুদ্ধিজীবী এই সময় মিডিয়ায় সরব হয়ে ওঠেন এবং অনুশোচনা করতে থাকেন এই বলে বামপন্থী সরকারের প্রকৃত স্বরূপ তারা এতদিন বুঝতে পারেননি। যদিও বামফ্রন্ট আমলে রাজারহাট-নিউটাউনের উপনগরী তৈরির জন্য জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে খুব বেশি সংঘটিত আন্দোলন হয়নি। বিরোধীরা যেন এই বিষয়ে নিশ্চুপ ছিল, সরকারি প্রসাদ ভক্ষণকারী নাগরিক সমাজও নিরবে বিষয়টিকে সয়ে নিয়েছিল। কিন্তু হুগলি জেলার সিঙ্গুরে টাটা গোষ্ঠীর গাড়ি কারখানার জন্য তিন ফসলী জমি অধিগ্রহণ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বামফ্রন্ট সরকারকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেয়। অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াইতে বিভিন্ন নাগরিক সমাজ ও তৃণমূল কংগ্রেস, এসইউসিআই দল পাশে দাঁড়িয়েছিল।জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ২৬ দিনের অনশন কর্মসূচিতে বঙ্গ প্রদেশের বিরোধী রাজনৈতিক মহলকে অনেকদিন পর আশার

আলো দেখিয়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছোট-বড়,বাম, ডান সমস্ত রাজনৈতিক দল ও একশ্রেনীর নাগরিক সমাজকে তাঁর অনশন মঞ্চে নিয়ে এসে হাজির করতে পেরেছিল। সিঙ্গুর আন্দোলনের পরপরই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ) গড়ে তোলার জন্য নন্দীগ্রামের ২৭ টি মৌজায় জমির অধিগ্রহণ করা হবে হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের এইরকম একটি বিজ্ঞপ্তি দেখে নন্দীগ্রামের কৃষক জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। প্রতিবাদে গঠিত হয় 'ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি'। সিঙ্গুরের মতো নন্দীগ্রাম স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়ায় জমিয়াতে উলামায়ে হিন্দ, তৃণমূল কংগ্রেস এবং এস ইউ সি আই দল ।

পরবর্তীতে সিঙ্গুরের মতো এই আন্দোলনের রাশ চলে যায় তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে। নন্দীগ্রামের মানুষের উপর পুলিশের গুলি চালানোর ঘটনা জমি আন্দোলনকে একটি আন্তর্জাতিক মর্যাদায় নিয়ে যায়। তৎকালীন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধী ২০০৭ সালে ৯ নভেম্বর নন্দীগ্রাম হিংসার ঘটনার নিন্দা সূচক বিবৃতি প্রকাশ করেন। এই হিংসার ঘটনার পরিপেক্ষিতে ২০০৭ সালের ১৪ নভেম্বর কলকাতার নাগরিক সমাজের মৌন মিছিল স্মরণীয় হয়ে থাকবে বঙ্গ প্রদেশের রাজনৈতিক মহলে। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম আন্দোলনের পরবর্তীকালে লালগড় আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মহলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনীতে জিন্দাল গোষ্ঠীর ইস্পাত কারখানা ভিত্তি প্রস্তর করে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যখন ফিরে আসছিলেন সেই সময় একটি বিস্ফোরণ হয়। মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল বলে কেউ হতাহত হয়নি। এই ঘটনার তদন্ত নেমে পুলিশ লালগড় অঞ্চলে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের উপর তদন্তের নামে নির্যাতন চালায় বলে বিরোধীরা অভিযোগ করে। পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে ছত্রধর মাহাতোর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে 'পুলিশসন্ত্রাস-বিরোধী জনসাধারণের কমিটি'। অতিবামপন্থী সশস্ত্র রাজনীতির সাথে এই আন্দোলনের যোগ ছিল বলে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার অভিযোগ করে। তৎকালীন বিরোধী দলগুলোর সাথে কম-বেশি যোগাযোগ ছিল এই আন্দোলনের। একদিকে আদিবাসী ও স্থানীয় নিম্নবর্গের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে অতিবামপন্থী রাজনীতি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামে।২০০৯ সালের জুন মাস থেকে একদিকে সামরিক বাহিনী-পুলিশের জোট অন্যদিকে অতিবামপন্থী হিংসাত্মক রাজনীতির কাজকর্ম - দুই দিক থেকে আসা আক্রমণের মুখে পড়ে ছত্রভঙ্গ হয় গ্রাম্য জীবন, শাসক-বিরোধী অসংখ্য রাজনৈতিক কর্মীর মৃত্যু পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে বিষন্নতার সৃষ্টি করে। ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস কিছুটাভালো ফল করে। ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সাথে জোট করে তৃনমূলকংগ্রেস ১৯ টি আসন লাভ করে। মূলত জমি রক্ষার আন্দোলনকে কাজে লাগিয়েতৃণমূল কংগ্রেস এই রাজনৈতিক সাফল্য পায়।

সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, লালগড় এই তিনটিআন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারেরনীতির বিরুদ্ধে কলকাতার শিক্ষা সংস্কৃতি জগতের বুদ্ধিজীবীদের সংঘটিত করতে এসইউসিআই ও নকশালপন্থী দলগুলির বড় ভূমিকা ছিল। এই বুদ্ধিজীবীদের একটি বড় অংশ কৃষক অভ্যুত্থানের সমর্থনে এবং তথাকথিত রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন- তরুণ সান্যাল, সুনন্দ সান্যাল, বিভাস চক্রবর্তী, শাঁওলি মিত্র, কবীর সুমন,শুভাপ্রসন্ন, সমীর আইচ প্রমুখরা। প্রতিবাদপত্রে স্বাক্ষর করেছেন এবং মিছিলে হেঁটেছেন মহাশ্বেতা দেবী, শঙ্খ ঘোষ, অশোক সেন, যোগেন চৌধুরী, জয় গোস্বামী, কৌশিক সেন, ব্রাত্য বসু, সুজাত ভদ্র, দীপঙ্কর চক্রবর্তী, প্রসূন ভৌমিক প্রমুখরা।

রাজনৈতিক ব্যাক্তি ছাড়াও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন সময়ে এই আন্দোলনগুলিতে পাশে দাঁড়াতে এসেছেন মেধা পাটেকর, সুমিত সরকার, তানিকা সরকার, অমিত ভাদুড়ি , অসীম শ্রীবাস্তব, উমাচক্রবর্তী প্রমুখ ও সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদের। এই সমস্ত নাগরিক আন্দোলনের একাংশ, ২০১১সালের বিধানসভা ভোটের আগে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে 'পরিবর্তন চাই' স্লোগান ও হোডিং এ কলকাতা শহর কাঁপিয়ে দেয়। কৃষিজমি

সংক্রান্তনাগরিক আন্দোলন রাজনৈতিকপট পরিবর্তনের সহায়ক হয়।২০১১সালের বিধানসভা নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা। তৃণমূল কংগ্রেস,কংগ্রেস, এসইউসিআই ও অন্যান্য ছোট দল ও বিভিন্ন গণসংগঠনের অলিখিত জোট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ নিয়ে ক্ষমতায় আসে, ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের পতন হয়, তৃণমূল কংগ্রেস একাই ১৮৪ টি আসনে জয় লাভ করে, সিপিআই(এম) মাত্র ৪০টি আসনে জয়ী হয়, মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ভোটে পরাজিত হন।

২১০.২.২.৩ রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তন

২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ‘মা-মাটি-মানুষ’ ও ‘বদলা নয়, বদল চাই’- স্লোগান দিয়ে ক্ষমতায় আসেন। নির্বাচনের আগে থেকেই তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস
পরিচালিত কেন্দ্রের সংযুক্ত প্রগতিশীল জোট বা ইউপিএ-এর অন্যতম বৃহত্তম শরিক ছিল। কিন্তু ২০১২ সলের ১৮ সেপ্টেম্বর বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ সহ অন্যান্য নানা ইস্যুতে সংঘাত ঘটায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইউপিএ থেকে বেরিয়ে আসেন। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাতে তার প্রভাব পড়ে, এখানকার নির্বাচিত কংগ্রেস বিধায়করা সরকার থেকে পদত্যাগ করে। যদিও তাতে মমতাবন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে কোন ধরনের অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়তে হয়নি। পরবর্তীতে বিভিন্ন বাম ও কংগ্রেস দল থেকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সহ অসংখ্য কর্মী, সমর্থকের যোগদান তৃণমূল কংগ্রেসকে পশ্চিমবঙ্গে একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করে। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন ভারতের ইতিহাসে পটপরিবর্তনকারী ঘটনা ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত এন ডি এ জোট সরকার ৩৩৬ টি আসন জিতে, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতাসহ ‘আচ্ছে দিনের’ স্বপ্ন নিয়ে এসে দিল্লীর মসনদে আসীন হয়, প্রধানমন্ত্রী হন নরেন্দ্র মোদী। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস ৩৪ টি, কংগ্রেস ৪ টি, সিপিআই (এম) ২টি ও বিজেপি ২টি আসন জয় লাভ করে। এককভাবে বিজেপির দুটি আসন জয়লাভ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নতুন শক্তির উত্থানের আভাস পাওয়া যায়। এই নির্বাচনের আগে সারদা চিটফান্ড সংক্রান্ত কেলেঙ্কারির জল্পনা তৃণমূল কংগ্রেসের জয়যাত্রার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। পরবর্তীতে ২০১৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস জোট নির্বাচনী প্রচারে বেশ ঝড় তুলেছিল,তারা সরকার গঠনের দাবিও জানিয়েছিল। কিন্তু ভোট বাক্সে তা সেভাবে প্রতিফলন হয়নি। নারদা স্টিং অপারেশন কাণ্ডে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের অনেক নেতা-মন্ত্রীর নাম উঠে আসলেও, সারদা কেলেঙ্কারির মতো বিরোধীরা অনেক হইচই করলেও এই নির্বাচনেও তা খুব বেশি প্রভাব ফেলেনি জনমানুষে। তৃণমূল কংগ্রেস একাই ২১১ টি আসন পেয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় আসে। অন্যদিকে বাম-কংগ্রেস জোট লাভ করে মাত্র ৭৬ টি আসন। বিজেপি জেতে ৩ টি আসন। বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা হন ৪৪ টি আসন জয়ী কংগ্রেসের আব্দুল মান্নান। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় এই প্রথম বামপন্থীরা ৩২ টি আসন পেয়ে নেমে গেল তৃতীয় স্থানে।
২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ তাদের বিভিন্ন গণসংগঠনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে তাদের প্রভাব বাড়াতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে রামনবমী, হনুমান জয়ন্তী সংগঠিত হতে থাকে রাজনৈতিক পতাকার আড়ালে। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের প্রদেয় ইমাম, মোয়াজ্জিন ভাতার পাশাপাশি দাবি উঠে আসে ব্রাহ্মণ ভাতারও। ২০১৮ সালে তৎকালীন সেচমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় ‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্ট’ আয়োজিত সভায় উপস্থিত হন। এই সংগঠন নয় দফা দাবি পেশ করে। ব্রাহ্মণদের মাসিক ভাতার পাশাপাশি গৃহহীন ব্রাহ্মণদের গৃহের ব্যবস্থা, জেলাগুলোতে সংস্কৃত কলেজ গড়ার দাবিও তোলা হয় এই দাবিপত্রে। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবকে

কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যেপ্রতিযোগিতা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এক নতুন ধরণের ধারাকে সংযোজিত করেছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার বিভিন্ন দুর্গাপূজা কমিটিগুলিকে সরকারি অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছে, যা সারা ভারতে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। নবকলরবে বেড়ে ওঠা পশ্চিমবঙ্গ বিজেপিকে রোখার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন রাজনৈতিক কৌশল বিভিন্ন সময়ে অবলম্বন করেছেন। কেন্দ্রের প্রবল প্রতাপশালী নরেন্দ্র মোদি সরকার থাকার সুবাদে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে বিজেপির সংগঠন অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাম-কংগ্রেসের বিরোধী জোটের পরিসর বিজেপি অনেকটা ছিনিয়ে নিয়েছে এ কথা বলা যেতে পারে। তৃণমূলকংগ্রেসকে হারাতে পারে একমাত্র বিজেপি, এই কথা বিজেপি নেতারা জোরের সাথে বারবার বলেছে বিভিন্ন জনসভাতে।২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ফলাফলে তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। এছাড়া ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যে ব্যাপক হিংসার ঘটনা ঘটে তা বিরোধীপক্ষের আমজনতাকে অনেকটা একজোট করেছিল, আর এই সুযোগটি নিয়েছিল বিজেপি। সারা পশ্চিমবঙ্গের ৩৫ শতাংশ আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে গিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। সারা রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বেশিরভাগ বোর্ড গঠন করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। যদিও ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফল এইরকম ছিল না। গ্রাম পঞ্চায়েতে বিরোধীদের সম্মিলিত আসন সংখ্যা কিন্তু তৃণমূলের চেয়ে খুব কম ছিল না। বোর্ড গঠনের নিরিখে বিরোধীরা খুব পিছিয়ে ছিল না শাসক দলের চেয়ে। ২০১৯-এর নির্বাচনে সারাদেশে বিজেপি পরিচালিতএন ডি এ জোটবিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ নিয়ে পুনরায় ক্ষমতায় আসে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস ২২ টি, কংগ্রেস ২ টি এবং সবাইকে অবাক করে বিজেপি ১৮ টি লোকসভা আসন জয়লাভ করে। ১৯৭৭-এর পর এই প্রথম বাংলায় কোন জাতীয় দল এতটা জমি দখল করতে পেরেছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করেছিল, বিজেপি আগামী দিনে বাংলায় সরকার গড়তে চলেছে। ইতিমধ্যে ২০১৯ সালের ১২ ডিসেম্বর নাগরিকত্ব সংশোধন আইন পার্লামেন্টের দুই পক্ষে পাস হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি সম্মতিতে রাষ্ট্রীয় গেজেট প্রকাশের মধ্য দিয়ে আইনের কার্যকর হয়। যা সাড়া দেশ জুড়ে এক আলোড়নের সৃষ্টি করে। স্বাভাবিকভাবে এন আর সি ও সি এ এ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে পক্ষে-বিপক্ষে অসংখ্য মতের তৈরি হয়। বিজেপি নাগরিক সংশোধনী বিলের সমর্থনে মিছিল বের করে। আবার শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়াও সমস্ত বামপন্থী দল, কংগ্রেস-এই বিলের প্রবল বিরোধিতা শুরু করে। জাতীয় নাগরিকপঞ্জি সহ, কোভিড-১৯ অতিমারি সংক্রান্ত সমস্যা, ২০২০ সালের মে মাসের ঘূর্ণিঝড় আমফানের ত্রাণ দুর্নীতি, সরকারি চাকরির পরীক্ষায় অনিয়ম, দুর্নীতি, দল-বদলের রাজনীতি, নির্বাচনী সন্ত্রাস প্রধান নির্বাচনী ইস্যুতে পরিণত হয় ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে। এছাড়াও এর সঙ্গে যুক্ত হয় ‘বহিরাগত তত্ত্ব’, ‘বাঙালি- অ-বাঙালিধারণা’; বাঙালি জাতিসত্তার এই রাজনীতি, স্বাধীনতা পরবর্তী বঙ্গ রাজনীতিতে খুব বেশি দেখা যায়নি। একশ্রেণীর নাগরিক সংগঠন বিজেপিকে রোখার জন্য ‘নো ভোট টু বিজেপি’- ক্যাম্পেন শুরু করে, যা এই নির্বাচনে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। এই নির্বাচনে মূলত তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির দ্বি-মুখী লড়াইহয়েছিল। নির্বাচনের আগে ‘সংযুক্ত মোর্চা’ নামে বামফ্রন্ট, কংগ্রেস ও আইএসএফ নামক ছোট ধর্মীয় সংগঠনের একটি জোট হয় । এই জোটের পক্ষে মাত্র একটি আসন জয় লাভ করে আইএসএফ দল। এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় কংগ্রেস ও কোন বামপন্থী দলের প্রতীকে কোন প্রতিনিধি জয়লাভ করেনি। তৃণমূল কংগ্রেস ২১৩ আসন পেয়ে পুনরায় বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হয়। বিজেপি অনেক আশা জাগিয়ে ৭৭ টি আসনে জয় লাভ করে।তৃতীয় বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

২১০.২.২.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলী ও পত্রপত্রিকা :

১. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, জীবন স্মৃতির ভূমিকা, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ।
২. অতুল্য ঘোষ, কষ্টকল্পিত, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৭১।
৩. জ্যোতি বসু, যতদূর মনে পড়ে, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড,কলকাতা, ১৯৯৮।
৪. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশভাগ: স্মৃতি ও সত্তা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা১৯৯৯, ।
৫.প্রদীপ বসু, নকশালবাড়ীর পূর্বক্ষণ(কিছু পোস্ট মডার্ন ভাবনা), প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৮।
৫.সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিক্ষুব্ধ বাংলা: পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী রাজনীতি (১৯৪৭-২০০৭), রেডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০১৪।
৬. মণিকুন্তলা সেন, সেদিনের কথা, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮২।
৭. বরুন সেনগুপ্ত, পালা বদলের পালা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭১।
৮. অসিত কুমার বসু, পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা।
৯. বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার রূপরেখা প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা ২০০৮।
১০. ৮০ বছরের সিপিআই (১৯২৫-২০০৫), কালান্তর প্রকাশনা, কলকাতা, ২০০৫।
১১. নকশালবাড়ি থেকে লালগড় (এক বহুমাত্রিক ক্রিটিক, ১৯৬৭-২০১২),ভাষান্তর- সুমন কল্যাণ মৌলিক, সেতু, কলকাতা, ২০১৩।
১২.Prafulla K. Chakrabarti, The Marginal men :the refugees and the left political syndrome in West Bengal, Lumidre Books, Kalyani, 1960.
১৩.Sudhir Ray, Marxist Parties of West Bengal(In Opposition and in Government, 1947-2001), Progressive Publisher's, Kolkata,2007.
১৪.Suranjan Das, Premansukumar Bandyopadhyay, Food Movement Of 1959: Documenting a Turning Point in the History of West Bengal, K. P. Bagchi & Co.,Kolkata, 2004.
১৫. Amit Bhattacharya, The 'Spring Thunder' and Kolkata :An epic story of courage and sacrifice 1965-72, Setu Prakashani, Kolkata, 2018.
১৬.Dilip Banerjee, Election Recorder - An Analytical References (West Bengal 1862-2012), Star Publishing House,Kolkata, 2012.

পত্রপত্রিকাঃ প্রবাসী, স্বরাজ, স্বাধীনতা, দিস্টেটসম্যান,আনন্দবাজার পত্রিকা, দি টাইমস অফ ইন্ডিয়া, দি হিন্দু, পরিচয়, দেশ।

২১০.২.২.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

1) Discuss the Political development of West Bengal till the rise of left front government?
2) What was the political situation of West Bengal from 1977-2011?
3) Discuss the significance of the fall of Left front government in West Bengal?
4) Assess the political activities in West Bengal after 2011 till 2021.

পর্যায় – ৩

Political Development

অর্থনৈতিক অবস্থা

সূচিপত্র

২১০.২.২.০ উদ্দেশ্য

২১০.২.২..১ কৃষি ও ভূমি সংস্কার

২১০.২.২.২ বানিজ্য ও শিল্প

২১০.২.২.৩ **সংগঠিত ও অসংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন**

২১০.২.২.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলী

২১০.২.২.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

২১০.৩.১৪.০ উদ্দেশ্যঃ-

বর্তমান পর্যায়টির উদ্দেশ্য হল স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন ও সেই সংক্রান্ত আলোচনা করা।

২১০.২.২..১ কৃষি ও ভূমি সংস্কার

ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ দীর্ঘদিন ধরে দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলোর তুলনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।স্বাধীনতার আগে তেভাগার মতো কৃষক আন্দোলনের ফলস্বরূপ ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি-সংস্কার আইন পাশ হয় ও কার্যকর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৪৯-র পশ্চিমবঙ্গ অ-কৃষিজমি প্রজা আইন অনুযায়ী অ-কৃষি জমিতে প্রজাদের ও উপ-প্রজাদের সমস্ত অধিকার ও স্বার্থ, ভূমি-সংস্করণের অঙ্গ হিসাবে রাজ্যকে ন্যস্ত করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ ভূমি-সংস্করণ আইন ১৯৫৫ অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তির ২৪.৭ একরের অধিক জমি নিজের কাছে রাখার অনুমতি নেই। ইংরেজ আমলের The Bengal Tenancy Act, ১৮৮৫: কৃষকদের দীর্ঘমেয়াদী ঠিকা প্রদান, সফল হয়নি। The West Bengal Bargadar Act, ১৯৫০: বর্গাদার বা ভাগ চাষীদের স্বার্থ রক্ষায় এই আইন গৃহীত হয়। কংগ্রেস শাসনে পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী প্রথা বিলোপ সাধনের জন্য ‘পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী অধিগ্রহণ আইন, ১৯৫৩’ (The West Bengal Estates Acquisition Act, ১৯৫৩) পাশ হয়। এই আইনের ফলে ১৯৫৮ সালের ১৫ এপ্রিল, লর্ড কর্নওয়ালিশ প্রবর্তিত ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান ঘটে। ১৯৫৬ সালে 'পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার' আইন পাশ হয়। উদ্দেশ্য ছিল—জমির পুনর্বণ্টন,জমির মালিকানার ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ,রায়তদের খাজনা হ্রাস।"

বাম শাসনে পশ্চিমবঙ্গে ‘অপারেশন বর্গা’চালু হয় ১৯৭৮ সালে। বর্গাদার বা ভাগ চাষিদের স্বার্থ রক্ষায় এই আইন গৃহীত হয়। এই আইনে বলা হয় বর্গাদার যদি চাষের ব্যয়ভার পুরোটা বহন করে তাহলে ৭৫:২৫ অনুপাতে ফসল ভাগাভাগি হবে। কিন্তু চাষীর দারিদ্রই এখানে বাধ সাধল। চাষের বিপুল ব্যয়ভার বহন করা ক্ষুদ্র চাষীদের দুরূহ হয়ে উঠল। পশ্চিমবঙ্গের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পেক্ষাপটে ১৯৭৮-এর অপারেশন বর্গা এক ঐতিহাসিক ঘটনা। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে এটি ছিল দৃষ্টান্তস্বরূপ। পশ্চিমবঙ্গের ১৯৭০ দশকের ইতিহাসে নজর দিলে দেখা যায়, ক্রমশ আগতউদ্বাস্তু মানুষের চাপ পশ্চিমবঙ্গের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে।পশ্চিমবঙ্গের ১৯৬০-৭০-এর দশক ভূমিসংস্কার ব্যবস্থায় এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। একদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পালাবদল আর অন্যদিকে নানান জমি সংক্রান্ত আন্দোলনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা এক সুনির্দিষ্ট রূপ নেওয়ার দিকে অগ্রসর হয় এবং ১৯৭৮ সালে অপারেশন বর্গার মাধ্যমে ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা কার্যকর হয়।

ভারতবর্ষের একাধিক রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গেও জমিকে কেন্দ্র করে কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন ভাবে ঘটেছে। ১৯৭৮ সালের অপারেশন বর্গা কেবলমাত্র দু’এক দিনের আন্দোলনের ফলাফল নয়,যদিও এর পেক্ষাপট গড়ে উঠেছিল অনেক আগেই। দার্জিলিং জেলার পাশ্ববর্তী এলাকা নকশালবাড়ীতে ১৯৬৭ সালে শুরু হয় কৃষক আন্দোলন।নকশালবাড়ীর এই কৃষক আন্দোলনের উদ্ভাবন পশ্চিমবঙ্গের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অশান্ত করে তোলে। শুরু হয়েও খুব অল্প সময়ে মধ্যে ১৯৭০ সালে এই নকশালবাড়ীর কৃষক আন্দোলন ভেঙ্গে যায়। কৃষক সংগ্রামের এই প্রত্যক্ষ ধারা অস্তমিত হলেও এই আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্যপ্রভাব বিস্তার করে। এহেন নকশালবাড়ীর কৃষক আন্দোলন ১৯৭৮ সালে অপারেশন বর্গার ভিত্তিপ্রস্তরের প্রেক্ষাপট নির্মাণে অনেকাংশে সহায়ক হয়।

এই সময়ে অর্থনৈতিক বৈষম্যের বাস্তব চিত্রটি ছিল অতি দুর্বিসহ। বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়, গ্রামীণ জনসাধারণের ১.৪ অংশ বাদ দিলে, সমগ্র কৃষি পরিবারের প্রায় অর্ধেক পরিবারের জমির মালিকের হাতে ছিল পরিবার পিছু ২.৫ একরের কম পরিমাণ জমি। জমি বণ্টনের চূড়ান্ত বৈষম্যের বাস্তব চিত্রটি শুধুমাত্র নকশালবাড়ী অঞ্চলের ভূমিহীন কৃষক, ক্ষেতমজুর ও বর্গাদারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এই পরিস্থিতি সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র ভূমি কাঠামোতেও পরিলক্ষিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের পক্রিয়াগত জমি বণ্টনের শতকরা হিসাবের তথ্যেও বৈষম্য লক্ষ্য করা য়ায়।পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬০-৬১ খ্রিস্টাব্দে ১২.৭৪ শতাংশ পরিবারের অধীনে মাত্র ২.৩০ শতাংশ একর জমি রয়েছে, য়েখানে কেবলমাত্র ৪.৫০ শতাংশ পরিবারের অধীনে রয়েছে ২৫.৮২ শতাংশ একর জমি। তাই সার্বিকভাবে বলাযায়যে, কৃষিক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের অসাম্যের বাস্তব পরিস্থিতি শুধুমাত্র নকশালবাড়ী অঞ্চলে নয়, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গেই ছিল।

সারা পশ্চিমবঙ্গে জমি মালিকানা সংক্রান্ত বৈষ্যমের সাথে সাথে জমি হারানোর অসহায় পরিস্থিতিও সেইসময় পরিলক্ষিত হয়।পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুরসহ একাধিক এলাকায় কৃষিজীবী সম্প্রদায় অর্থনৈতিক বৈষম্যের সাথে জমি হারানোর কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় এবং এর বিরুদ্ধে লড়াইও শুরু করেন। এই প্রেক্ষাপটে এক প্রকার নতুন ধরনের সমস্যার উদ্ভব ঘটে। পশ্চিমবঙ্গে রায়তরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় অ-চাষযোগ্য পতিত জমিকে চাষযোগ্য করে তোলে। পাশাপাশি এই সময় বনদপ্তর তার সীমানা নির্ধারণের প্রক্রিয়া শুরু করে। বনদপ্তরের সীমানা নির্ধারণের ফলে বহু চাষযোগ্য জমিই বনবিভাগের সীমানার মধ্যে পড়ে যায় এবং বনদপ্তর সেই জমির উপর দখলীস্বত্ব কায়েম করে। এহেন পরিস্থিতিতে বহু কৃষক তার জমির মালিকানা হারিয়ে ফেলে এবং ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়।একদিকে জমির মালিকানাধীন বৈষম্য, অন্যদিকে জমিহারা কৃষক অসন্তোষ— এহেন অগ্নিগর্ভ

পরিস্থিতিতে নকশালবাড়ী আন্দোলনের আঁচ মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম ও অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। সরকারি কর্মচারীরা রায়তশ্রেণীর কাছে জমির জবরদখলকারীতে পরিণত হয়।জমিজমা বিষয়ক একাধিক মামলা হতে শুরু করে। জমি-জমা সংক্রান্ত পায় ২২৯টি মামলা ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে আদালতে জমা পড়ে।

প্রজাস্বত্ত্বের তত্ত্বে কৃষিকাজের ক্ষেত্রে নতুন ধরণের প্রযুক্তিকে ইতিবাচক মনে হলেও, লক্ষ্য করা যায়, এর কিছু নেতিবাচক দিকও রয়েছে। বাস্তব ঘটনা হল আধাসামন্ততান্ত্রিক শ্রেণির জমির মালিকরা দুই দিক থেকে লাভবান হয়। জমির মালিকানাস্বত্ত্ব একদিকে আর অন্যদিকে দাদন ও অন্যান্য ক্ষেত্রের ফলে জমির ব্যবহারিক প্রয়োগ। ফলে ভাগচাষীদের চরম আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে পড়তে বাধ্য হতে হয়। আবার একদিক থেকে লক্ষ্য করা যায় যে কখনও যদি মালিকপক্ষের মানুষের আয় কম হয় তাহলে মালিকরা আবার যারা ভাগচাষী তাদের প্রাপ্য ভাগের উপর ভাগ বসায়।ফলে ভাগচাষীদের দারিদ্র্য আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। অর্থনৈতিক দিক থেকে জমির মালিকানা ভাগচাষীদের এই চূড়ান্ত সমস্যার সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলকে যুক্তিসঙ্গত করে তোলে।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৭ সালেরপূর্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত অশান্ত। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৭ সালে অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন এবং নতুন যুক্তফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতায় আসাটাই ছিল জমি ব্যবস্থার আসন্ন পরিবর্তনের পূর্বাভাষ। স্বাধীনতা পরবর্তী সরকারের তৎকালীন জমিদারদের স্বার্থরক্ষা করাই ছিল লক্ষ্য। কারণ সেই সরকারের নিয়ন্ত্রণকারীরা অধিকাংশই ছিল বড় ধরনের জমির মালিক। এছাড়াও গ্রামের উচ্চবিত্তদের সাথে শাসক গোষ্ঠীর সুসম্পর্ক ছিল। ফলত এই পরিস্থিতিতে গ্রামের গরীব কৃষকদের অবস্থা চরম সঙ্কটে এসে পৌঁছায়। এহেন বাস্তব পরিস্থিতিতে নতুন সরকারের আগমন গরীব কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা ও জমি সংক্রান্ত বিষয়ে পরিবর্তনের এক নতুন অধ্যায়ে সূচনা করে।১৯৬৭ সালে তৎকালীন যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন হরেকৃষ্ণ কোঙার। তিনি সেই বছরেই জুলাই মাসের শেষে ভূমিহীন কৃষকদের স্বার্থে ভূমি রাজস্ব ক্ষেত্রে এক নতুন রূপরেখা ব্যক্ত করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে শুধুমাত্র সরকারি নীতি নির্ধারণ করে ভূমিহীন কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা সম্ভব নয়। এরজন্য পশ্চিমবঙ্গের মানুষের একান্ত সহযোগিতা প্রয়োজন। এই প্রেক্ষিতে তার এক বিশেষ বক্তব্য উল্লেখযোগ্য— 'সৎ অফিসার থাকলেও কেবলমাত্র সরকারী ব্যবস্থায় এই ভূমিসংস্কার সম্ভব নয়।' এই ক্ষেত্রে কৃষকদের সংগঠন 'কৃষক সভা' এগিয়ে আসে এবং চাষীদের স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এই সময়ে তৎকালীন যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে যায়। ঠিক এই সময় জমির দখল ও ফসল রক্ষার কর্মসূচী নেওয়া হয়। এহেন কর্মকাণ্ড বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে পালন হতে থাকে। ভূমিহীন চাষীদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে লক্ষ্য করা য়ায়। তারা বেনামী জমির মালিকদের অবৈধ জমি চিহ্নিত করে। ঠিক এই সময়ে ভাগচাষীরা জমির উৎপন্ন ফসলের বাঁটোয়ারা মাঠের মধ্যেই করার দাবী জানায়। শ্রী কোঙারের প্রশংসনীয় নেতৃত্বে রাজ্য সরকারের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর বেনামীতে রাখা জমি ও চুরি করা জমি প্রায় ৩ লক্ষ একর জমি দখল করে এবং সেগুলি ভূমিহীন কৃষকদের বণ্টন করে। পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় এই জমি দখলের লড়াই ছড়িয়ে পড়ে। স্বাধীনতা পরবর্তী এ হেন জমির দখল ও তা ভূমিহারাদের মধ্যে বণ্টন গ্রাম্য মানুষের কাছে নতুন অধ্যায়ের শুভারম্ভ করে। আইনী ফাঁকফোকর থাকা সত্ত্বেও শ্রী কোঙার মহাশয় এই আন্দোলনের ধারাকে সঠিক উচ্চতা প্রদান করেন।

এহেন সংকটময় প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গ খুব দ্রুত লড়াই সংগ্রামের পথে এগোচ্ছিল। কংগ্রেসকে পরাজিত করে নতুন যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের ক্ষেত্রে জনমানসে এক নতুন জোয়ার তৈরি হতে শুরু হয়। কিন্তু ঘটনা হল এই সময় সরকার কর্তৃক ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত আইন বেশীর ভাগই কার্যকর হয়নি। এক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনের ভূমিসংস্কার বিষয়ক টাস্ক

ফোর্সের অবতারণায় সরকারী কমিটিও স্বীকার করে যে সরকারীসদিচ্ছার অভাবেই ভূমি সংস্কার আইনগুলি ব্যর্থ হয়েছে। কমিটি এ কথাও বলে যে, সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের সাহায্য ছাড়া ভূমি সংস্কারে এগোনো যাবে না।প্রাদেশিক কৃষক সভা তারা তাদের কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করছিল। প্রাদেশিক কৃষক সভা তাদের সংগঠনের মধ্য দিয়ে ভূমিহীন ও প্রায় ভূমিহীন রায়তরা তারা তাদের নিজস্ব চিন্তা চেতনার বিকাশ ঘটাতে শুরু করে। সেই সঙ্গে কৃষক সভার সদস্যপদও বেড়েছিল। এই বিষয়ে বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে পূর্ববাংলা থেকে আসা কৃষিজীবী ভূমিহীন উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গের ভূমি কাঠামোর বিশেষ বাড়তি চাপের সৃষ্টি করে।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ আগত উদ্বাস্তুর বেশি সংখ্যকই পশ্চিমবঙ্গে থেকে যায়। সন্দেহ নেই কৃষকসভার সদস্যপদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এটা একটা বড় কারণ হিসাবে কাজ করে। কৃষকরা তাদের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শুধু অনেক রকমের দাবী অর্জনের করে তা নয় জমির লড়াইয়ে অনেক সফল হয়েছিল। প্রায় ৩.৫ থেকে ৪ লক্ষ একর সরকারী খাস জমি বিলি করেছে, বেনামে থাকা জমি ও কোর্টের ইনজাংশনে আটকে থাকা অনেক জমিও উদ্ধার করে এবং সেই জমি তারা চাষ করেছে এবং ফসলও কেটেছে।

পশ্চিমবঙ্গের এই আন্দোলন সামগ্রিক ভারতবর্ষের পেক্ষাপটে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় উপস্থাপিত হয়। ভূমিসংস্কারকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের এই সফলতা সমগ্র ভারতে ভূমি সংস্কার আন্দোলনকে খুবই বাস্তব রাজনৈতিক প্রশ্নরূপে হাজির করে। সর্বোপরি সরকার এরই মধ্যেই কৃষকদের মধ্যে উদ্যোগ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে শুরু করে। যে পদক্ষেপগুলি উল্লেখযোগ্য সেগুলি হল, উচ্ছেদ বন্ধ করা, বাস্তু জমির অধিকার দেওয়া, উচ্ছেদ বন্ধ করা, চাষযোগ্য পতিত জমির দখল দেওয়া ইত্যাদি আইনের সংশোধন। ভূমি সংস্কার আইনের সংশোধনের উদ্দেশ্যে তিনটি প্রধান আইনের বিলও তৈরি করা হয়। এইসব আইন কানুনের প্রধান বিষয়বস্তু হল কোন ব্যতিক্রম না রেখে পরিবার ভিত্তিক সেচ অঞ্চলে ২০ একর ও অসেচ অঞ্চলে ২৫ একর চাষের সিলিং, ছোট ছোট অকৃষক রায়তদের প্রকৃত প্রয়োজনে স্থায়ী চাষের অধিকার, তাদের তেভাগ এবং নিজের খামারের অধিকার এবং হস্তান্তরিত জমির অভাবের চাপে বা দেনার দায়ে ফেরত ইত্যাদি। তবে বাস্তব ঘটনা হল এহেন একাধিক আইন পাশ হাওয়ার আগেই ভেঙ্গে যায় যুক্তফ্রন্ট সরকার। রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়ে যায়।

ভূমি সংস্কার আইনের একটি সংশোধনী পাশ হয় রাষ্ট্রপতি শাসন কালেই। আইনে বলা হয় একজনের অধিকারের জোতের সীমা বা সিলিং হবে ২.৫০ স্ট্যান্ডর্ড হেক্টর অর্থাৎ সেচ জমি ৬.১৮ একর ও অসেচ জমি ৮.৬৫ একর, দুই থেকে পাঁচ জনের পরিবারের ক্ষেত্রে ৫ স্ট্যান্ডার্ড হেক্টর (১২.৩৬ একর সেচ ও ১৭.৩০ একর অসেচ জমি)। কোন পরিবারের বেশি লোক থাকলে জোতের সর্বোচ্চ পরিমাণ হবে ৭ স্ট্যান্ডার্ড হেক্টর (১৭.৩০ একর সেচ জমি এবং ২৪.২২ একর অসেচ জমি)। বর্গাদারদের জন্য উৎপাদিত ফসলের ভাগ ধার্য করা হয় শতকরা ৭৫ ও জমি মালিকের জন্য শতকরা ২৫। পরবর্তী সময় জমির ঊর্ধ্বসীমা সংক্রান্ত ব্যাপারটি ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে আবার সংশোধিত হয়। সরকার জমির ঊর্ধ্বসীমা নির্দিষ্ট করে দেন। পরিবার পিছু ২.৫ থেকে ৫ হেক্টর, পাঁচ জনের বেশি সদস্য হলে পরিবার পিছু ৫ হেক্টর মাত্র, অর্থাৎ প্রায় একুশ একর নির্ধারণ করে। সেচ ও অসেচ অঞ্চলের মধ্যেকার পার্থক্য করা হয় অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে। এর অন্যতম কারণ ততদিনে সবুজ বিপ্লবের জন্য কৃষিজমির মালিকদের মধ্যে কিছু অংশের অবস্থার উন্নতি ঘটেছে। ভূমি সংস্কার বিষয়ক সরকারের এই সব পদক্ষেপগুলোর জন্যই নতুনভাবে ভূমি ব্যবস্থার রেকর্ড তৈরী করার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই নতুন সেটেলমেন্ট দপ্তরের কানুনগো ইত্যাদিতে নিয়োগ বেড়েছিল। আবার অন্যদিকে তেমনি উদ্‌বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টনের জন্য ১৯৭৪-৭৫ খ্রিস্টাব্দেই প্রত্যেক জেলার

ব্লক স্তরে ভূমি সংস্কার উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়। আর ঠিক এইভাবে অপারেশন বর্গার পথ সুপ্রসস্থ হয়ে উঠেছিল। সর্বোপরি এটি ছিল পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন সরকারের ভূমি সংস্কার কেন্দ্রিক সব থেকে বড় বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। তবে একথা অনস্বীকার্য যে অপারেশন বর্গা একটি রাজনৈতিক গুরুত্ব অর্জনে সক্ষম হয়েছে। আর এই অপারেশন বর্গার সাফল্য - ব্যর্থতার ফল সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। বিষয়টি খুব সচেতন ভাবে লক্ষ করলে বোঝা যায় যে, প্রধানত অপারেশন বর্গা নির্ভরশীল ছিল প্রশাসনিক দক্ষতার উপরের। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে সরকারের নেতৃত্ব সংসদ, কৃষকসভা, গ্রাম পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের এক সম্মিলিত সমন্বয়ে উপর ভিত্তি করেই পশ্চিমবঙ্গের জমি জমায় অপারেশন বর্গা।

১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে বামফ্রন্ট সরকার অপারেশন বর্গা শুরু করে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় রূপায়িত করার সময় ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ও ২৪ জুন কলকাতার আলিপুরে সার্ভে বিল্ডিং-এ এক কর্মশালায় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সিদ্ধান্তে বলা হয় অপারেশন বর্গা সংক্রান্ত পরিকল্পনা এক বছরের মধ্যে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে জুনের মধ্যে শেষ করা হবে। বিশেষভাবে উল্লেখিত হয় কোথায় কবে অপারেশন বর্গার শিবির হবে। তবে এই শিবির স্থাপিত হওয়া নির্ভর করবে সেই সব এলাকার ভাগচাষীদের নির্দিষ্ট সংখ্যার পেক্ষিতে। অপারেশন বর্গার পরবর্তী স্তর ছিল কর্মীদল গঠন করা। সরকারী ব্যক্তিবর্গদের নিয়ে গঠিত এই কর্মীদল সংশ্লিষ্ট এলাকায় অপারেশন বর্গাকে বাস্তবে রূপদান করবেন। এহেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কানুনগো, অধস্তন ভূমি সংস্কার অফিসার, প্রচুর সংখ্যক আমিন ও অন্যান্য প্রমুখ ব্যক্তিগণ। কিন্তু এই গঠিত কর্মীদলের প্রধান নেতৃত্বে ছিলেন স্পেশাল রেভিনিউ অফিসার ও সদর উন্নয়ন আধিকারিক।

অপারেশন বর্গার পরবর্তী স্তর ছিল বিজ্ঞপ্তির যেখানে নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত এলাকায় অপারেশন বর্গা রূপায়িত হতে চলেছে বলে সংশ্লিষ্ট মৌজায় বসবাসকারী জনসাধারণকে বিজ্ঞপ্তির দ্বারা জ্ঞাত করা। বিশেষ লক্ষ্যণীয় ঘটনা হল ঘোষণায় সকলকে উপস্থিত হওয়ার কথা বলা হত এমনকি যাতে জমির মালিকরাও শিবিরে যেন যোগদান করেন। ঘোষণা যাতে সকলের কাছে পৌঁছায় তার জন্য বিজ্ঞপ্তি নির্দিষ্ট জায়গায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হত। বিজ্ঞপ্তির স্থানগুলি হল গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, বিভিন্ন কৃষক সমিতির অফিস, বাজার অঞ্চলে, থানায়, বি.ডি.ও অফিসে ও জে.এল.আর.ও অফিসে। তবে সভাগুলো সন্ধ্যার সময়ে হত। উক্ত সভায় কখনো কখনো সরকারী আধিকারিক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীও যোগদান করতেন। তবে এই সভাগুলির বিশেষ উদ্দেশ্য হল বর্গাদারদের এটা জানানো যে বর্গাদার হিসাবে নাম নথিভুক্তর ফলে তাদের কোন কোন অর্থনৈতিক এবং আইনী অধিকার, সুযোগসুবিধা পাবেন। বর্গাদার ব্যক্তিবর্গরা যাতে নির্ভয়ে তাদের বক্তব্য বলতে পারে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। সেই সঙ্গে বর্গাদারদের রেকর্ডভুক্তকরণের বিষয়ে বিভিন্ন প্রকারের তথ্য সংগ্রহ করা হত এই সমস্ত সভাতে। সকলের অবগতির জন্য সংগৃহীত তথ্যগুলি প্রকাশ করা হত নির্দিষ্ট এলাকায়। সেই সঙ্গে কোন ব্যক্তিবর্গের কোন আপত্তি বা বক্তব্য আছে কিনা তা জানার জন্যও পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহাসিক ভূমি সংস্কারের এটাই ছিল এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক। এর ফলে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের সাথে সরকারি শাসনব্যবস্থার সেতুবন্ধ ঘটেছিল। আমজনতার সাথে শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। যেখানে সাধারণ জনগণের কাছে শাসক গোষ্ঠীর প্রতি ভীতিভাব অনেক প্রশমিত হয়েছিল।

অপারেশন বর্গা প্রক্রিয়ার পরবর্তী স্তর জমি বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও সেইগুলি যাচাই করা। যেখানে নির্দিষ্ট কোনও এলাকায় বর্গাদার অধীনস্ত জমি কত ছিল তা জ্ঞান হওয়া এবং সেই এলাকায় অপারেশন বর্গা রূপায়িত করার ক্ষেত্রে সঠিক অংশ নির্ধারণ করা যায়। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে ২৩ ও ২৪ জুন ভূমি সংস্কারের চতুর্থ কর্মশালার আয়োজন হয়। কারণ বর্গাদারদের চিহ্নিত করা ও তাদের নাম দ্রুত নথিভুক্তকরণের ব্যবস্হা করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে এটা উপলব্ধি হয় যে বর্গাদারদের নাম নথিভুক্তকরণের ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত কিংবা অস্বাভাবিক দেরি

বর্গাদারদের স্বার্থকে ক্ষুণ্ন করবেই সেই সঙ্গে গোটা অপারেশন বর্গার প্রক্রিয়াও ব্যহত করবে। এছাড়াও বর্গাদারদের নাম নথিভুক্তকরণ সংক্রান্ত বিষয়টিও ছিল যেখানে জমির মালিকের আপত্তিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অপারেশন বর্গার প্রতিটি ধাপই ছিল প্রশাসনিক ব্যক্তিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এ কথা বলাই যায়।

পশ্চিমবঙ্গে বাম শাসনকালের একটি অন্যতম অধ্যায় হল ভূমি সংস্কার ও অপারেশন বর্গা। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ মানুষের জীবনে এর প্রভাব ছিল অপরিসীম। দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'Land Labour and Government' বইতে ভাগচাষী শম্ভু টুডুর কথা তুলে ধরেছেন, যা বর্গাদারদের নাম নথিভুক্তকরণ সংক্রান্ত বিষয়ে সাথে জড়িত। এছাড়াও বেশ কিছু সরকারী নিয়ম ভাগচাষীদের নাম নথিভুক্তকরণের কাজকে কিছুটা ব্যাহত করেছিল। যেমন বিকেল চারটে পর্যন্ত নাম নথিভুক্তকরণ করা হত, কিন্তু বেশীরভাগ ভাগচাষী সেইসময় চাষের কাজে যুক্ত থাকতো। এছাড়াও এই সমস্ত নাম নথিভুক্তকরনের অফিস বেশীরভাগ গ্রামের পাকা দালান বাড়িতেই বসত সেখানে প্রভাবশালী মানুষের ওঠানামা বেশী ছিল, তার ফলে গ্রামের প্রান্তিক ভাগ-চাষীদের মনে অনেক সময় নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টি কাজ করত। এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক চাপ, পারস্পরিক বোঝাপড়ার পরিবেশের অভাব ও শারীরিক নিগ্রহের ভয় এই প্রক্রিয়াকে ব্যহত করেছিল। এই সব বিভিন্ন রকম সমস্যা সত্ত্বেও ১৯৭৮ থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে পায় ১২ লাখ বর্গাদার রেকর্ডভুক্ত করে, পরে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। পশ্চিমবাংলার প্রায় ৮০-৮৫ শতাংশ বর্গাদার রেকর্ডভুক্ত হন। এটা সরকারের একটি বড় সাফল্য ছিল বলেই বলা যায়। সম্প্রতি ১৯৫৫-র পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার ২০১৪-তে সংশোধন করা হয়। এতে বলা হয় যে,বৃহৎ আবাসন প্রকল্পের উন্নয়নের অনুমতি আছে। অনুচ্ছেদ ১৪Y অনুসারে শিল্পপতিদের তিন বছরের পরিবর্তে সর্বাধিক পাঁচ বছরের জন্য ২৪ একর অব্যবহৃত বন্টিত জমি রাখার অনুমতি আছে।বিভিন্ন প্রকারের শিল্পোদ্যোগ যেমন পরিবহণ বা টার্মিনাল, রসদ কেন্দ্র, আর্থিক ও রসদ কেন্দ্র, শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, তেল, গ্যাস, পণ্য পরিবহন, খনন এবং এর সাথে জড়িত ক্রিয়াকলাপগুলির জন্য চিহ্নিত জমিগুলির সর্বোচ্চ সীমাতে অব্যাহতি করা হয়েছে।

একথা ঠিক বামফ্রন্ট পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিসংস্কারের অপারেশন বর্গা একটি মূল্যবান তত্ত্ব। এই তত্ত্বের সার্থক প্রযোগের ফলে কৃষির উন্নয়ন কাঙ্ক্ষিত। পশ্চিমবঙ্গের কৃষি অগ্রগতির সমস্যা তথ্য বিশ্লেষণ করে কৃষি অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ জেমস বয়েস দেখিয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে ১৯৪৯-৮০ পর্যন্ত সময়কালে কৃষির উৎপাদনের বৃদ্ধি হার ছিল - ১.৭৪ শতাংশ, যা পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারের চেয়েও অনেক কম। ১৯৪৯-৬৪ এই পনেরো বছরে বৃদ্ধির হার ছিল ১.৪৬ শতাংশ। তারপর পরবর্তী ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত এই বৃদ্ধির হার কিছুটা বেড়ে হয় ২.২৫ শতাংশ। ১৯৭৭ সালে নবনির্বাচিত বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে কৃষি ক্ষেত্রে সংস্কার শুরু হয়। কৃষির ওপর গুরুত্ব প্রদানধারাবাহিকভাবে কৃষি উৎপাদনে সুফল দান করে। সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন ভূমি সংস্কার, বর্গাদার নথিভুক্তিকরণ, খেতমজুর ও প্রান্তিক চাষীদের মধ্যে সিলিং বহির্ভূত বাড়তি জমির বিলিবন্টন ব্যবস্থা, দরিদ্র কৃষকদের কৃষি সরঞ্জাম প্রদান, জল সেচের উপর সকলের অধিকার, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থার কার্যকারণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।১৯৭৬-৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে মোট চালের উৎপাদন ছিল ৫৯ লক্ষ মেট্রিক টন, ২০১০-১১ সালে এই উৎপাদন ১৪০ লক্ষ মেট্রিক টনে পৌঁছায়। যা সারা দেশের মধ্যে প্রথম স্থানে ছিল। ১৯৭৬-৭৭ সালে এ রাজ্যে আলু উৎপাদন ছিল ১৭ লক্ষ মেট্রিক টন সেই উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০০ মেট্রিক টনের বেশি, যা ছিল সারা দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে। কৃষিজাত সমস্ত পণ্য উৎপাদনের বৃদ্ধিরহার প্রমাণ করেছে ধাপে ধাপে কৃষির উন্নতি হয়েছে। কৃষি শস্য উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটেছে। সবজি উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে প্রথম স্থান পেয়েছে। ১৯৭৭ সালের পর থেকে কৃষি পরিকাঠামোর সংস্কারের চাপে

জোরদার ও মহাজনদের দাপটের অনেকটা অবসান ঘটেছে। জমির উপর অধিকার লাভের ফলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী আত্মবিশ্বাস পেয়েছে, ফলে চাষে মনোযোগী হয়েছে ফলে ফসল উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাংক থেকে কৃষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে কম সুদে কৃষকদের লোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বন্যা, অনাবৃষ্টি ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে লোন মুকুবেরও ব্যবস্থা করেছে সরকার। তার ফলে কৃষকদের আর্থিক দিক থেকে অনেক সুবিধা হয়েছে। বর্তমানে, সরকার ব্লকে ব্লকে কৃষক বাজার তৈরি করেছে। কৃষকদের সুবিধার জন্য নির্ধারিত মূল্যে ধান কেনার ব্যবস্থা করেছে সরকার। তবে ফড়ে বা মহাজনদের করাল গ্রাস থেকে থেকে দরিদ্র কৃষকের মুক্তি এখনো সর্বাঙ্গে ঘটেনি। কিন্তু বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেখা য়াচ্ছে কৃষকরা উৎপাদনে অক্ষম হচ্ছে। ঋণগ্রস্ত চাষীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে, ঋণগ্রস্ত চাষী আত্মহনন করছে, তৈরী হচ্ছে এক ধরণের সামাজিক অস্থিরতা।

২১০.২.২.২ বানিজ্য ও শিল্প

ব্রিটিশ শাসিত অবিভক্ত বাংলা প্রদেশে বিভিন্ন শিল্প গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পাট, লৌহ, চা, চর্ম ও বস্ত্র শিল্প। ব্রিটিশ শাসনকালের প্রথম দিকে কলকাতা ভারতের রাজধানী থাকার প্রশাসনিক সুবিধার সাথে অবিভক্ত বাংলা প্রদেশের অনুকূল কৃষিজাত পণ্য ও খনিজ সম্পদের উপর নির্ভর করে প্রচুর ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প গড়ে ওঠে। কোম্পানী ও ব্রিটিশ আমলে অবিভক্ত বাংলাদেশ শিল্পে ভারতের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল তা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। স্বাধীনতার প্রাকমুহূর্তের (১৯৪৬) একটি পরিসংখ্যান দেখলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়, যেখানে বাংলাতে শিল্প শ্রমিকের অনুপাত ছিল শতকরা ৩৩.৬২ শতাংশ যা সেই সময় ভারতের মধ্যে প্রথম ছিল।
স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতবর্ষের উন্নয়নকে আত্মনির্ভর করে তোলার জন্য ভারী শিল্পের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলস্বরূপ ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের শিল্পে সরকারী ও বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধির অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং ও ভারী শিল্পের অনুপাত অন্যান্য শিল্পের তুলনায় অনেকাংশে বেশী ছিল তাই পশ্চিমবঙ্গে সেই সময়কালে শিল্পের বৃদ্ধির হার যথেষ্ট ভালো ছিল। ১৯৫৯ ও ১৯৬৫ এই দুই সালের পরিসংখ্যান দেখলে দেখা যায় দেশের মধ্যে শিল্পে শ্রমিকের সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল প্রথম ও ভ্যালু অ্যাডেডের দিকে দ্বিতীয় ছিল।
দেশভাগের রাজনৈতিক অস্থিরতা কাটিয়ে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি পুনরায় ফিরে আসে। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিধানচন্দ্র রায়ের কার্যকলাপে কিছুউদ্যোগী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গকে শিল্প সমৃদ্ধ প্রদেশ হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতেন। শিল্পায়নের জন্য বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমাকে ইউরোপের অন্যতম উন্নত জায়গা জার্মানীর ‘রূঢ় অঞ্চলের’ সাথে তুলনাও করতেন। তিনি চিত্তরঞ্জনে রেল ইঞ্জিন নির্মাণ কারখানা, রূপনারায়ণপুর হিন্দুস্থান কেবলস, দুর্গাপুর স্টিল প্লান্ট, দুর্গাপুর কেমিক্যালস, দুর্গাপুর প্রোজেক্টস, দুর্গাপুর অ্যলয় স্টিল, মাইনিং এন্ড অ্যালায়েড ম্যানুফ্যাকচারিং কর্পোরেশন ছাড়াও বহু বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। এছাড়াও তিনি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড, ক্যালকাটা স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন, নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন, হরিণঘাটা ডিয়ারী, কল্যাণী শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। বেসরকারী ক্ষেত্রে হিন্দুস্তান মোটরস, ইম্পেরিয়াল কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ, অ্যালবার্ট ডেভিড, বেঙ্গল কেমিক্যাল, গ্লুকোনেট, বেঙ্গলী ইমিউনিটির গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও তাঁর একান্ত সহযোগিতা ছিল। এছাড়াও বাঙালির ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা দে’জ মেডিকেল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তাঁর একটা বড়

ভূমিকা ছিল। 'ইউনাইটেড প্রেস অফ ইন্ডিয়া' (ইউপিআই) নামক নিউজ এজেন্সির প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন বিধানচন্দ্র রায়। ১৯৪৮ সালে আর্থিক কারণে এই সংস্থাটি বন্ধ হয়ে গেলে পরবর্তীতে ১৯৬০-এর গোড়ায় 'ইউনাইটেড নিউজ অফ ইন্ডিয়া' (ইউ এন আই) নাম দিয়ে এই পুরনো প্রতিষ্ঠানকেই বিধানচন্দ্র রায় আবার পুনরুজ্জীবিত করে দিলেন। ১৯৫৯-৬০ এর দিকে বিধান রায়ের শেষ জীবনের দিকেও আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যালকে বাঁচানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। ভারতের সব বড় শিল্পপতিরা বিধানচন্দ্র রায়কে তাদের সুহৃদ ও পরামর্শদাতা বলে গণ্য করতেন।বিধানচন্দ্র রায়ের আগ্রহে পঞ্চশের দশকের শুরুতে 'টুরিস্ট ব্যুরো' গঠিত হয় যখন ভারতবর্ষের আর কোন রাজ্যে পর্যটন উন্নয়নে মনোযোগী হয়নি। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে সরকার বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন করে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন শিল্পকে পরিকাঠামো দিক থেকে উন্নত করে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার ব্যবস্থা করেছে।

বিধানচন্দ্র রায়ের দূরদর্শিতার অন্যতম বিষয় ছিল নগর পরিকল্পনা। কলকাতা শহরের উপর অত্যাধিক জনবসতির চাপ কমানোর জন্য ও বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের বসবাসের জন্য তিনি বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি দ্রুত কল্যাণী উপনগরী কাজ শেষ করার উপর জোর দেন। পূর্ব ও উত্তর কলকাতার একাধিক হাউজিং স্টেট এর কাজ শুরু করলেন। 'কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট'কে দিয়ে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রমিকদের জন্য একাধিক আবাসন প্রকল্পের সূচনা করেন। এছাড়াও সল্টলেকের জমি বন্টন কেবলমাত্র মধ্যবিত্তবাঙালীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে নিয়মবিধি রচনা করে বিধানসভায় বিবৃতিও দিয়েছিলেন। গঙ্গার দুই পাড়ে হুগলির বাঁশবেড়িয়া থেকেচব্বিশ পরগনার জেলার বজবজ পর্যন্ত সমগ্র এলাকার নাগরিক স্বাচ্ছন্দ বিধানের জন্যপরিকল্পনা রচনা করেন। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য গড়ে তুলেছিলেন 'কলকাতা মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন' (সিএমপি)।যদিও বামপন্থী দলগুলি কংগ্রেসের, বিশেষত বিধান রায়ের শিল্পনীতির বিপক্ষে গিয়ে বলে ব্রিটিশ আমলে শিল্প উন্নত প্রদেশ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের যে সুনাম ছিল কংগ্রেসের সময়কালে তার অবনতি ঘটেছে।

ষাটের দশকের শেষ দিক থেকেই দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের শিল্পে পিছিয়ে পড়া শুরু হয়। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের এই পিছিয়ে পড়ার কারণ হিসাবে কতগুলি বিষয়কে ভাবা যেতে পারে। স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গের যেসব শিল্পের প্রাধান্য ছিল সেগুলি বেশীরভাগই বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তৈরি হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীকালে নতুন শিল্প স্থাপনে পশ্চিমবঙ্গ অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পিছিয়ে পড়ে ফলে শিল্প বিন্যাসে বিশেষ কোনো পরিবর্তন আসেনি। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রেল ওয়াগন, লৌহশিল্পের চাহিদা কমে যায়, আর এই শিল্প গুলি পশ্চিমবঙ্গে সমৃদ্ধ ছিল। ফলে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পে মন্দার লক্ষণ দেখা যায়। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের মাশুল সমীকরণ নীতি, রাজ্য সরকারের উদাসীনতা ও স্থানীয় উদ্যোগের অভাবকেও এই অবনতির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এছাড়াও ষাটের দশকের শেষ দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক টালমাটাল অবস্থা শিল্পের পরিবেশকে ব্যাহত করে। বামপন্থী রাজনৈতিক আদর্শে পরিচালিত শ্রমিক সংগঠনগুলি তাদের দাবি পূরণের জন্য বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মালিকপক্ষের সাথে সরাসরি সংঘাতে লিপ্ত হয়। ফলে বহু কারখানা মালিক-শ্রমিক বিরোধের ফলেই বন্ধ হয়ে যায় ও বহু শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়ে। ১৯৬৯ সালের একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় ৯৩.০৮ লক্ষ শ্রম দিবস এই বিরোধের ফলে নষ্ট হয়। এই বিপুল শ্রম দিবস নষ্ট, শ্রমিকরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তেমনি বিনিয়োগকারীদেরমধ্যেও একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।তবে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের উন্নতির উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৬ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে। পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগমকে শিল্প পুনরুজ্জীবনের জন্য বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন

অঞ্চলে যাতে উন্নতির সামঞ্জস্যতা বজায় থাকে সেই উদ্দেশ্যে ৮ টি 'শিল্প উন্নয়ন কেন্দ্র' খোলা হয়। 'পশ্চিমবঙ্গ আর্থিক নিগম' রুগ্ন সংস্থাগুলিতে প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য ১৯৭৪-৭৫ সাল নাগাদ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রায় চার কোটিরও বেশি অনুদান হিসেবে প্রদান করে। প্রায় ১৪ টি বস্ত্র সংস্থা যেগুলো অলাভজনক হয়ে পড়েছিল সেগুলোকে 'জাতীয় বস্ত্র সংস্থার' আওতায় আনা হয়। কেন্দ্র ও রাজ্যে যৌথ উদ্যোগ এই সমস্ত রুগ্ন সংস্থাগুলিকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা হয়। মধ্যস্থতাকারী হিসাবে সরকার শ্রমিক, মালিক পক্ষকে নিয়ে বেশ কিছু বন্ধকারখানা খোলার চেষ্টা করে ও সফলও হয় এই সময়ে। বেশকিছু সংস্থাকে সরকারের পরিচালনাধীনে আনা হয়, কল্যাণীর ইউল বেলটিং কারখানা তার মধ্যে অন্যতম ছিল।

১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পালা বদল হলে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে। নতুন সরকার ১৯৭৮ সালেশিল্পনীতি ঘোষণা করে। নবনির্বাচিত বামফ্রন্ট সরকারের মূল লক্ষ্য ছিল- শিল্পে অচলাবস্থা অবস্থার সৃষ্টি হওয়ার প্রবণতা রোধ করে শিল্পকে সঞ্জীবিত করে তোলা, বেকারী বৃদ্ধি রোধ এবং কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে আরো বেশি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বৃদ্ধিতে উৎসাহ দান, রাজ্যের অর্থনীতির উপর থেকে একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠী এবং বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বজ্র আঁটুনি শিথিল করা, দেশজ প্রযুক্তিবিদ্যা এবং শিল্পে স্বনির্ভরতায় উৎসাহদান, সরকারী ক্ষেত্রের ক্রমপ্রসার, শিল্পক্ষেত্রের উপর প্রকৃত উৎপাদকের অর্থাৎ শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ বাড়ানো। এছাড়া প্রযুক্তিগত সাহায্যের ব্যাপারে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর উপর নির্ভর করা উচিত হবে বলে মনে করে।

নবনির্বাচিত বামফ্রন্ট সরকার কৃষি ও ভূমি বন্টনের উপর গুরুত্ব বেশি দেয়। এছাড়াও শ্রমিক সংগঠনগুলি রাজ্য সরকারের মদতপুষ্ট হয়ে বিভিন্ন শিল্প-সংস্থাতে ছড়ি ঘোরাতে থাকে।ব্যাপক ঘেরাও, জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন তুলনায় অনেকটা কমে আসলেও কিছুটা কর্ম বিমুখতা ও বিভিন্ন দাবিদাওয়া আদায়ের আন্দোলনে মালিকপক্ষ অনেকটা কোণঠাসা হয়ে পড়ে এবং ক্রমশ রাজ্যে বিনিয়োগের পরিমাণও কমতে থাকে। শ্রমিক সংগঠনগুলির এই অনমনীয় আন্দোলন যে নেতিবাচকমনোভাবের সৃষ্টি করেছিল শিল্প মহলে তা আজও অনেকাংশে দূর হয়নি।এছাড়াও কেন্দ্রের আলাদা মতাদর্শের রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের শাসক গোষ্ঠীর রাজনৈতিক বিরোধ শিল্প উন্নয়নের পরিবেশকে কিছুটা ব্যাহত করে। বিভিন্ন আর্থিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের একচেটিয়া অধিকার রাজ্যের আর্থিক উন্নতির বিষয়ে নেতিবাচক দিক হিসেবে উপস্থিত হয়েছে অনেক সময়। এছাড়াও বিভিন্ন পরিসংখ্যানে দেখা যায় বিভিন্ন রাজ্যের তুলনায় পরিকাঠামোর অভাব পশ্চিমবঙ্গের শিল্প বিকাশের অন্যতম অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, বিশেষত বিদ্যুতের অভাব, যা ভারী শিল্পে বিদ্যুতের প্রভাব অনস্বীকার্য।

তবে বৃহৎ শিল্পের বিকাশের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার অনেক বেশি ঘটেছে। ১৯৯০-এর দশকে আমরা যে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পে উন্নতি দেখতে পেয়েছি তার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল এই ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ। ১৯৯০-এর দশকের শুরুতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্পনীতিতে কিছু পরিবর্তন আসে। ১৯৯৪ সালে নতুন শিল্পনীতি গ্রহণ করা হয়।
বিশেষ কিছু
শিল্পকে পশ্চিমবঙ্গের প্রাকৃতিক সম্পদ, মানবসম্পদ ও পরিকাঠামো উপযোগী বলে চিহ্নিত করা হয়। খনিজ, পেট্রো-কেমিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তি, বস্ত্র, চর্ম, চা, রবার, ঔষধি গাছ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, পর্যটন, জুয়েলারী শিল্প স্থাপনের উপর জোর দেওয়া হয়। এছাড়াও বেশ কিছু সরকারী পরিচালনাধীনসংস্থাকে সম্পূর্ণ বেসরকারী করার নীতি নেওয়া হয়েছে। শ্রমিক আন্দোলনকে ত্রিপাক্ষীয় মধ্যস্থতায় দ্রুত নিষ্পত্তির কথা বলা হয়েছে, নতুন শিল্প স্থাপনে বিভিন্ন প্রকার কর ছাড়ের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে, প্রশাসনিক শিথিলতা ঘটিয়ে অতি দ্রুত শিল্প

সংস্থাগুলিকে সরকারী আইনের সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। জেলা, ব্লক স্তরে প্রশাসনিক স্বচ্ছতার কথা বলা হয়েছে যাতে বিনিয়োগকারীরা কোনরকম প্রতারণার মুখে না পড়েন। পরিকাঠামোগত বিভিন্ন উন্নতি রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপরেও অনেক অংশ জোর দেওয়া হয়। ১৯৯৪ সালে টাটা গোষ্ঠী,চ্যাটার্জি গোষ্ঠী,ইন্ডিয়ান ওয়েল ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মধ্যে চুক্তি হয় এবং হলদিয়া পেট্রো-কেমিক্যালসের নির্মাণ শুরু হয়। পরবর্তীতে বীরভূমে চালু হয় বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র,সল্টলেক ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স গঠিত হয়। যদিও এইসব নীতি নির্ধারণের ফলেও পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। ডানলপের মতো বৃহৎশিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কম্পিউটারের মতো নতুন প্রযুক্তিকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও কর্মচারীদের আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর সরকারের শিল্পনীতিতে পরিবর্তন আসে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্লোগান ছিল, 'ডু ইট নাউ'। মূলত পশ্চিমবঙ্গের সরকারি অফিসে কর্মসংস্কৃতি ফেরাতে এই স্লোগানের উদ্ভব। তবে ওই স্লোগানের পরেও কর্মসংস্কৃতি ফিরেছিল কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অনেকেই। ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের 'প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা' পরিকল্পনার ঘোষণা পরবর্তীতে গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করে। সারা দেশের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব সহজ হয়ে ওঠে। পরিবহনের এই সুবিধা ব্যবসা-বাণিজ্য একটা গতি আনে। তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই গতির সাথেই তাল মেলাতে চাইছিল। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সরকার সেক্টর ফাইভে বিভিন্ন তথ্য প্রযুক্তির সংস্থাকে আনতে সক্ষম হোন। ইন্দোনেশিয়ার সালেম গোষ্ঠী ও পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনীতে জিন্দল গোষ্ঠীকে নিয়ে এসে শিল্প স্থাপনের একটা চেষ্টা চালানো হয়। জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে তাদের পুরনো নীতি নির্ধারণের অনেক পরিবর্তন ঘটে। বিতর্কিত 'স্পেশাল ইকোনমিক জোন' ভারতবর্ষে অন্যান্য প্রান্তের মতো খুব বেশি পশ্চিমবঙ্গে গড়ে ওঠেনি বিভিন্ন বাম দলগুলি রাজনৈতিক আন্দোলনের কারনে। 'কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ'-পরবর্তীতে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সরকারের অন্যতম স্লোগান হয়। শিল্প স্থাপনের একটা আন্তরিক সদিচ্ছা এই সরকারের মধ্যে দেখা যায়। পরবর্তীতে সিঙ্গুরে টাটার মোটর গাড়ি তৈরিকে কেন্দ্র করে ও নয়াচর, নন্দীগ্রামে জমির অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আন্দোলন সারাদেশে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে একটি নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে নতুন সরকার গঠিত হয় ২০১১ সালে, যারা এই নেতিবাচক ধারণাকে অতিক্রম করে বিভিন্ন শিল্প সম্মেলন করে শিল্প স্থাপনের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করার চেষ্টা করে চলেছে।

২১০.২.২.৩ **সংগঠিত ও অসংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন**

ভারতের তথা বাংলায় শ্রমিক আন্দোলনের শুরু হয়েছিল স্বাভাবিকভাবেই কৃষক আন্দোলনের পরে। ১৮৫৩ সালে ভারতে রেলপথের পত্তন আধুনিক কলকারখানা গড়ে ওঠার প্রথম ধাপ ছিল। তাই বলা যেতেই পারে রেলপথ ছিল ভারতের সত্যকার আধুনিক শিল্পের অগ্রদূত। ব্রিটিশ

ভারতে বঙ্গ প্রদেশে চট শিল্প ও চা শিল্প বিস্তার লাভ করলে শ্রমিক চেতনাও গড়ে উঠতে থাকে আস্তে আস্তে। ১৮৬২ সালে হাওড়ার লিলুয়াতে আট ঘন্টা কাজের দাবিতে রেল শ্রমিকদের ধর্মঘট সারা দেশের মধ্যে অন্যতম ছিল। যদিও তার পূর্বে ১৮৫৬ সালে গঙ্গা নদীর মাঝিরা সরকারী কর নীতিরবিরুদ্ধে ধর্মঘটে সামিল হয়েছিলেন। এই সময় শ্রমিকরা সেভাবে সংগঠিত ছিল না একথা সত্য, এই সমস্ত আন্দোলনগুলো ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। শ্রমিক চেতনা গড়ে উঠলেও তা সাংগঠনিক স্তরে এসে পৌঁছায়নি। মূলত শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ১৮৭৪ সালে শ্রমজীবী সমিতি নামে একটি শ্রমিক সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৮৯০ সালের পর থেকে কিছুটা সংগঠিতভাবে শ্রমিক ধর্মঘট শুরু হয়। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধেও হাওড়ার বার্ন কোম্পানির শ্রমিকেরা এবং চটকল, ট্রাম, রেলের শ্রমিকরা বিক্ষোভ দেখায়। এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই অনেক বড় বড় শ্রমিক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে বাংলায়। ১৯২০ সালে অক্টোবর মাসে গঠিত হয়েছিল শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠন 'এ আই টি ইউ সি'। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রত্যেকটি পর্যায়ে বাংলা প্রদেশের শ্রমিকরা গর্জে উঠেছিল। প্রত্যক্ষভাবেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে বিভিন্ন কর্মসূচীতে তারা অংশগ্রহণ করেছিল। ১৯২৬ সালের ট্রেড ইউনিয়নের এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে রেজিস্ট্রিকৃত ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ছিল ৫৬২। এই সংখ্যা ১৯৪৫-৪৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হলো ১০৮৭। শ্রমিক নেতা আব্দুল মোমিনের ১৯৪৩ সালের একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায় চটকলে (৪৬১৭), ট্রাম ইউনিয়নের (৩০০০), রেলওয়ে (২১০০), সুতাকলে (৪৬২৯) সদস্য সংখ্যা আছে, যা ক্রমশ বাড়ছে। বাংলা প্রদেশের শ্রমিক আন্দোলনের এই ঐতিহ্য ও ধারা স্বাধীনতার পরেও পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যমান ছিল।

স্বাধীনতা পরবর্তী পঞ্চাশের দশকটা ছিল বিভিন্ন শিল্প, কারখানার ও অফিসের কর্মচারী - শ্রমিকদের অসংখ্য জঙ্গি সংগ্রামে ভরাদশক। মূলত কমিউনিস্ট পার্টির ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বেই এই সমস্ত আন্দোলন গুলি সংগঠিত হয়। এই আন্দোলনকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল দার্জিলিং, তরাই ও ডুয়ার্স চা বাগান, পোর্ট, ট্রাম, বাস ও ট্রান্সপোর্ট, টিটাগড় কাগজ মিল, রানীগঞ্জ সিরামিক কারখানা, গ্রামোফোন, উইমকো, বেঙ্গল ল্যাম্প, হনুমান ও বাঁশবেড়িয়া চটকল, কুলটি লৌহ ইস্পাত কারখানায়, শালিমার পেইন্ট, বাঁকুড়া ও কোচবিহারের বিড়ি শ্রমিকরা, এবংব্যাংক, রেলওয়ে, পেট্রোলিয়াম ও খাদ্য বিভাগের কর্মচারীরা এবং আরও অনেকে। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল চা বাগান ও ট্রাম শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ ধর্মঘট, পূজার সময় অগ্রিম বেতনের দাবিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের মিলিত সংগ্রাম, কর্মচারীদের রাষ্ট্রীয় বীমা পরিকল্পনার প্রতিবাদে হাওড়ার চটকল শ্রমিকদের সংগ্রাম। ১৯৫৪-এর শিক্ষকদের বেতন ও মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির আন্দোলন একটি গণ আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের বড় বড় জনসমাবেশ, ব্যাপক ঘেরাও ও সাধারণ ধর্মঘটের পর শাসকগোষ্ঠী আরও বেশী সুবিধাদানের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বিভিন্ন শাস্তি মূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে শ্রমিকদের এই আন্দোলনগুলিকে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করে, কিছু ক্ষেত্রে এই কৌশল সফল হয়। এই সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন গুলিতে মূলত কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট দল মনোনীত শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষমতা বিস্তারে একটা লড়াই চলতেই থাকে। কমিউনিস্ট পার্টি নিয়ন্ত্রিত ট্রেড ইউনিয়নগুলি বিভিন্ন জনপ্রিয় দাবি তোলে যেমন, সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে স্বীকার করা এবং শ্রমিক- কর্মচারীদের পক্ষ থেকে ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব ও আলাপ-আলোচনা অধিকারকে মেনে নেওয়া। শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট ও পিকেটিং এর অধিকার, শ্রমিক - কর্মচারীদের চাকরীর স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা বিধান এবং পূর্বোক্ত সমস্ত অধিকারের স্বীকৃতির ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের জন্য শিল্প সম্পর্ক বিষয়ে একটি আইন প্রণয়ন। এছাড়াও, নূন্যতম জাতীয় মজুরী নির্ধারণ, শ্রমিকরা যাতে নূন্যতম উপযুক্ত মজুরী পায় তার জন্য তাদেরকে সাহায্য করা, পূর্বোক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধির পরিপূরক হিসেবে অন্তবর্তীকালীন মাহিনা বৃদ্ধির ব্যবস্থা, শ্রমিকদের জন্য বোনাসের অধিকার, শ্রমিক

কর্মচারীদের জন্য সামাজিক বীমা এবং বীমা ব্যবস্থাকে সব ধরনের শ্রমিকের জন্য উপযোগী করা, শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ করে কর্মচারী বীমা ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ সংশোধন, সমস্ত শিল্পে অবিলম্বে ২৫ টাকা বেতন বৃদ্ধি, কলকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানী, কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন এবং ইংরেজ মালিকানাধীন চা বাগানগুলির জাতীয়করণের দাবী, সমস্ত বিদেশীকোম্পানীতে চাকরিতে দ্রুত ভারতীয়করনের ব্যবস্থা, বিদেশী ও ভারতীয় একচেটিয়াপতিদের প্রতিযোগিতার হাত থেকে ছোটখাটো কলকারখানা ও কুটির শিল্পগুলির সংরক্ষণ এবং রাষ্ট্র কর্তৃক সেগুলোর সাহায্যের দাবি, লাভজনক বিশেষ করে রাষ্ট্র মালিকানায় শিল্প প্রতিষ্ঠা করে সেখানে উদ্বাস্তুদেরকর্মসংস্থানের দাবিগুলোকে তারা তুলে ধরে। সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে আগলে নিয়ে যাবার জন্য সাধারণভাবে অসংগঠিত মজুরদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপ বৃদ্ধি করা ছাড়াও ভারী ও অন্যান্য প্রধান শিল্পের শ্রমিকদের দিকে দৃষ্টি দেবার জন্য বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে। অসংগঠিত শিল্প যেখানে শ্রমিকদের পরিশ্রমের সীমা-পরিসীমা নেই, সেখানে নূন্যতম মজুরী আইন প্রয়োগ করে নূন্যতম মজুরী ও অন্যান্য সুখ- সুবিধার ব্যবস্থার প্রবর্তনের দাবি করা হয়।।

ইংরেজ আমলের রচিত কুখ্যাত ‘গভর্নমেন্ট সার্ভেন্টস কন্ডাক্ট রুলস’- এর বলে সরকার, সরকারী কর্মচারীকে তার অন্যতম মৌলিক অধিকার ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। ১৯৫৮ সালের পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত নতুন নিয়মে ইংরেজ আমলের নিয়মেরই প্রতিধ্বনি দেখা যায়। বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলি কর্মচারীদের অধিকারের পক্ষে ধারাবাহিক আন্দোলন শুরু করে।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম অর্থকারী ফসল হলো পাট। ভারতবর্ষের মোট কাঁচাপাট উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের অংশই ছিল শতকরা ৫০ ভাগ। এই পাট চাষের উপর প্রায় কুড়ি লক্ষ পরিবার নির্ভরশীল ছিল। অর্থকারী লাভজনক ফসল হলেও পাট চাষীদেরদুর্দশার কথা মিথে পরিণত হয়েছিল। কুড়ি লক্ষ পাট চাষী পরিবারের স্বার্থ সংরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে কাঁচা পাটেরন্যায্য দর সুনিশ্চিত করা এবং চট শিল্পের ও চট শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য চটকলগুলিতে স্বাভাবিক কাজের পুনঃপ্রবর্তন জরুরী প্রয়োজন হিসেবে দেখা দেয়। সেই সময়কারবামপন্থী দলগুলির বক্তব্য ছিল কংগ্রেস সরকার চটকল মালিক সমিতি ও বৃহৎ ব্যবসায়ীদের পক্ষ অবলম্বন করছে। বামপন্থী দলগুলো পাট চাষী, চটকল শ্রমিকদের সঙ্গবদ্ধ করে এই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করে। ষাটের দশকের শুরুতেই ভারত - চীন যুদ্ধ শুরু হলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথেই এক শ্রেণীর শ্রমিক-কর্মচারীদের ওপর রাজনৈতিক আক্রোশ, বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ আইন বিশেষত স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আইন ও সি ডি এস - এর নামে স্বর্ণ শিল্পীদের উপর সরকারী জোর জুলুম চলতেই থাকে। এর বিপক্ষে স্বর্ণ শিল্পী ও শ্রমিক-কর্মচারীদের সভা, মিছিল আন্দোলন চলতে থাকে। জনগণের মনোভাব বুঝে বামপন্থী দলগুলো আন্দোলনের সামনে এসে দাঁড়ায়। এছাড়াও অতিরিক্ত বেগার পরিশ্রমের বিরুদ্ধে লিলুয়ার রেল কারখানার শ্রমিকদের সংগ্রাম শুরু হয় এই সময়। ১৯৬৩ সালে ডিসেম্বর মাসে জয়া কারখানার সাত হাজার শ্রমিকরা তাদের ঐতিহাসিক সংগ্রাম শুরু করল এবং নানা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও সংগঠিতভাবে তাদের সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে। জয়া ধর্মঘট বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা ও বিভিন্ন বামপন্থী দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য

করেছিল। জয়া শ্রমিকদের সমর্থনে ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকদের ধর্মঘট, এ ছাড়াও খাদ্যের দাবিতে ও সরকারের খাদ্যনীতির বিপক্ষে হরতাল, ধর্মঘটে বিভিন্ন শ্রমিক শ্রেণী অংশগ্রহণ করেছে। এই সময়ে ট্রাম শ্রমিকরা ধর্মঘটের নোটিশ দিলেন। আন্দোলনগুলিতে কারখানার হাজার হাজার শ্রমিকেরা মিছিলে করে সামিল হলেন। বিভিন্ন কারখানা ও অফিসের শ্রমিক, কর্মচারীদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। এক কথায় সরকারী বিধিনিষেধের মধ্যেই পশ্চিমবাংলার শ্রমিক, কর্মচারীরা এক নতুন ব্যাপক আন্দোলনের জোয়ারের মুখে দিয়ে দাঁড়ালেন। শিক্ষক সমিতিও প্রতীক ধর্মঘটের নোটিশ দিল। শ্রমিক শ্রেণীর অংশগ্রহণ খাদ্য আন্দোলনকে

(১৯৬৬) বিশেষ গতি দেবে তা বুঝতে পেরে বাম নেতৃবৃন্দ খাদ্য আন্দোলনে শ্রমিকরা যাতে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেয় তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছিল। ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক শ্রেণী এবারে আগের থেকেও আরও সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। মূলত বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নের উদ্যোগে বিশেষ খাদ্য কনভেনশন হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নগুলি যুক্তভাবেও অনেক কর্মসূচী নিয়েছে। সর্বদলীয় খাদ্য ও মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ কমিটি ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির যুক্ত আহ্বানে হরতাল ও ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইউনিয়নগুলি যৌথভাবে মজুতদার ও মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। সরকার ধর্মঘট হরতালকে ব্যর্থ করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। বামপন্থী দলগুলি যুক্তফ্রন্ট গঠনকরে নির্বাচনে লড়েছে, এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছে - সংযুক্ত বামপন্থীফ্রন্টের সরকার কংগ্রেস ও বড় ব্যবসায়ী জোটের ষড়যন্ত্রের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ছোট শিল্পকে রক্ষা করবে।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকেই শ্রমিকদের স্বার্থে বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন গুলির লড়াই ক্রমশ তাদের শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। বামপন্থী পতাকার নীচে হাজার হাজার শ্রমিক সংগঠিত হয়েছে। চটকল শ্রমিক ও কয়লা খনি শ্রমিকদের মধ্যে বামপন্থী সংগঠনগুলি ব্যাপক সাড়া পেয়েছিল। যুক্তফ্রন্ট শাসনকালে শ্রমিকদের ব্যাপক 'ঘেরাও' - এর কর্মসূচী সফলতা লাভ করেছে। বামপন্থী ট্রেডইউনিয়নগুলি মালিকদের আক্রমণের বিরুদ্ধে ঘেরাওকে শ্রমিকদের ন্যায় সঙ্গত অধিকার বলে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছে। শ্রমিকদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে পুলিশের ব্যবহারকে মোটামুটি সংযত রেখেছিল যুক্তফ্রন্ট সরকার। শ্রমিক আন্দোলনের তীব্রতায় মালিকরা কোর্টের আশ্রয় নিয়েছে যুক্তফ্রন্ট সরকারের নীতির বিরুদ্ধে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের অপসারণের পর রাষ্ট্রপতি শাসনকালে বামপন্থী ট্রেডইউনিয়ন গুলির ওপর বিভিন্ন আক্রমণ নেমে আসে। বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিক আন্দোলনকে রাজনৈতিক সংগ্রামের স্তরে ব্যবহার করেছিল ব্যাপকভাবে। ১৯৬৬ সালের ১২ই জুলাই কমিটি তৈরীর মাধ্যমেসরকারের বিভিন্ন কর্মচারীদের সরকারী, আধা সরকারী ও শিক্ষকদের সংগঠিত করা হয় বামপন্থী ট্রেডইউনিয়নের মাধ্যমে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময়ের থেকেই বিভিন্ন ট্রেডইউনিয়নগুলির পদাধিকার গুলিতে জয়যাত্রা শুরু হয় বামপন্থী প্রার্থীদের। ট্রেডইউনিয়ন গুলিতে শ্রমিকদের বামপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শে শিক্ষিত ও পরিচালিত করার উপর জোর দেওয়া হয়। বামপন্থী নেতৃত্বের বিশেষত সি পি আই (এম)এর দাবি ছিল ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্যে দলগত সংকীর্ণতা, শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপ, ভারত সরকার ও মালিক শ্রমিক তোষণ এবং সর্বোপরি শ্রেণী সমন্বয়ে নীতি অনুসরণ প্রভৃতির ফলে আন্দোলনের অগ্রগতি প্রায়ই স্তব্ধ হয়ে আসছিল। পশ্চিমবাংলা শ্রমিক শ্রেণী, 'এ আই টি ইউ সি'-র মধ্য থেকে আর অগ্রসর হতে পারছিল না, তাই ১৯৭০ সালের মে মাসে 'সি আই টি ইউ' নামে নতুন সংগঠন গঠিত হয়। রাজ্যের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক বাঁকে সি আই টি ইউ, শ্রমিক শ্রেণীকে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণের আবেদন জানিয়েছিল। ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৭২ সালের জানুয়ারি এই তিন বছর সময় কালের মধ্যে শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছিল পশ্চিমবাংলার। এই সময়কালের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে কারখানা ভিত্তিক ধর্মঘটের পরিধি ছাড়িয়ে গোটা শিল্পের শ্রমিক সাধারণের শিল্প ভিত্তিক লাগাতার সাধারণ ধর্মঘট। এই সময়ে পশ্চিমবাংলায় সংগঠিত শিল্প শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা ২৫ লাখের কিছু বেশি এবং সেই সংখ্যার মধ্যে প্রায় ১৬ লক্ষ ৪০ হাজার শ্রমিক কর্মচারী বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য ভুক্ত ছিল। এছাড়া অসংগঠিত শ্রমিকদের সংখ্যা প্রায় ১০ লাখ। এই শ্রমিকদের মধ্যে ৩ লাখ যার সামান্য ছিল ইউনিয়নভুক্ত তাছাড়া মুট বহনকারী, রিকশাচালক, ছোট কারখানা শ্রমিক, ঠিকেদারী শ্রমিক, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার রাজমিস্ত্রি, দিনমজুরের সংখ্যা আরো ৭ লাখ হবে। অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্যবিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন গুলি বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও খুব বেশি কার্যকরী সিদ্ধান্ত

তাদের পক্ষে করা যায়নি। বিভিন্ন বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনগুলি নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃহত্তর শ্রমিক ঐক্যকে দুর্বল করেছিল, সেই সুযোগটা নিয়েছিল মালিক ও শাসক শ্রেণী।

১৯৭০ সালের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন রাজনৈতিক সংঘর্ষে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাজনৈতিক দলের মদনপুষ্ট ট্রেড ইউনিয়নগুলি নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধে লিপ্ত হয়। কলকাতার যানবাহন শ্রমিকদের রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে বলপূর্বক কাজে যোগ দিতে বাধা দেওয়া হয়। বিভিন্ন ইউনিয়ন অফিস আক্রান্ত হয়। কলকাতার পাশাপাশি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এই চিত্র কমবেশি দেখা যায়। ১৯৭২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের জয় লাভের পরে ট্রেড ইউনিয়নের উপর আক্রমণ বাড়তে থাকে বলে বামপন্থীরা অভিযোগকরে। তারা দাবি করে, ১৯৭২ সালের পর ২৫ জন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী নিহত হয়েছেন। ৩৫৮টি ইউনিয়ন অফিস স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারছে না। বিভিন্ন স্থানে মোট ১১০০ ইউনিয়ন কর্মীকে কাজে যোগদানে বাধা দেওয়া হয়েছে, কাজে উপস্থিত থাকার না অপরাধে ৫৫১জন শ্রমিককে এই সময় বরখাস্ত করা হয়েছে। বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন করার সুবাদে বিভিন্ন কায়দায় মোট ৪৫২২ জন কর্মীকে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। ছাড়াও ১৯৭৪ সালের ৯ এপ্রিল ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করার জন্য দুই সহস্রাধিক কর্মচারী ও কর্মীকে শাস্তি মূলক বদলী করা হয়েছে। জোর করে অবসর গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছে চার জনকে। ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করার জন্য কয়েক হাজার চাকরীজীবীর চাকরীর ধারাবাহিকতায় ছেদ ঘটানো হয়েছে। বেতন কাটা হয়েছে, পদোন্নতির পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে সরকারী চাকরীতে পুলিশ ভেরিফিকেশনের যে নীতি বাতিল করা হয়েছিল তা পুনরায় প্রবর্তন করা হয়েছে। বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলি এই সমস্ত অত্যাচার, বিধিনিষেধ সত্ত্বেও সংবিধান স্বীকৃত ট্রেড ইউনিয়নের পরিচালনা করার বিষয়ে অনড় ছিল। এর মধ্যে ১৯৭৪ সালের মে মাসে ১৭ লক্ষ রেল শ্রমিকের তিন সপ্তাহব্যাপী ধর্মঘট বিশ্বের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। বেশীরভাগট্রেড ইউনিয়ন গুলি, বিশেষত সি আই টি ইউ, এ আই টি ইউ সি, এ আই আর এফ, ভারতীয় মজদুর সংঘ যৌথভাবে এই সংগ্রাম পরিচালনা করে। শুধু রেল শ্রমিক নয় অন্যান্য শিল্পের শ্রমিক - কর্মচারী, কৃষক তথা সমগ্র মেহনতি মানুষের মধ্যে এই ঐক্যবদ্ধ রেল শ্রমিকদের আন্দোলন একটি বিরাট উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল।১৯৭৫ সালের ২৬ জুন ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে সারা দেশ জুড়ে জরুরী অবস্থা জারি হলে মানুষের মৌলিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ ঘটে। ট্রেড ইউনিয়নের ওপর এর প্রভাব মারাত্মক পরে। বিভিন্ন বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনগুলি দাবি করতে থাকে রাজনৈতিক বন্দীদের পাশাপাশি ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের যারা দীর্ঘদিন ধরে জেলে আটকে আছে তাদের মুক্তি দিতে হবে। জরুরী অবস্থাতে যে সমস্ত শ্রমিক-কর্মচারী চাকরী থেকে বরখাস্ত হয়েছে তাদের চাকরী ফিরিয়ে দিতে হবে। এছাড়াও, গোপন ব্যালটের ভিত্তিতে নির্বাচিত ট্রেড ইউনিয়ন গুলির শর্তবিহীন স্বীকৃতির দাবি, যেসব ট্রেড ইউনিয়ন যৌথ দর কষাকষির ক্ষেত্রে এবং পরামর্শদাতা কমিটিগুলোতে সরকারের নীতিগুলোকে সমর্থন করে না তাদেরকে বাইরে রাখার জন্য এবং তাদের বিরুদ্ধে বৈষম্য করার উদ্দেশ্যে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর যেসব আইনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলি বাতিল করতে হবে, ধর্মঘটের উপর থেকে সমস্ত নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে হবে, বোনাস অর্ডিন্যান্স বাতিল করতে হবে, প্রয়োজন ভিত্তিক সর্বনিম্ন মজুরী দিতে হবে।

১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার গঠনের পর শ্রমিক আন্দোলনের সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিত কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনগুলির দাবি ছিল কংগ্রেস সরকার কোটিপতি ও জমিদার শ্রেণীর স্বার্থে সরকার পরিচালনা করত। জনগণের দাবির প্রতি সেই সরকার আদৌ সহানুভূতিশীল ছিল না বরং প্রশাসন ও পুলিশকে কায়েমী স্বার্থের স্বার্থ রক্ষায় নির্লজ্জভাবে ব্যবহার করত। ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠনের দাবি ছিল, বামফ্রন্ট সরকার

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে এই পরিস্থিতি অনেকখানি পরিবর্তিত হয়েছে। বামফ্রন্টসরকার শোষিত শ্রমিক, কৃষক ও খেটে খাওয়া মানুষের দাবি-দাওয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল এবং সীমিত ক্ষমতা ও আর্থিক সঙ্গতি নিয়ে দাবী দাওয়া পূরণ করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করছে। সহায়ক শক্তি হিসেবে থাকায় এবং শ্রমজীবী মানুষ সংঘটিত ও সোচ্চার থাকায় জনগণের বিভিন্ন অংশের অনুকূলে এবং কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে বহু বিরোধের নিষ্পত্তি হচ্ছে। ধর্মঘট বা অন্যান্য ধরনের সংগ্রামের পথে যাওয়ার প্রয়োজন অনেক ক্ষেত্রে পড়ছে না। অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিক শ্রেণী ধর্মঘট ছাড়াই মালিকদের কাছ থেকে দাবী আদায়ে সমর্থ হয়েছে। খুব অল্প ক্ষেত্রেই যেখানে মালিকরা অনমনীয় মনোভাব নিয়েছে সেখানে শ্রমিকদের ধর্মঘটের পথে যেতে বাধ্য করেছে- যেমন চটকল। বামপন্থী পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়ন গুলিশ্রমিক স্বার্থের পাশাপাশি শ্রমিক শ্রেণীর চেতনাকে কিভাবে সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উন্নীত করা যায় তার চেষ্টা সবসময় চালিয়ে গিয়েছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। ১৯৭৮ সালের ৮ই ডিসেম্বর কাজের অধিকারকে সংবিধানে মৌলিক অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্তির চেয়ে একটি বেসরকারী প্রস্তাব রাজ্য বিধানসভায় গৃহীত হয়। শ্রমজীবী এবং মেহনতী জনগণের সমস্ত ধরনের ন্যায় সঙ্গত এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সমর্থন করা, শিল্প বিরোধগুলির দ্রুত মীমাংসা ও শ্রমিক, কর্মচারীর স্বার্থ রক্ষার জন্য শিল্প সম্পর্কে আইনগুলির আরও সংশোধন করা, ন্যূনতম মজুরি আইনের পরিপূরক আইনগত এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং এর ধারাগুলিকে মালিকদের জন্য বাধ্যতামূলক করা, রাজ্য শ্রমিক উপদেষ্টাপর্ষদগুলিকে আরও কার্যকরী ভূমিকা পালনের সুযোগ করে দেওয়ার দাবী গুলি তোলা হয় । ১৯৮৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালেশ্রমিক আবাসনের ও অন্যান্য অবস্থার উন্নতি ঘটানো এবং শ্রমিক-কর্মচারীস্বার্থবিরোধী কাজগুলির বিপক্ষে ব্যবস্হা নেওয়া, কর্মসংস্থান কেন্দ্রগুলির বর্তমান দুর্বলতা দূর করে এগুলির জন্য শক্তিশালী জনপ্রতিনিধিত্বমূলক পর্যবেক্ষণ সুনিশ্চিত করার দাবী জানানো হয়। ৯০-এর দশকের প্রথম থেকেই উদার অর্থনীতির ধারা ভারতীয় অর্থনীতিকে প্রভাবিত করতে থাকে। এই সময়কালে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতন একশ্রেণীর পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির চাপে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় অর্থনীতির পরিবর্তন সাধন করে দেশীয় শিল্পকে এক অসম প্রতিযোগিতার মুখে ঠেলে দেয় বলে বামপন্থী ইউনিয়নগুলি অভিযোগ করে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সংস্থাগুলিকে দেশী-বিদেশী ব্যক্তি মালিকানার হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে চরম বিপর্যয়কর পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। এই উদার অর্থনীতি সহচর্য দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা গতানুগতিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পথ পরিবর্তনকে বাধ্য করেছিল। বলা যেতে পারে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলি নিজেদের মতো করে শ্রমিক শ্রেণীর পাশে দাঁড়াতে থাকে। ব্যাপক বেসরকারীকরণ ফলে বিভিন্ন সরকারী সংস্থাগুলিতে ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে ব্যাপক বাধার সম্মুখীন নয়। সরকারী - বেসরকারী সংস্থা গুলিতে ব্যাপক শ্রমিক ছাঁটায় শুরু হয়। যন্ত্র ও প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যাবহার অনেক মানুষকে কর্মচ্যুত করে। বাম শাসনে ‘সিটু’-র চোখ রাঙানীকে উপেক্ষা করে কলকাতা শহরে হকার উচ্ছেদের জন্য ‘অপারেশন সানশাইন’-এর মতো বিতর্কিত ঘটনা কার্যকর হয়েছিল।বিশ্বায়ন, বেসরকারীকরন, একচেটিয়া মুনাফা এই ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে কাজ করতে গিয়ে সমস্ত ধরনের ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে নিত্যনতুন সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়েছে। এছাড়াও কম্পিউটারের ব্যাপক ব্যবহারের বিরুদ্ধে বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন গুলির আন্দোলন শুরু হয়। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করার

পর বামফ্রন্টের শিল্পনীতির কিছু পরিবর্তন আসে।ফলস্বরূপ দেশী-বিদেশী বিভিন্ন বহুজাতিক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার অফিস পশ্চিমবঙ্গে গড়ে ওঠে। এই সমস্ত সংস্থায় কর্মরতদের তুলনায় অনেক কম বেতনে অধিক পরিশ্রমকরিয়ে কোম্পানীগুলি বহু মুনাফা লাভ করে । এই সমস্ত বহুজাতিক সংস্থা গুলিতে কোন ধরনের ট্রেড ইউনিয়নগুলি সেভাবে কোন সংগঠন করতে পারেনি। সরকারের শ্রম দপ্তরও কোন কারণ ছাড়া ছাঁটাই এর বিপক্ষে কোন ব্যবস্থাও সেভাবে গ্রহণ করেনি। উদার অর্থনীতির প্রভাবে সারা বিশ্বের বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থাগুলি ভারতবর্ষের বৃহত্তর বাজারকে তাদের ব্যবসার অনুকূল বলে মনে করে। পশ্চিমবঙ্গেও বিভিন্ন দেশী-বিদেশী সংস্থার অসংখ্য শপিং মল, ছোটখাটো কারখানা ও ডেলিভারি সংস্হা গড়ে ওঠে। এই সমস্ত জায়গায় প্রচুর কর্মপ্রার্থী কাজে অংশগ্রহণ করে। এই সমস্ত বেসরকারী জায়গায় চাকুরীরত মানুষদের না আছে সেভাবে কোন বেতন কাঠামো,না আছে কোন ভবিষ্যৎ। খুবই কম বেতনে অধিক পরিশ্রম করিয়ে নেওয়ার একটা প্রবণতা এই সমস্ত কর্মক্ষেত্রে দেখা যায়। বিপুল পরিমাণে অসংগঠিত এই শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে বিভিন্নশ্রমিক সংগঠন, বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন কিছু ভূমিকা গ্রহণ করলেও তারা সেভাবে সফল হয়নি। কিছু স্বেচ্ছাসেবীসংস্থা খুব অল্প পরিমাণ অংশে তাদের কিছু দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করেছে। বৃহত্তর ক্ষেত্রে এই সমস্ত আন্দোলনের কোন প্রভাবই পড়েনি। বেসরকারী এই সমস্ত অসংগঠিত শ্রমিকদের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের সরকারী ক্ষেত্রেও নূন্যতম বেতনে অনিয়মিত কর্মচারীদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার প্রবণতা বাম আমল থেকেই শুরু হয়েছে, যা দিনে দিনে বাড়ছে। পূর্ণ সময়ের কর্মচারীদের থেকেও তাদের সংখ্যা অনেক ক্ষেত্রেএখন বেশী। সরকারী বিভিন্ন ক্ষেত্রের এই অনিয়মিত কর্মচারীরা তাদের দাবি দাওয়া নিয়ে বিভিন্ন সংগঠনের মধ্য দিয়ে আন্দোলন করলেও, সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির একশ্রেণীর নেতৃবৃন্দ ও উচ্চ স্থানীয় সরকারী আধিকারিকদের কিছুটা সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতা তাদের দাবিদাওয়ার কার্যকর হওয়ার পথে প্রধান অন্তরায়।

এছাড়াও বিপুল সংখ্যক অ-সংগঠিত গৃহ-শ্রমিকসহ বিভিন্ন অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য ২০০৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সামাজিক নিরাপত্তা আইন কিংবা ২০১৭ সালে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা চালু করলেও তা নিয়ে যে ব্যাপকহারে প্রচার এবং গৃহ-পরিচারিকাদের মধ্যে তাদের অধিকার সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধির দরকার ছিল সরকারের তরফ থেকে তা ঘটেনি। ২০১৭ সালের সামাজিক সুরক্ষা যোজনায় যদিও গৃহ-শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্যবীমা, চিকিৎসা এবং সন্তানদের পড়াশুনো সংক্রান্ত খরচ এবং পেনশনের উল্লেখ রয়েছে গৃহ-পরিচারিকা হিসাবে নাম নিবন্ধীকরনের মাধ্যমে। কিন্তু পরিচয়পত্র তৈরি থেকে রেজিস্ট্রেশনের প্রক্রিয়া এতটাই জটিল যে, যে সমস্ত পরিচারিকা বিষয়টি সম্বন্ধে অবগত তাঁদের কাছে দালাল মারফত টাকার বিনিময়ে এগোনো ছাড়া পথ নেই। কিছু কিছু অরাজনৈতিক সংগঠন গৃহ-শ্রমিকদের সংগঠিত করবার প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই জটিলতা পেরিয়ে তাঁদের সামাজিক সুরক্ষা যোজনার আওতায় আনবার চেষ্টা করেছে, এবং করছে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের চাপে পরিচারিকাদের জন্য ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ১৯৪৮ সালের ন্যূনতম মজুরীআইনের অধীনে

পরিচারিকাদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এরপরই তাদের নূন্যতম মজুরীও নির্ধারণ করা হবে। শ্রম বিভাগের গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পরিচারিকাদের ন্যূনতম বেতন নির্ধারণ করা হবে। উল্লেখ্য, ন্যূনতম মজুরী আইনটি 'অদক্ষ' এবং 'দক্ষ' শ্রমিকদের ৯২টি গোষ্ঠীর মজুরীনির্ধারণ করে থাকে। এরপর থেকে পরিচারিকাদের এই আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

প্রসঙ্গত, দিল্লি, কেরল এবং তামিলনাড়ুসহ দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যে ইতিমধ্যে পরিচারিকাদের কাজের প্রকৃতি অনুসারে প্রতি ঘণ্টার ভিত্তিতে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে। এই পথেই এবার হাঁটতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ। বাংলায় বর্তমানে যদি এজেন্সির মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়, তাহলে ১০ ঘণ্টার কাজের জন্য পরিচারিকাদের মজুরি দৈনিক ৩২৫ থেকে ৩৫০ টাকা (প্রতি মাসে প্রায় ৯৭৫০ থেকে ১০,৫০০ টাকা)। তবে রাঁধুনির মতো দক্ষ কর্মীদের রেট একটু বেশি। কিন্তু রাজ্যের বেশিরভাগ পরিচারিকাই প্রতি মাসে ৮০০ থেকে ১০০০ টাকা মজুরির বিনিময়ে কাজ করেন। এমনকি কোনও সাপ্তাহিক ছুটি ছাড়াই তাঁরা কাজ করেন।

রাজ্যে পরিচারিকাদের অন্যতম পেশাগত সংগঠন হল 'পশ্চিমবঙ্গ গৃহ পরিচারিকা সমিতি'। ইউনিয়নের দাবী রাজ্যে পরিচারিকাদের ন্যূনতম মজুরি প্রতি ঘণ্টায় ৭৫ টাকা হওয়া উচিত। তাছাড়া প্রতি মাসে চার দিন করে ছুটিও দেওয়া উচিত। এদিকে গত ৬ জুলাই সরকার নির্দেশ দেয় যে 'অদক্ষ' (ঘর মোছা, ঝাড়ু দেওয়া) পরিচারিকাদের শহরে দৈনিক ন্যূনতম ৩৫৫ টাকা অথবা মাসিক ৯২৩৯ টাকা এবং গ্রামীণ এলাকায় দৈনিক ন্যূনতম ৩২২ টাকা অথবা মাসিক ৮৩৮০ টাকা করে বেতন দিনে হবে। তবে এই বিজ্ঞপ্তি অফিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। গৃহস্থে কাজ করা পরিচারিকাদের জন্য এখনও বেতন নির্ধারণের কাজ বাকি।

রাজ্যে বহু ধরনের পরিচারিকা রয়েছেন। কেউ কেউ কয়েক ঘণ্টা কাজ করে চলে যান, আবার কেউ কেউ সারাদিন থাকেন। স্বভাবতই এদের বেতন আলাদা। তাই পরিচারিকাদের বেতন নির্ধারণের কাজটি বেশ জটিল বলে মেনে নেন শ্রম মন্ত্রী। তিনি দাবি করেন, সরকারের লক্ষ্য, কেউ যাতে বঞ্চিত না হয়। সরকারী তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যে ৩০ লক্ষ জন পরিচারিকার কাজ করেন। শুধুমাত্র কলকাতাতেই এই সংখ্যাটা আড়াই লাখ। নয়া বেতন নীতি কার্যকর হলে এরা সবাই উপকৃত হবেন বলে আশা সরকারের।

কল-কারখানা ভিত্তিক ট্রেডইউনিয়নের অন্যদিকে যৌনকর্মীদের অধিকার ও তাদের পেশাকে'কর্মী'হিসেবে স্বীকৃতি লড়াইয়ের জন্য ১৯৯২ সালে 'দুর্বার মহিলা সমন্বয় সমিতি' কলকাতায় গড়ে ওঠে। যার প্রাণপুরুষ ছিলেন জনস্বাস্থ্য বিজ্ঞানী ডঃ সরজিত জানা। তিনি দীর্ঘদিন ধরেই কলকাতা ও বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের পতিতা পল্লীর মহিলাদের নিয়ে কাজ করেছেন। তাদের স্বাস্থ্য, সুরক্ষা, পেশার স্বীকৃতির অধিকার নিয়ে লড়াই করেছেন। দুর্বার মহিলা সমিতির এই লড়াইয়ে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন ও বিভিন্নসামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি এগিয়ে আসে। শেষ পর্যন্তভারতবর্ষের সুপ্রিম কোর্ট যৌনকর্মীদের পেশাকে আইনী স্বীকৃতি দেয়। যৌনকর্মীদের এই অসম আন্দোলন ও স্বীকৃতি লাভ ভারতবর্ষের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাসে স্মরণীয়।পশ্চিমবঙ্গের বিপুল পরিযায়ী শ্রমিকের পরিসংখ্যান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা

সরকারের কাছে সেভাবে নেই। সম্প্রতি কোভিড অতিমারির সময়ে বিষয়টি আরও স্পষ্ট ভাবেসামনে উঠে আসে। বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলি অসংগঠিত এই পরিযায়ী শ্রমিকদের সংগঠিত করার উদ্যোগ নেয়, বিশেষত সি আই টি ইউ উদ্যোগে গঠিত হয় 'ওয়েস্ট মাইগ্রান্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন'। এই সংগঠন পরিযায়ী শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া সরকারের কাছে ধারাবাহিক ভাবে তুলে ধরছে।

বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নগুলির আন্দোলনের ফলেই শ্রমিকদেরজন্য লেবার কার্ড করতে বাধ্য হয়েছে সরকার। শ্রমিক পরিবারের সন্তানদের শিক্ষার জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা করেছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। কিছু ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার খুব কম টাকায় ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য বীমা, পেনশন যোজনার ব্যবস্থা করেছে। শ্রমিক সংগঠনগুলির সঠিক ব্যবস্থাপনায় কাজের জায়গায় আহত,নিহতশ্রমিকদের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা,ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা গেছে। তবে এগুলি সংখ্যায় খুবই কম।সরকারী অফিসগুলিতেএকশ্রেণীর দালালদের উৎপাত শ্রমিকদের সুবিধাদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। সরকারের শ্রম দপ্তরের ভূমিকা সব ক্ষেত্রে কার্যকর মনে হয়নি ট্রেড ইউনিয়নগুলির।পশ্চিমবঙ্গের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলি যুগোপযোগী প্রযুক্তির ব্যবহারনিয়ে বরাবরই দোলাচলে থেকেছে। প্রযুক্তির ব্যবহারের সাথে সাথেই কর্মী সংকোচন ঘটেছে সরকারী-বেসরকারী ক্ষেত্রগুলিতে। সত্তরের দশকের চটকল আধুনিকীকরণই হোক, বা বিংশ শতাব্দীর শেষে কম্পিউটারের বিরোধিতাই হোক বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলি যুগের গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে গিয়েও কর্মীদের পাশে থাকারই চেষ্টা করেছে। বর্তমান সময়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর ব্যবহার ব্যাপক কর্মী সংকোচন এর ইঙ্গিত দেয়- যাবর্তমান সময়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলির সামনে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ।

২১০.২.২.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলী **ও পত্রপত্রিকা :**

১. ড.নীতিশ সেনগুপ্ত, ডা. বিধানচন্দ্র রায় জীবন ও সময়কাল, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা,২০০৩।

২. পশ্চিমবঙ্গ ফিরে দেখা, রাহুল রায় (সম্পা.), প্রতীতি, চুঁচুড়া- হুগলি, ২০০৩।

৩. পরিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমি ও ভূমি সংস্কার, দে'জ, কলকাতা, ২০০৭।

৪.অশোক ঘোষ, বাংলায় ধর্মঘট, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৬।

৫.Debabrata Bandyopadhyay, Land, Labour and Governance: An Anthology, Worldview,Kolkata, 2007.

৬. Alok Kumar Ghosh, Bengal Permanent Settlement to Operation Burga, Bibhasa, Calcutta, 1991.

৭.G. K. Lieten, Land Reforms at Centre Stage : The Evidence on West Bengal, Development and Change, Vol- 27, January, 1996.

৮.James. K. Boyce, Agrarian Impasse in Bengal, Oxford University Press, 1987.

৯.D. Warriner, India : Land Reform in Principal and Practice,Oxford- Claradon Press, 1969.

১০.Sukomal Sen, Working Class of India: History of Emergency and Movement (1830-1970), K. P. Bagchi, Calcutta,1979.

১১.People's Power In Practice(20 Years of Left Front in West Bengal), Jyoti Basu (ChiefEditor), N B A, Calcutta, 1997.

১২. Sudhir Ray, Marxist Parties of West Bengal(In Opposition and in Government, 1947-2001), Progressive Publisher's, Kolkata, 2007.

১৩.Debashish Bhattacherjee, The 'New Left', globalization and trade unions in West Bengal : What is to be done ?, The Indian Journal of Labour Economics, Vol-44, No.3, 2001.

পত্রপত্রিকাঃ দি স্টেটসম্যান, আনন্দবাজার পত্রিকা, দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, দি টাইমস অফ ইন্ডিয়া, দি হিন্দু, পশ্চিমবঙ্গ, অনীক,দেশ।

২১০.২.২.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

1) Discuss the significance of 'Operation Barga' as an important mode of Land reformation.

2) Write a short note about the industrialization process of West Bengal since 2011.

3) Briefly discuss the significane of Trade Union movement in West Bengal.

পর্যায়- ৪

একক- ৮

Questions of Caste, Class, Gender and Religion

৪.৮.০.উদ্দেশ্য : বর্তমান পর্যায়ে একক ৮ টি পাঠ করলে যে সমস্ত বিষয়গুলি জানা যাবে।

১.জাতি বা বর্ণ বলতে কী বোঝায়

২.জাতি ও বর্ণের মধ্যে তফাৎ কি

৩. শ্রেণী বলতে কি বোঝায়।

৪. বাংলার জাতিভেদ ব্যবস্থার বিবরণ

৫. ধর্ম ও নারীর স্বরূপ ও বিবর্তন

বর্তমান পর্যায়ে একক ৯ টি পাঠ করলে যে সমস্ত বিষয়গুলি জানা যাবে-

১. দেশভাগের প্রেক্ষাপট

২. দেশভাগ ও তার প্রতিক্রিয়া

৩. দেশভাগ ও বাংলার পরিবর্তিত অবস্থা

৪. উদ্বাস্তুর আগমন ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিকা

৫. দেশভাগ ও উদ্বাস্তুর আগমন বাংলার উপর সামগ্রিক প্রভাব কি পড়েছিল প্রভৃতি

৪.৮.১. জাত

ইংরেজি Caste শব্দটি বাংলায় জাতি হিসেবে ব্যবহৃত। শব্দটি লাতিন শব্দ Castus থেকে গৃহীত। এর অর্থ শুদ্ধ। ভারতীয় সমাজে এই Caste শব্দটি পর্তুগিজদের দাড়ায় শিথিল ভাবে প্রযুক্ত হয়েছিল। কারণ তাদের ধারণা ছিল যে এই ব্যবস্থাটি রক্তের শুদ্ধতা রক্ষার তাগিদে ব্যবহৃত হয়। তবে এই জাতি ব্যবস্থা এমনই অদ্‌ভুত ও জটিল যে বিশেষ কোনো সংজ্ঞায় কোন লেখকই ঐক্যমতে পৌঁছাতে পারেননি। ই.এ্.গেইট বলেছেন যে 'জাতিব্যবস্থা'র বা পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্য এই যে এর অন্তর্গত সকল সদস্য এবং ঐতিহ্যবাহী সমভুক্ত মানুষেরা তাদের এক সাধারণ উদ্ভবের কথায় বিশ্বাসী। আবার নেসফিল্ডের সংজ্ঞা এইরকম যে --- একশ্রেণীর সম্প্রদায় যখন অন্য কোন শ্রেণীর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অস্বীকার করে, অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে না এবং পান আহার কেবলমাত্র নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যেই করে থাকে তখন তাকে জাতি বলে।

আবার অনেক সময় 'বর্ণ' ও 'জাতি' শব্দদুটির অসতর্ক ও অসচেতনতার সঙ্গে প্রয়োগ দেখা যায়। আসলে বর্ণ অর্থ জাতি নয়। সমাজের চতুরবিধ শ্রেণীবিভাগই বর্ণ, অন্যদিকে ধর্মশাস্ত্রকারদের মতে

চতুরবর্ণ থেকে গৃহীত অসংখ্য গোষ্ঠী হলো জাতি।

৪.৮.২. জাতিভেদ প্রথা

আমরা বর্তমান ভারতবর্ষে যে জাতিভেদ ব্যবস্থা লক্ষ্য করি তার ভিত্তি হল প্রাচীন শাস্ত্রে উল্লিখিত বর্ণ ব্যবস্থা। জাত শব্দটির নিকটবর্তী শব্দ হলো বর্ণ। প্রাচীনকালে ভারতীয় হিন্দু সমাজে জাতির পরিবর্তে বর্ণ শব্দটি ব্যবহার করা হতো ।ঋকবেদের একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে প্রজাপতি ব্রম্মাই হলেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি বর্ণের সৃষ্টি কর্তা। চারটি বর্ণের এই বিভাজন সমাজে বসবাসকারী মানুষের গুণ ও কর্মের সামর্থ অনুযায়ী নির্দিষ্ট।ভারতে প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে বিশ্বস্রষ্টার মুখ, বাহু, জানু ও পদ থেকে উদ্ভূত হয়েছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নামে চারটি জাতি গোষ্ঠীর।

বাংলার জনজাতি উত্তরাধিকার সূত্রে তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক সম্পদ স্বাধীনতার দু এক দশক পর্যন্তও স্ফুটো ও অর্ধস্ফুটো হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তা ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যেতে থাকে । বর্তমানে অধিকাংশ জাতি ও খন্ড জাতি তাদের ঐতিহ্য সম্পর্কে নিত্যান্তই উদাসীন ও গৌরবোধেও তাদের অনীহা । আবার অধিকাংশ মানুষ তাদের মূল পরিচয় দিতে হীনমন্যতায় ভোগে । তপশিলি জাতির অনেকেই তাদের পূর্ব ঐতিহ্য ছদ্মপরিত্যাগে উচ্চ মানসিকতার পরিচয় দানে উৎসাহী বোধ করে ।কিন্তু অপভাষা প্রয়োগে ও শহরের সাংস্কৃতিক বাহক হয়ে ওঠার ব্যর্থ প্রচেষ্টার ফলে তারা অধিকাংশই হয়ে ওঠে না ঘাটকা না ঘরকা।

৪.৮.৩. স্বাধীনতার বাংলায় জাতি ব্যবস্থার বিবর্তন

তবে বাংলায় বিশেষ করে দেশ বিভাগের পর জাতি বর্ণের আচার ব্যবহার উৎসব অনুষ্ঠান ক্রিয়া কর্ম এমনকি মৃতদেহ সৎকার ও সামাধিতে শ্রদ্ধাদিতে এর ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। এই পরিবর্তন শুধু জেলাভিত্তিক নয়, জেলার মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চল ভিত্তিকও বটে। বর্তমানে পাশাপাশি এই জাতি ব্যবস্থার দুটি দিক খুব প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে। এর একটি বহিরঙ্গ ও অন্যটি অন্তরঙ্গ বিষয়ক । বহিরঙ্গহে হীনমন্যতার ফলে জাতি বা খন্ড জাতির নাম প্রকাশে গোপনীয়তা , অন্যদিকে অন্তরঙ্গে তপশিলি জাতি বা খন্ড জাতির নাম নিয়ে চাকুরী ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে আগ্রহের প্রবণতা বৃদ্ধি। তবে উপাধি পরিবর্তনের প্রবণতা প্রাক-স্বাধীনতা যুগেও ছিল এবং সেখানে উচ্চশ্রেনীভুক্ত হওয়ার একটা আকাঙ্ক্ষা সর্বদা কাজ করতো।

৪. ৮.৪. শ্রেণীর(Class) সংজ্ঞা

সাধারণত সামাজিক ভেদাভেদ বোঝার জন্য বর্তমান দুনিয়ার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হচ্ছে শ্রেণী(class)। আমরা প্রায় ধনী ও গরিব এই শব্দ দুটি ব্যবহার করে থাকি। এই শব্দ দুটির মাধ্যমে সমাজে কোন মানুষের আর্থিক সংগতিকে বোঝানো হয়ে থাকে। এবং সেটা শুধু টাকা-পয়সা অর্থে বোঝানো হয় না, তার পুরো সম্পদ কে বোঝানো হয় ।ধোনি বলতে সাধারণ অর্থে সম্পদশালী ব্যক্তিকে বোঝানো হয় ।আর গরীব অর্থে যে ব্যক্তির সম্পদ নেই তাকে বুঝানো হয়। তবে শব্দ দুটির একটি তুলনামূলক ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়। কেউ কারো চাইতে কম সম্পদশালী হলে তাকে ঐ ব্যক্তির চেয়ে তুলনা মূলকভাবে গরিব বলা হয়। এই উদাহরণের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণি কে বোঝা যায়। সাধারণভাবে সম্পদের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে যে ফারাক তাকে সাধারণভাবে শ্রেণী বলা হয়। তবে সামাজিক বিজ্ঞানের ভাষায় ধনী ও গরিব অর্থে উচ্চবৃত্ত ও নিম্নবিত্ত এ শব্দ দুটি ব্যবহার হয়ে থাকে এবং এর মধ্যবর্তীতে যারা অবস্থান করে তাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলা হয়ে থাকে। তবে বর্তমানে অনেক বিশ্লেষকই শ্রেণী অর্থে তার সম্পদের সাথে ক্ষমতা ও পদমর্যাদার কথাও বলেছেন। ক্ষমতা মর্যাদা এবং নানা রকম বাড়তি সুবিধা পাওয়ার মধ্য দিয়ে একটা শ্রেণীর আচার-আচরণ মনোভাব ধ্যান ধারণা প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটে ।আচার-আচরণ ধ্যান ধারণার এই বদল কোন ব্যক্তিবিশেষে ব্যাপার নয়। এটা একটা শ্রেণীগত বিষয়। এই কারণে শ্রেনী বলবার সাথে সাথে শুধু সম্পদের পার্থক্য নয় তার মন মানসিকতা ধ্যান-ধারণার পার্থক্যও বোঝায়।

৪.৮.৫. শ্রেণী ও জাতির পার্থক্য

সাধানভাবে জাতি বা বর্ণ বলতে বোঝায় এমন এক ভেদাভেদ ব্যবস্থা যা কোন মানুষের জন্মের সময়ই নির্ধারিত হয়ে যায় । যেমন ব্রাহ্মনের সন্তান ব্রাহ্মণ বলেই পরিচিত হবে। তবে জাতি বর্ণ প্রথা কেবলমাত্র ভারতবর্ষ এবং আশেপাশে দেখা যায় বলে অনেক সমাজ বিজ্ঞানীরা এটাকে কেবল হিন্দু সমাজের একটা বৈশিষ্ট্য বলে থাকেন। ভারতবর্ষে এই জাতি বর্ণ আপাত স্বতন্ত্র হলেও এর স্তরবিন্যাস অন্য সমাজেও আছে। সমাজে কোন মানুষ অন্য কোন শ্রেণীতে জন্মালেও নানা উপায়ে তিনি তার শ্রেণী বদলে ফেলতে পারেন । তবে জাতি বর্ণের সদস্যরা সারা জীবন তার অবস্থান বদলাতে পারবে না ।যেহেতু তিনি যাই করুক না কেন ওই জাতি বর্ণের সদস্য পদ ত্যাগ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। শ্রেণী এবং জাতি বর্ণের মধ্যে এ পার্থক্য খুবই সরল। তবে বর্তমানকালে এর বিশেষ কোন পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না ।কোন একজন বা দুজন দরিদ্র মানুষ হঠাৎ ধনী হয়ে যাবার

গল্প আমরা প্রায় দেখি কিন্তু তা দিয়ে সমস্ত দরিদ্র শ্রেণীর সামাজিক জীবন ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।

৪.৮.৬. স্বাধীনতার পরবর্তী বাংলায় জাতি প্রথার স্বরূপ

ভারতবর্ষ ও বাংলায় জাতি বর্ণ প্রথার স্বরূপ, ভারতবর্ষে হিন্দুদের মধ্যে এক ধরনের ভেদাভেদ প্রথার উল্লেখ পাওয়া যাবে। এই ব্যবস্থাতে বিশ্বাস করা হয় কোন মানুষ জন্মের সময়ই তার সামাজিক অবস্থান নিয়ে আসেন এবং সেই অবস্থানটা আর বদলানো যায় না ।এ বিশ্বাসের সাথে ধর্মীয় কিছু ব্যাখ্যা অপ্রচলিত আছে ।কিন্তু ভেদাভেদটা কেবল বিশ্বাসের নয় সামাজিক অনুশীলনেও তা দেখা যায়। নৃবিজ্ঞানীরা এটিকে জাতি বর্ণ (Cast) বলেছেন। কারো কারো মতে এটা সাব কাস্ট(Sub- cast) বলা হয়ে থাকে। সাধারণত এটাকে জাতিবর্ণ বলা হলেও সমাজের চলতি ভাষায় মানুষজন একে 'জাত 'শব্দ অর্থে ব্যবহার করেন।

সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির জাতি বর্ণের ভিত্তিতে একটা নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থান থাকে । নিচু জাতি বর্ণের লোকজনের সঙ্গে উঁচু জাতির লোকজনের মেলামেশা হয় না ।দুটি জাতির সামাজিক ক্ষেত্রে নানান বাধা নিষেধ থাকে। প্রধান বাধা নিষেধ হচ্ছে বিয়ে এবং খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে ।যেমন যেসব জাতি বর্ণ উঁচু বলে ধরে নেওয়া হয় তাদের সদস্যরা নিচুদের সাথে একত্রে খাবেন না খাবেন না ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবেন না।

অধিকাংশ গবেষক জাতি বর্ণ প্রথা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বেদে বর্ণিত চারটি বর্ণের প্রসঙ্গ নিয়ে আনেন কিন্তু বাস্তব সমাজে এই চারটি বর্ণ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। যেমন বাংলা অঞ্চলে ব্রাহ্মণ পাওয়া গেলেও বৈশ্য বা শূদ্রের একক অখন্ড কোন রূপ পাওয়া যায় না ।বরং অনেক ধরনের বিভাজন পাওয়া যায়, যারা পরস্পরের থেকে আলাদা মনে করেন। নিজেদের এবং সামাজিক নিয়ম কানুনও সেভাবে গঠিত ছিল। ক্ষত্রিয় বলতে বাংলায় তেমন কোন বর্ণই ছিলনা ।প্রায় ১০০ বছর আগে উত্তর বাংলার একটি অংশ নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে ঘোষণা করে দেন ।সেই ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে উত্তর ভারতের ক্ষত্রিয়দের অনেক পার্থক্য ।বাংলায় যারা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে ঘোষণা করে সেটাকে এই বর্ণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ হিসেবে বলা যায়। আবার বাংলায় ব্রাহ্মণরাও কোন নির্দিষ্ট একটা বর্গ নন। পরস্পরের সাথে নানা সামাজিক দূরত্ব তারা বোধ করেন এবং সেগুলো চর্চা করেন ।বাংলায় কায়স্থ বলে একটা জাতি বর্ণ বিশেষভাবে দেখা যায়। এই ধরনের কোন নাম ভারতবর্ষের অন্য কোথাও

দেখা যায় না। ভারতবর্ষের সকল স্থানে নানাবিধ ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় এবং এক অঞ্চলের জাতি বর্ণ ভেদাভেদ অন্য অঞ্চলে একেবারে দেখা যায় না এক কথায় যত সরল ভাবে জাতি বর্ণ চার ভাগের কথা বলা হয়। তত সহজ হবে সেটি সমাজে পাওয়া যায় না। সে ক্ষেত্রে নানাবিধ বিভেদ লক্ষ্য করা যায় ।এই পরিস্থিতি সামলাতে গিয়েই কোন কোন গবেষক (Sub cast) ধারণা ব্যবহার করেছেন।

অনেক গবেষকই জাতি বর্ণ প্রথাকে প্রাচীন ভারতের শ্রমবিভাজন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ সমাজের কার কি কাজ এবং উৎপাদন কাজে কার কি অংশগ্রহণ হবে তার ব্যবস্থা হলো এই জাতি বর্ণ। কিছুটা আগে পর্যন্ত অনেক উদাহরণ পাওয়া যায় যে যেখানে কোন একটি জাতি বর্ণের সদস্যরা বংশানুক্রমিকভাবে একা নির্দিষ্ট পেশায় নিয়োজিত। যেমন নাপিত জেলে কোমর কামার তাঁতি ইত্যাদি। এক্ষেত্রে একটা ব্যাপার লক্ষ্য রাখা দরকার যে সাধারণভাবে সমাজের উঁচু জাতি বর্ণের সদস্যরা আর্থিকভাবে অনেকটা সচ্ছল ও তারা নিজস্ব পেশা নির্বাচন করতে পারে।

বিশ শতকের প্রথম দিক থেকেই উপরে বর্ণিত এ ব্যবস্থায় কিছু ভাঙ্গনের লক্ষণ চোখে পড়ে। নানান অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে ।অস্পৃশ্যদের অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন আসে ।সামাজিক সংস্কার আন্দোলন গুলিও জাতিভেদ প্রথা ও জাতিভেদের নায্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে থাকে। মহারাষ্ট্রের জ্যোতিবা ফুলে কিংবা কেরালার শ্রী নারায়ন গুরুর আন্দোলন এর উদাহরণ। ১৯২০ সালে পর থেকে গান্ধীজি অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের বিষয়টি জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে তোলেন। সে সময় অস্পৃশ্যদের সরকারি ভাষায় বলা হতো অবদমিত শ্রেণী

বিশ শতকে শেষের দশকের দিকে ডঃ বি আর আম্বেদকর এই অবদমিত শ্রেণীর প্রধান নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন। বড়দার মহারাজের দেওয়া বৃত্তি পেয়ে আম্বেদকর আমেরিকায় গিয়ে শিক্ষা লাভ করে আসেন। এই অতি নিপুন আইনজীবী নিজেই যাতে মাহার জাতি যা কিনা মহারাষ্ট্রে অন্যতম প্রধান অস্পৃশ্য জাত ।১৯৩২ সালে গান্ধীজি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারের বিরুদ্ধে অনশন শুরু করার পর আম্বেদকর পুনা বিধি মেনে নেন। ওই বিধি অনুযায়ী অবদমিত শ্রেণীগুলিকে ব্যাপক অর্থে হিন্দু সমাজের অন্তর্গত বলে মেনে নিয়েও তাদের জন্য আলাদা আসন সংরক্ষণের বন্দোবস্ত হল।

দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও অনুরূপ নানান ধারার জন্ম হলো ।পাঞ্জাবে আদি ধর্ম ,উত্তরপ্রদেশ আদি ধর্ম বাংলায় নমঃশূদ্র। দেখার ব্যাপার হলো পাঞ্জাব আর বাংলা দুই জায়গাতেই তারা ব্রিটিশ পন্থী পার্টি গুলির সঙ্গে হাত মেলালো পাঞ্জাবে ইউনিয়নবাদী ও বাংলায় কৃষক প্রজা

পার্টির সঙ্গে সব মিলিয়ে তপশিলি জাতির অবস্থাটা আগের চেয়ে অনেক ভালোহয়েছে। কিন্তু ধর্মান্তরন বা সংরক্ষণ দুটোর কোনটাই তার কারণ নয়। যদিও এই দুটো রণ-নীতি বেশি করে চোখে পড়ে ।এই উন্নতির পেছনে অদৃশ্য ভাবে সহায়ক হয়েছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া। শিল্পায়নের প্রক্রিয়া কৃষি উন্নয়নের প্রক্রিয়া, যার ফলে গ্রামীন কর্মসংস্থান বেড়েছে। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার অনুযায়ী হতদরিদ্র নিম্নতম জাতের লোকটির ভোট মূল্যবান হয়ে উঠেছে। এরও একটা ফল মিলেছে। অর্থাৎ আজকে শহরাঞ্চল থেকে অস্পৃশ্যতা উঠে গেছে বললেই হয়। গ্রাম অঞ্চলে তার মাত্রা রীতিমতো কমে গেছে। তপশিলি জাতির উপর অত্যাচার এখনও হয় বটে কিন্তু সেগুলো ঘটে উচ্চবর্ণের রীতিনীতিকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করার প্রতিক্রিয়ায় ।যেমন নিচু জাতের একটি ছেলে হয়তো উঁচু জাতের একটি মেয়ের সঙ্গে পালিয়ে গেল লোকেরা হয়তো চরমপন্থী রাজনৈতিক গোষ্ঠী গুলির সঙ্গে জড়িত হয়ে উঁচু জাতের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করল এসব অত্যাচারের ঘটনাকে কঠোরতম ভাষায় নিন্দা করতে হবে। কিন্তু একই সঙ্গে বুঝতে হবে যে এগুলো হচ্ছে নিচু জাতের লোকেদের ক্রমবর্ধমান আত্ম প্রতিষ্ঠার প্রমাণ। তবে শিক্ষা চাকরি অন্যান্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিধা এসব আয়ত্ত করার ব্যাপারে এখনো বড় রকমের তারতম্য রয়ে গেছে ।দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসংস্থান ও কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের মারফত রোজগার বাড়ানোর মতো দারিদ্র দূরীকরণ নীতির উপর ও অন্যান্য ব্যবস্থা ওপর জোর দিতে হবে। সামাজিক সচলতার অন্যতম বাহন হল শিক্ষা। তাই সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার এমনকি মাধ্যমিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করার উপর অবশ্যই জোর দিতে হবে। তার মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে নারী শিক্ষার উপর ।জাতপাত স্বাধীনতার পরে ব্যাপারটাতে বিরাট পরিবর্তন এসেছে অথচ আমাদের বিচারব্যবস্থা এখনো জাত সম্বন্ধে সেই বস্তা পচা ভুলে ভরা পাশ্চাত্য ধারনার ভিত্তিতে কাজ করে চলেছেন। বস্তুত পশ্চাত্পদ জাতির সংরক্ষণ নিয়ে যে রাজনীতি চলে তার সঙ্গে সামাজিক ন্যায় বিচার অপেক্ষা সংশ্লিষ্ট সুযোগ সুবিধা হাতানোর ও ক্ষমতার সম্পর্ক বেশি।

তবে অর্থনৈতিকভাবে বিরাট বদলের মধ্য দিয়ে বর্তমানকালে এই ব্যাপারগুলো আর আগের মত নেই। যেমন নাপিতদের সাবেক পেশায় এখন অনেক মানুষ আছেন যাদের জাতি বর্ণ নাপিত নয় ।এমনকি অনেক হিন্দু ধর্মের বাইরে কাপড়ের কলে নিযুক্ত।আর জাতিবর্ণ হিসেবে তাঁতীরা কাজ করছেননা।নানা ধরনের পেশায় এইসব জাতিবর্ণের সদস্যরা নিজেদের পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছেন ।উচ্চবর্ণ হিন্দুদের সচ্ছলতার কারণে ব্রিটিশ আমলে তারা শিক্ষা অন্যান্য ক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থানে

পৌঁছে গেছেন অন্যদিকে নিম্নবর্গের মানুষরা বংশানুক্রমিক ভাবে তাদের পূর্বপুরুষের পেশায় নিয়োজিত থেকেছে। তবে স্বাধীনতার পর্ নিম্ন বর্ণের প্রায় অনেক জাতি ব্যবস্থায় বহুমুখী পরিবর্তন ঘটে গেছে।

একবিংশ শতাব্দীতে এসে জাতিভেদ প্রথার উপর আলোচনা ও আলোড়ন কোনটাই সুধীজনের কাছে বোধ হয় অভিপ্রেত নয়। কিন্তু এই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই যে পুরা কালের কোন কোন বিষয়বস্তু, নিদর্শন আধুনিক যুগের ঐতিহাসিক ,সমালোচক ও গবেষকদের ভাবনাচিন্তার সুখকর খোরাক হয়ে ওঠে।সুপাচীন এই জাতিভেদ প্রথা, একটা প্রথা মাত্র। সামাজিক প্রচলিত রীতি । ধর্মও নয় রাজনীতিও নয়। কিন্তু এর ব্যাপ্তি ও প্রভাব অসীম ।আজ সেই পুরাকালের বর্ণ ও জাতি প্রায় সমার্থক শব্দে পরিণত হয়েছে। আধুনিক যুগে অর্থাৎ মেকলে এবং রামমোহনের যুগের শুরুতেই বাঙালি হিন্দু সমাজে এই শ্রেণীর স্তরের কিছুটা পরিবর্তন দেখা যায়। সমাজে বৈদ্য এবং কায়স্থদের পরের স্থান নবশাঁখদের অর্থাৎ গোপ ,মালি ,তাম্বুলি, শঙ্খকার, কংসকার ,কর্মকার ,কুম্ভকার , তন্তুবায় ও নাপিত এই নয় জাতির জলচল। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জাতি মর্যাদা উন্নত করার আন্দোলন করে তিলি বারুজীবী, গন্ধবানিক এবং মোদক ও নবশাখ পর্যায়ে চলে আসেন ।গোপ জাতীর লোকেরা পশু পালন বৃত্তি ত্যাগকরে কৃষি ও কৃষি জাতীয় দ্রব্যের ব্যবসায় মননিবেশ করেন ।আবার ভেদাভেদের প্রাচীর প্রত্যেক শ্রেণীর স্তর উপস্তরের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল এবং এখনো আছে। যদিও বর্তমান আর্থসামাজিক বিবর্তন, শিক্ষার প্রসার ও মানবিক মূল্যবোধের পরিবর্তনের প্রভাবে এই ভেদাভেদ ক্রমশ অবলুপ্তের পথে।

আলোচনার শেষে একথা বলতে হয় যে দেশে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে ,উন্নতমানের সংস্কৃতির অনুশীলন চলছে ,বিজ্ঞানের অগ্রগতি হয়েছে, মানুষের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে ,মানবিক ধ্যান ধারণায় মানুষ উদ্‌বুদ্ধ হয়েছে ,মানুষের ভেদাভেদ জ্ঞান সংকীর্ণ হয়েছে , তথাপি স্বল্প সংখ্যক গোঁড়া এবং অনুদারপন্থী রক্ষণশীল মানুষ আজও জাতিভেদ জনিত ছোট জাত ,বড় জাত ,স্পৃশ্য অস্পৃশ্য প্রভৃতি নক্কারজনক মনোভাব থেকে মুক্ত হতে পারেননি । জাতিভেদ ও বর্ণভেদ সমস্যাকে সামন্ততন্ত্র জনিত সমস্যার অজুহাতে পাশ কাটিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জাতিভেদ প্রথা উচ্ছেদ ও কুসংস্কার মুক্তির আন্দোলন বা প্রকৃত অর্থে সংস্কার আন্দোলন করেননি ।তাদের ধারণা ছিল নগরীকরণ এর মাধ্যমে নিম্নবর্গ মানুষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হলে জাতিভেদ প্রথা ধীরে ধীরে নির্মূল হয়ে যাবে ।যদিও এরূপ ধারণার প্রতিফলন খুবই সামান্য।

আবার জাতীয় অবস্থায় বিলুপ্তির অঙ্গ হিসেবে উপাধি মোচন বা

পৈতা পরিত্যাগের বিষয়টি বাংলায় জাতীয় ব্যবস্থার নতুন সমস্যা সংযোজন করেছে। জাতিপ্রথার ভ্রান্ত বিশ্লেষণের ফলে পৈতার প্রভাব এতই বিস্তারলাভ করেছিল যে বুদ্ধদেব থেকে আরম্ভ করে প্রায় সকল সমাজ সংস্কারগণ এবং তাদের অনুগামীগন জাতি বিভক্তির অপ্রয়োজনীয় শোভা ছিড়ে ফেলে জাতি পৃথকীকরন এর ক্ষতিকারক প্রভাব খর্ব করতে সচেষ্ট ছিলেন। অথচ এযুগে আবার পৈতা পরিধান করে বাংলার কায়স্থ ,বৈদ্য, নমঃশূদ্র যুগী, কৈবর্ত ,সুবর্ণ বণিক, রাজবংশী ও ধোপা প্রভৃতি জাতি গুলির কারো কারো পৈতা পরিধানে তৎপরতা দেখা গিয়েছে। এ যুগে ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্যের অভিজ্ঞান পৈতা ।কিন্তু হাল আমলে অব্রাহ্মণদের পৈতা পরিধান ও উপাধি পরিবর্তনের হিরিক পড়েছে। কিন্তু কেন ?এই পদ্ধতিতে আত্মগোপন প্রচেষ্টার মধ্যে নিহিত রয়েছে।আবার অনুসন্ধানে এও জানা যায় যে আমাদের দেশে দুজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মধ্যে পরিচয় প্রদান কেবলমাত্র নাম জানাজানির মধ্যেই আটকে থাকেনা। নাম ধাম উপাধি উল্লেখের পরেও প্রশ্ন থেকে যায় আপনারা? অর্থাৎ আপনি কোন জাতির লোক ?যেহেতু অপরিচিত কারো জাতির নাম সরাসরি জানবার আগ্রহ প্রকাশ করা আধুনিকতা বিরোধী তাই শেষ প্রশ্ন আপনারা ?স্বজাতি অনুসন্ধান বা কুটুম্বীতা করার প্রাগ প্রস্তুতি এখানে গৌণ ।প্রকৃত উদ্দেশ্য অপরিচিত ব্যক্তির জাতির পরিচয় পাবার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা হবে ।শহরের এই পদ্ধতি প্রায় অচল হলেও গ্রামেগঞ্জে এই পদ্ধতি এখনওবহাল তবিয়তে প্রচলিত আছে।

৪.৮.৭. উপসংহার

তবে আধুনিক যুগে মানুষের বস্তুগত মূল্যবোধ জাতপাত ব্যবস্থায় দ্রুত পরিবর্তন এনেছে । স্বাধীন বাংলায় এই পরিবর্তন চোখে পড়ার মতো। পুরানো ধ্যান-ধারণা, আচার অনুষ্ঠান, কুসংস্কার প্রভৃতি যুক্তি পাথরে ঘষে যাচাই করে সমাজের পক্ষে অমর্যাদাকর ও অনিষ্টকর রীতিনীতিকে মানুষ আজ উপেক্ষা করছে। পূর্বে প্রচলিত বিশ্বাস প্রথা তা সে ধর্মীয় বা সামাজিকই হোক সে আচার অনুষ্ঠান পালন ত্রুটিপূর্ণ হলে পাপ হয় বলে প্রচার চালানো হতো। সামাজিক দণ্ডবিধানের কঠোর ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল। আজকের যুগের সর্বস্তরের মানুষের অনেকেই তা ভেবে নিজেকে হাস্যের খোরাক মনে করছেন। সামাজিক ক্রিয়া কর্ম, বিবাহ অনুষ্ঠান, প্রেম ভালোবাসার সঙ্গে স্পৃশ্য অস্পৃশ্যবোধ, মানুষের সম্পর্কের সূত্র গুলির আমূল সংস্কার হয়ে পরিবর্তিত রূপে দৃশ্যমান । বস্তুত মানুষের মানবিক সম্পর্কের চরিত্র ক্রমশ পাল্টে যাচ্ছে ।শিল্প প্রধান দেশ গুলিতে ধর্ম সংগঠনের প্রভাব যেমন ধীরে ধীরে কমে আসছে তেমনি স্বাধীনতাত্তোর

বাংলার ধর্ম ও বিজ্ঞানের গবেষণায় ধর্মের চেয়ে বিজ্ঞানের দানকেই মানুষ অধিকতর গুরুত্ব দিচ্ছে।

৪.৮.৮. ধর্ম ও নারী

বিশ্ব ইতিহাসের প্রায় সকল রাষ্ট্রর রাজনৈতিক ব্যবস্থা,শাসন পদ্ধতি, প্রকরণ ক্ষমতা বিন্যাস প্রভৃতি পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর বেড়াজালে আবদ্ধ । ফলত বিশ্ব সমাজ ব্যবস্থায় নারী আজ অর্ধেক মানবী হওয়া সত্বেও তার আশা আকাঙক্ষা অভিব্যক্তি প্রভৃতি যেন অস্তমিত। যেখানে নারী পুরুষের দ্বারা সৃষ্ট প্রতিভাস মাত্র। পুরুষ শাসিত সামাজই তাকে নারী হয়ে ওঠার শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলে। নারী পুরুষের এই লিঙ্গগত কৃত্রিম বিভাজনই আজ আর্থ-সামাজিক তথা রাজনৈতিক ব্যবস্থার গঠন বিন্যাসে ও বিকাশে নারীর ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত করে তুলেছে।

৪.৮.৯ বিভিন্ন ধর্মে নারী

নানা প্রাতিষ্ঠানিক বিধিব্যবস্থা নিয়ম-কানুন লোকাচার প্রভৃতির ক্ষেত্রে নারীকে ব্রাত্য করে রাখার প্রয়াস অতি প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে ।যেখানে নারী কিংবা নারীদের অধিকার বারবারই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। যেমন ইসলাম ধর্মে নারীকে পুরুষ মোড়কে আচ্ছাদিত করার প্রয়াস উপলক্ষিত হয়। যেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীকে কেবল সন্তান উৎপাদনের ও তা প্রতিপালন করার যন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। খ্রিস্টধর্মে নারীর অবস্থানগত কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না । যেখানে নারীকে অপবিত্র পুরুষ প্রলুব্ধকারী , পৃথিবীতে পাপ সৃষ্টিকারী বস্তু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে । তবে হিন্দু ধর্ম যেন সকলকে ছাড়িয়ে গেছে। হিন্দু ধর্মের মহাপুরাণ ,রামায়ণ ,মহাভারত কিংবা বা বাৎসায়নের কামসূত্রে নারীকে দূর্গা, লক্ষ্মী প্রভৃতির সঙ্গে তুলনা করলেও পরক্ষণে আবার তাকে দুর্ভাগা, অসতী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত ধন-সম্পদ ভিত্তিক পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বুনিয়াদকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যেই তথাকথিত ধর্মীয় বিধি-বিধানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে পুরুষের প্রভুত্ব ও নারীর সার্বিক হীনতার তত্ত্ব ।

৪.৮.১০.স্বাধীনতার পরবর্তীতে নারীর মর্যাদা ও অবস্থান

বিশ শতকের আশির দশকে ভারতবর্ষে নারী বিষয়ক আলোচনা জোরদার হয়ে উঠতে থাকে। ইংরেজিতে Gender শব্দটিকে নারী ও পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ক বোঝানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে । Gender শব্দটি বাংলা প্রতিশব্দ লিঙ্গ । তাই লিঙ্গ সম্পর্ক বলতে নারী-পুরুষের মধ্যকার সামাজিক

অসমতা বোঝায় ।এখানে অসমতা বলতে সহজ ভাবে ক্ষমতা মর্যাদা আর সম্পদের পার্থক্যকে বোঝা যেতে পারে।

একসময় মাতৃ অধিকার ছিল বলে সামাজিক বিজ্ঞানের অনেক চিন্তাবিদ মনে করেন সমাজ এবং পরিচালনায় যাবতীয় কর্তৃত্ব ছিল নারীর হাতে। কেবল তাই নয় সন্তানের পরিচয় নির্ধারিত হতো মায়ের দ্বারা। আবার প্রথম দিকের সামাজিক বিভাজন দেখতে গিয়ে নৃবিজ্ঞানীরা মূলত কাজ কর্মের ভাগাভাগির পদ্ধতির উপর মনোযোগ দিয়েছেন ।কোন সমাজে কাজ কর্মের ভাগাভাগির প্রক্রিয়াকে সামাজিক বিজ্ঞানে সমবিভাজন বলা হয়। এর মানে হলো খাদ্য উৎপাদনের কাজে পুরুষের কিছু স্বতন্ত্র দায়িত্ব আছে। আর নারীর কিছু স্বতন্ত্র দায়িত্ব আছে। উৎপাদনের কাজে নারী ও পুরুষের দায়িত্বের বিভাজনকে লিঙ্গের শ্রমবিভাজন বলা হয়। যেসব সমাজকে শিকারী সংগ্রহকারী সমাজ বলা হয়ে থাকে সেখানে প্রায়শই পুরুষরা শিকারি এবং নারীরা সংগ্রহকারী ।এর অর্থ হচ্ছে শিকারের কাজ কিছু পুরুষেরা করে থাকেন এবং নারীরা ও অন্যরা যেমন বয়স্করা ও বাচ্চারা ফলমূল সংগ্রহ করে থাকেন।

কাজের ভিন্নতা দিয়ে সমাজে নারী পুরুষের ভেদাভেদ বুঝতে যাওয়া ঠিক হবে না ।কারণ ভারতীয় সহজ সরল সমাজে যেখানে বাচ্চা দেখা শোনার কাজ মেয়েরা যেমন করে থাকেন পাশাপাশি বয়স্ক লোকজন একটু বেশি বয়সের বাচ্চারা এমনকি পুরুষেরা যারা উৎপাদন কাজে যাচ্ছেন না তারাও যে কেউ এই দায়িত্ব পালন করে থাকেন

কোন কোন যুক্তিবাদীরা এ যুক্তি দেখে থাকেন যে নারীরা শারীরিকভাবে দুর্বল হওয়ায় সমাজে কাজকর্মের হেরফের এবং এ কারণেই নারী পুরুষের তুলনায় বঞ্চনার শিকার হয়ে থাকে কিন্তু এই যুক্তি খুবই একপেশে ও দুর্বল। কারণ সমাজবিজ্ঞানের গবেষণা থেকেই এমন প্রমাণ মিলেছে যে সমাজে নারীরা আবার এ ধরনের যুক্তি শোনা যায় যে নারীরা সমাজে কম গুরুত্বের কাজগুলো করে থাকেন এবং সে কারণে সমাজে তাদের বঞ্চনা - এ যুক্তিরও বড় ধরনের দুর্বলতা রয়েছে ।প্রথমত নারীরা যে কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকেন তা নয় ।সুতরাং এসব আলোচনা মধ্য দিয়ে সহজে বোঝা যায় যে সমাজে নারী পুরুষের ভেদাভেদ বা বৈষম্যের উৎস অন্য কোথাও।

বর্তমানকালে নারী পুরুষের বৈষম্যের কতগুলো দিক ধরা পড়ে । বর্তমানে ঘরের কাজের বাইরে সকল কাজই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে করে থাকেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে নারীদের মজুরিতে রয়েছে বৈষম্য। পুরুষ শ্রমিকের তুলনায় নারী শ্রমিকদের মজুরি অনেক কম। এছাড়া কর্ম ক্ষেত্রে নারীদের নানা ধরনের হয়রানির শিকার হতে হয়। নারীর জন্য বাড়তি

নিপীড়ন হচ্ছে যৌন হয়রানি। এর মধ্যে থেকে আজ নারীদের কাজ করতে হয় নারী শ্রমিক হিসেবে। কিন্তু রোজগার করার কারণে নারী তার ঘরের কাজের হাত থেকে মুক্তি পান না কর্মক্ষেত্রের শ্রমিকের কাজ করে তাকে আবার রান্না করা বাচ্চা দেখাশোনা কিংবা অন্যদের সেবা যত্ন করতে হয়। শিক্ষিত এবং সচ্ছল শ্রেণীর নারীদের বাস্তবতা কিছুটা ভিন্ন ।আবার চাকুরীতে বেতন কাঠামোর বৈষম্য না থাকলেও নিয়োগের ক্ষেত্রে পুরুষের প্রাধান্য দেখা যায়।যদিও নিয়োগ বিধিতে উভয়লিঙ্গ সমান প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলা হয়ে থাকে।

স্বাধীন বাংলায় নারী চাকুরী করুন বা নাই করুন স্বচ্ছ নারীদেরকেও ঘরের কাজ , বাচ্চাদের দেখাশোনা বা লেখাপড়া করানো অন্যদের বিশেষভাবে স্বামীকে দেখাশোনা করার কাজ করতে হয়। এক্ষেত্রে না করতে চাইলে সেটা খুব নিন্দনীয় বিষয় হয়। এছাড়া নানারকম হয়রানির আতঙ্ক এই শ্রেণীর নারীদের কর্ম ক্ষেত্রেও রয়েছে পত্র-পত্রিকায় সে ব্যাপারে প্রচুর প্রতিবেদন বের হয়।

বর্তমান সমাজে সচ্ছল বা শ্রমিক উভয় শ্রেণীতেই বিয়ের মধ্যেও নারী পুরুষের ভেদাভেদ বা বৈষম্য চোখে পড়ার মতো। আজও উভয় শ্রেণীতে যৌতুক দেওয়া নেওয়া বিষয়টি বর্তমান রয়েছে। যদিও সাধারণভাবে মনে করা হয় যৌতুক কেবল দরিদ্র মানুষের মধ্যে প্রচলিত । কিন্তু বাস্তবে তা নয, আসলে সচ্ছল মানুষজন যৌতুককে উপহার বলে চালিয়ে যায় ।আবার যৌতুকের কারণে শারীরিক নির্যাতন ও উভয় ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। নারী পুরুষ অসমতার একটা প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে ঘরের কাজ। এতে পুরুষের প্রায় কোন ধরনের অংশগ্রহণ থাকে না বললেই চলে থাকে। পুরুষ রোজগার করে আর নারী সংসার চালায় কিন্তু শহরে সচ্ছল শ্রেণীতে এমন কথা খুব একটা খাটে না নারীরাও সেখানে রোজগার করেন।

উক্ত নানাবিধ নিপীড়নের পাশাপাশি আরেকটা বৈষম্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে নারীকে নিরন্তর নব মূল্যায়ন করা। নারীর কাজ চিন্তা সবকিছুকে উপেক্ষা করা হয়। এই অবমূল্যায়ন বা অমর্যাদা কে বিশ্লেষণ করলে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব ঘটে। তবে এই দেশ এ দৃষ্টিভঙ্গিকে পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি না বলে সংক্ষেপে পুরুষবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বলা হয়। হচ্ছে যে চিন্তা দ্বারা নারীকে অক্ষম মনে করা হয়। নারীর প্রতি আক্রমণাত্মক পরিবেশ তৈরি করা হয় এবং নারীকে যাবতীয় সুবিধার বাইরে রাখার ব্যাখ্যা তৈরি করা হয়। কিন্তু এত আলোচনা সত্ত্বেও এই পুরুষবাদি দৃষ্টিভঙ্গির বদল না ঘটলে নারী পুরুষের সমতার পুরো লক্ষ্য অর্জিত হবে না।

বর্তমান পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারত বর্ষ ।ভারতবর্ষের আর্থসামাজিক বিকাশ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা গঠনমূলক পরিকাঠামো

ইত্যাদি বিশ্ব সমাজ ব্যবস্থায় ভারত বর্ষকে খ্যাতি ও মর্যাদা শিখরে উন্নীত করলেও একবিংশ শতকের প্রথমার্ধে পৌঁছে আজও নারীর অবস্থান যেন একটু অস্পষ্ট আলোর বিন্দু। যদিও এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে ভারতবর্ষের ইতিহাস অতীত প্রাচীন হলেও সর্বদাই মানবতার জয় গান গেয়েছে। ভারতের তথা বাংলার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন কিংবা আর্থসামাজিক বিকাশে নারী এক অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছে ঠিকই কিন্তু কালভেদে নারী সমাজের প্রতি বিমুখীনতার চিত্র আমরা খুঁজে পাই ,যেখানে লাঞ্ছনা গঞ্জনা অবদমন এমনকি ধর্ষণ প্রভৃতি যেন নারী সমাজের প্রাত্যহিক জীবনের আনুষাঙ্গিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্বাধীনতার পরে গোটা ভারতের ন্যায় বাংলার মেয়েদের আইনগত,রাজনৈতিক ,শিক্ষাগত ও সামাজিক অবস্থায় নাটকীয় পরিবর্তন এসেছে ।এটা মোটেই অপ্রত্যাশিত ছিল না ।কারণ উনিশ শতকের প্রথমদিকে যখন রামমোহন রায় সামাজিক গোঁড়ামি নিয়ে প্রশ্ন তুলতে থাকেন তখন থেকে মেয়েদের অবস্থার উন্নতি ঘটানোটা স্বাভাবিক সংস্কার আন্দোলনের একেবারে কেন্দ্রীয় প্রশ্ন হয়ে উঠেছিল ।স্বাধীনতার পরে সময় এলো এতদিনকার কঠিন লড়াই এর মধ্যে দিয়ে যা অর্জিত হয়েছে তাকে গুছিয়ে তোলা ।তখন সবার মনোযোগটা গিয়ে পড়লো আইনি ও সাংবিধানিক অধিকারগুলোকে সুনিশ্চিত করার দিকে ।সংবিধান মেয়েদের পূর্ণ সাম্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বহুকাল আগে ।জাতীয় আন্দোলন যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তাই এবার পূর্ণ হল। ছেলেদের মত মেয়েরাও ভোটাধিকার পেলেন। নির্বিশেষে পেলেন শিক্ষা সম্পত্তি আয়ের অধিকার।

জাতীয় আন্দোলনের সময় যেসব রাজনৈতিক সংগঠনগুলি কাজ করছিল, স্বাধীনতার পর তারা যে যার পথে চলতে লাগলো। এর ফলে নারী আন্দোলনে এলো বৈচিত্র্য ।অনেক নেত্রী নারীর মঙ্গল সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাজকর্মে জড়িত হলেন । দেশভাগের সময় ব্যাপক জন চলাচল ও দাঙ্গার দরুন যেসব নারী হারিয়ে গিয়েছিলেন বা পরিত্যক্ত হয়েছিলেন তাদের পুনর্বাসন ও উদ্ধার করা ,কর্মরতা মহিলাদের জন্য শহরে নারী হোস্টেলে স্থাপন এবং মেয়েদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এসব কর্মকাণ্ডেরঅঙ্গ হিসেবে যুক্ত হয়।১৯৫৪ সালে কমিউনিস্ট মহিলারা সারা ভারতীয় জাতীয় নারী সংঘ প্রতিষ্ঠা করলেন। বাংলায় ১৯৪৬-৪৭ সালের তেভাগা আন্দোলনের সময় মেয়েরা নারী বাহিনী নামক আলাদা মঞ্চ তৈরি করলেন। তারা আশ্রয় কেন্দ্র পরিচালনা করতেন ও খবরাখবর দেওয়া নেওয়া করতেন ।সক্রিয় কমিউনিস্ট মহিলারা গ্রামের নারীদের নির্দিষ্ট নারী বিষয়ক সমস্যার মোকাবিলার জন্য সংঘবদ্ধ করতেন।

৪. ৮.১১.উপসংহার

একুশ শতকে নারীর উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করার লক্ষ্যে ২০০১ সালকে নারীর ক্ষমতায়নের বর্ষ বলে অভিহিত করা হয়। আর রাষ্ট্রপুঞ্জের উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিশেষভাবে স্থান পায় নারীর শিক্ষা, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ,শিশু শ্রম রোধ, নারীর ক্ষমতায়নের মূল্য নির্ধারণ এবং সংসদে মহিলা প্রতিনিধিত্বর বিষয়গুলি । এর ফলে নিঃসন্দেহে স্বাধীন বাংলায় নারী এগিয়ে চলেছে তার সব অধিকার অর্জন করে নেওয়ার পথে।

একক- ৯ : The Refugee factor

৪.৯.১. ভূমিকা

দেশভাগ হওয়া মানে কেবল তার রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক বিভাজন নয়। ভাগ হয়ে যায় তার সমাজ সংস্কৃতি , দ্বিখন্ডিত হয়ে যায় মানুষের মন। ভারতের ক্ষেত্রে এই ঘটনা ছিল আরো মর্মান্তিক। কারণ স্বাধীনতার আনন্দের সঙ্গে মিশে আছে দেশভাগের বেদনা । যেহেতু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সঙ্গেই ঘটেছিল দেশভাগ, তাই সকলের আশু উদ্যোগ ছিল স্যার সিরিল রীয়াডক্লিফ এর অধীনে গঠিত কমিশনগুলি কি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে তা নিয়ে। পাঞ্জাব আর বাংলার কমিশন দুটি দুজন করে মুসলমান ও দুজন করে অমুসলমান বিচারক নিয়ে গঠিত হয়েছিল। যার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন স্যার ক্লিফ যার ভারত সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না এবং যাকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে সীমানা রেখা ভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ।অবশ্যই মূল বিচার্য বিষয় ছিল প্রতিটি জেলার ধর্মীয় জন চিত্র দেখা। এরফলে তাড়াহুড়ো করে আঁকা সীমানা রেখাগুলো নিয়ে সমস্যা অবধারিতভাবেই দেখা দিল সমস্যা , লোকের মনে অসন্তোস জেগে উঠলো । বড়লাট আগেই তা জানতেন। তাই আনুষ্ঠানিক ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর ও আনন্দ উৎসব সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত রায় ঘোষণা স্থগিত রাখলেন।

দেশভাগের ফলে যে রায় ঘোষণা করা হলো তাতে পশ্চিম পাঞ্জাব গেল পাকিস্তানে , পূর্বপাঞ্জাব রইল ভারতে অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ রইলো ভারতে ও পূর্ব বাংলা পূর্বপাকিস্তানে । তবে দেশভাগের সবচেয়ে গুরুতর ব্যাপার হলো সীমান্তের দুদিকেই এমন বেশ কিছু লোক রইলো যারা সংখ্যালঘু নামে পরিচিত হলো ।এদের ভবিষ্যৎ হয়ে উঠল অনিশ্চিত ।নতুন সীমানা ঘোষণা হওয়ায় এদের উপর মানসিক চাপ বাড়তে লাগলো। অনেকেরই মনে হল তারা নিজ বাসভূমিতে থেকেও যেন শত্রু দেশে বহিরাগত হয়ে রয়েছেন । অর্থাৎ দেশভাগের অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ পূর্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ সংখ্যালঘু উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবাংলায় চলে আসে, যা

স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবাংলার ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। পশ্চিমবাংলার অর্থনীতি ,রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিতে এর প্রভাব প্রবলভাবে অনুভূত হয়।

৪.৯.২. দেশভাগ ও তার তাৎক্ষণিক চিত্র

দেশভাগের পর এই উপমহাদেশের বিভিন্ন লোকের কাছে স্বাধীনতা শব্দটি বিভিন্ন অর্থ বহন করেছিল। পাকিস্তানে রাজনৈতিক উচ্চবর্গের কাছে দেশভাগের অর্থ ছিল স্বাধীনতা হিন্দু সংখ্যাগুরুদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব থেকে মুক্ত । আবার ভারতীয়দের অল্প কিছু লোক স্বাধীনতা লাভ নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেও অন্য অনেককে দেশভাগের জন্য চরম মূল্য দিতে হল- যেমন উদবাস্তদের আর সংখ্যালঘুদের। এক্ষেত্রে হিংসার চেয়েও মারাত্মক ঘটনাগুলো ঘটলপাঞ্জাবে। ১৯৪৭ সালের আগস্ট থেকে নভেম্বর মধ্যে প্রায় ৪৫ লক্ষ হিন্দু ও শিখ পূর্ব পাঞ্জাবের চলে এলো আর ৫৫ লক্ষ মুসলমান চলে গেল পশ্চিম পাকিস্তানে। বাংলায় উদ্বাস্তুরা বিভিন্ন জায়গায় এসে পৌঁছলেন। জ্ঞানেন্দ্র পান্ডের হিসেব মতো ১৯৪৭-৪৮ সালে শুধু দিল্লিতেই প্রায় পাঁচ লক্ষ অমুসলমান প্রধানত হিন্দু ও শিখ উদ্বাস্তু এসেছিলেন ।অপরদিকে বাংলা যখন ভাগ হলো অমুসলমান জনসমষ্টির ৪২ শতাংশের বাস ছিল পূর্ব পাকিস্তানে। প্রফুল্ল চক্রবর্তীর হিসেব অনুযায়ী তাদের মধ্যে প্রায় এগারো লক্ষ মানুষ পশ্চিমবাংলায় চলে আসে ।এই সমস্ত চলে আসা ব্যক্তিদের কে বলা হলো উদ্বাস্তু ।কারণ বাসস্থান থেকে যারা উৎখাত হলেন তারা এই অর্থে উদ্বাস্তু যে তারা স্বেচ্ছায় বাসত্যাগ করেননি এবং দুই সরকারের কোনোটি সংগঠিত ও সুশৃংখলভাবে জন বিনিময়ের কোন ব্যবস্থা করেননি। বস্তুত দুটি সরকারই সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করেছিল যাতে পাঞ্জাব ছাড়া অন্য সব অঞ্চল থেকে এই জন চলাচল থামানো যায়।

৪.৯.৩. উদ্বাস্তুর আগমন

বঙ্গ বিভাজনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিমবাংলায় বিপুল সংখ্যায় উদ্বাস্তুর আগমন শুরু হয়। বিপরীতমুখী যাত্রা ছিল তুলনাই অনেক কম। প্রথম পর্যায়ে উদ্বাস্তু আগমন শুরু হয় নোয়াখালী দাঙ্গার পর থেকে যা চলে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত ।এই সময়কালে যারা এসেছিলেন তাদের অধিকাংশই ছিল জমির মালিক ব্যবসায়ী অথবা পেশাজীবী শ্রেণী যারা দেশত্যাগ করেছিল মূলত অপমানিত হয়ে অথবা অপমানিত হওয়ার ভয়ে ।এরা পশ্চিমবাংলার অর্থনীতিতে সেভাবে চাপ সৃষ্টি করেনি ।দ্বিতীয় পর্যায়ে উদ্বাস্তুর আগমন শুরু হয় ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ পূর্ববাংলার বিভিন্ন অংশে ব্যাপক দাঙ্গার পরে । এই

সময় উদ্বাস্তু আগমন বন্যার আকার নেই। এই সময় যারা এলো তাদের অধিকাংশই ছিল দরিদ্র অথবা নিম্নবিত্ত সম্প্রদায, যাদের সাধারণভাবে দলিত শ্রেণী বলা হয়। এ পর্বে সমস্ত কলকাতা যেন এক বিশাল উদ্বাস্তু শিবিরে পরিণত হলো । উদ্বাস্তু আগমনের তৃতীয় পর্যায় শুরু হয় ১৯৫২ সালের শেষ দিকে। ১৯৬২ ও ১৯৬৪ -৬৫ তে আবার বহু মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আসে এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রায় ৮০ লক্ষ উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেয়। এদের অনেকে পরবর্তীতে ফিরে গেলেও বেশিরভাগ মানুষই ফিরে যায়নি। এরপরে বাংলাদেশে যে দাঙ্গা হয় তার ফলস্বরূপ বহু মানুষ বাধ্য হয়ে সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিতে থাকে এদের যদিও আমরা উদ্বাস্তু বলি না--অনুপ্রবেশকারী বলা হয়ে থাকে।

৪.৯.৪. উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন

উদ্বাস্তু আগমন সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত নিলিপ্ত ।প্রথম দিকের উদ্বাস্তু যেহেতু আর্থিক দিক থেকে তুলনামূলকভাবে অনেক সচ্ছল ছিল এবং সরকারি ত্রাণ ও পুনর্বাসনের মুখাপেক্ষী ছিল না সেহেতু সরকার বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবনে ব্যর্থ হয়। কিন্তু পঞ্চাশের দশক থেকে যখন বন্যার মত উদ্বাস্তু স্রোত পশ্চিমবঙ্গে আছড়ে পড়তে থাকে তখন সরকারের অপ্রস্তুত চেহারাটা প্রকট হয়ে ওঠে। সরকার এই অবস্থাতে উদ্বাস্তুদের স্থায়ী পুনর্বাসনের কথা চিন্তা ভাবনা করতে থাকে।ইতিমধ্যে ভারত সরকার এই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দিয়ে তাদের নাগরিকত্বের পরিচয় কি হবে? তার রূপরেখা তৈরি করতে উঠে পড়ে লাগলো ।উদ্বাস্তু পুনর্বাসন হয়ে উঠল সরকারের একটা প্রধান সমস্যা। কারণ একেক অঞ্চলে উদ্বাস্তু আগমনের চরিত্র ছিল একেক রকম। দিল্লিতে এই পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য ভারত সরকার অবিলম্বে মন্ত্রিসভার এক আপৎকালীন কমিটি তৈরি করল ।উদ্বাস্তুদের দেখাশোনার জন্য একটি ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্র তৈরি হল। সব মিলিয়ে পুরো পাঞ্জাব সরকার ও জাতীয় সরকার উভয়ই উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য বিপুল টাকার সংস্থান করল যদিও বহু ক্ষেত্রে তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ছিল না। তাছাড়া এসব সুযোগ-সুবিধা সকলকে সমানভাবে দেওয়া হয়নি। যেসব উদ্বাস্তুর সামাজিক সাংস্কৃতিক যেমন শ্রেণীগত বা জাতিগত সুবিধা বা উপযুক্ত রাজনৈতিক যোগাযোগ ছিল তারা অনেক সময় অপেক্ষাকৃত বেশি সুযোগ-সুবিধা পান অথচ বাংলার দলিত উদ্বাস্তুরা বঞ্চিত হতে থাকে।

উদ্বাস্তু ও পুনর্বাসন বিষয়ে বাংলার ক্ষেত্রে সরকারের সামনে দুটি বিকল্প পথ খোলা ছিল- পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তরে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা

অথবা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা ।এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ ছিল উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের এক বিস্তীর্ণ পার্বত্য বনাঞ্চল জুড়ে দণ্ডকারণ্য প্রকল্প ।বিভিন্ন পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে উদ্বাস্তুদের সেখানে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু এই পরিকল্পনা বিশেষ সফল হয়নি ।বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে উদ্বাস্তদের অনেকেই আবার পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসতে থাকে এবং বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অদম্য সাহস ,অমানুষিক পরিশ্রম ও উদ্যমকে সম্বল করে বাংলার বিভিন্ন জায়গায় জোর করে জমি দখল করে ও বাসস্থান হিসেবে বিভিন্ন কলোনি গড়ে তুলেছিল। এইভাবে সমবেত প্রচেষ্টা ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে উদ্বাস্তুরা জবরদখল কলোনি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের বাসস্থানের সমস্যার অনেকটা সুরাহা করেছিল।

বাংলায় এই দেশভাগের প্রক্রিয়াটি ছিল অনেক দীর্ঘ ও জটিল ।কারণ ১৯৪৭-৪৮ সাল নাগাদ যে অপেক্ষাকৃত ছোট গোষ্ঠীটি পশ্চিমবাংলায় চলে এসেছিলেন,তারা ছিলেন উচ্চবর্ণের জমির মালিক বা মধ্যবিত্ত হিন্দু। যারা সম্পত্তি বা চাকরি বিনিময়ের ব্যবস্থা করে নিতে পেরেছিলেন। পুনর্বাসন দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী ১৯৪৯-এর জুলাইয়ের আগে মাত্র ১৩ লক্ষ লোক পুরো পাকিস্তান ছেড়ে চলে আসেন। এরা অনেকে নিজেদের পুনর্বাসিত করে নেন। অন্যরা পড়ে থাকা জমি জোর করে দখল করে নিয়ে জবরদখল কলোনি গড়ে তোলেন ।কিন্তু সমস্যা দেখা দিল যখন পূর্বপাকিস্তানের খুলনায় ডিসেম্বর জানুয়ারিতে নতুন করে দাঙ্গা বাঁধে। এই সময় অনেকটা বড় সংখ্যায় কৃষিজিবিরা পশ্চিমবাংলায় চলে আসেন ।আবার খুলনায় হাঙ্গামার পর ১৯৫১ সালের মধ্যে প্রায় ১৫ লক্ষ হিন্দু উদ্বাস্ত পশ্চিম বাংলায় চলে এসেছিল। কিন্তু যে হিংসার হাত থেকে বাঁচতে এরা এসেছিলেন বলে শোনা গেছিল তার মাত্রাটা যে অত্যন্ত গুরুতর এবং তার ফলে বিপুল সংখ্যক মানুষ যে পুরো বাংলা ছেড়ে বাংলায় চলে আসতে পারে সেটা ভারত সরকার বিশ্বাস করেনি। এরফলে দেশত্যাগী এসব মানুষদের উদ্বাস্তু বলে চিহ্নিত করা হয়নি।এদের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় দেওয়া হল বটে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নেহেরু সত্যি সত্যিই এদের ফেরত পাঠিয়ে দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্য নেহেরু ১৯৫০ সালের ৮ই এপ্রিল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের সঙ্গে একটি চুক্তি সই করলেন যা সংখ্যালঘু বিষয় দিল্লি চুক্তি নামে পরিচিত ।এই চুক্তির মূল উদ্দেশ্য ছিল দুই বাংলায় এবং আসামে সংখ্যালঘুদের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনা ।ভারত সরকারের পক্ষে এটা জরুরী ছিল কেবল ভারতের সংখ্যালঘুদের আশ্বস্ত করবার জন্যই নয় কিন্তু মূলত পূর্ববাংলা

থেকে আর যাতে নতুন করে উদ্বাস্ত না ঢোকে তার জন্য এবং তার চেয়েও বড় কথা প্রব্রজনের (migration) স্রোতকে যাতে বিপরীতমুখী করা যায় তার জন্য। কিন্তু এর আসল ব্যর্থতা ছিল উদ্বাস্তুদের দেশে ফিরে যেতে উদ্‌বুদ্ধ করতে না পারা। কার্যত অতি অল্প সংখ্যক উদ্বাস্তই দেশে ফিরে গেলেও তাদের সম্পত্তি শত্রুদের সম্পত্তি বলে অধিগৃহীত হয়ে গিয়েছিল।

৪.৯.৫. বঙ্গবিভাজন ও উদ্বাস্তু আগমনের অভিঘাত

স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি ,রাজনীতি সমাজ ও সংস্কৃতিতে এক গভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল ।পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি এর ফলে দারুন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় । স্বাধীনতার পূর্বে যে পশ্চিমবঙ্গ ছিল শিল্প ক্ষেত্রে সর্বাগ্রগণ্য অঞ্চল স্বাধীনোত্তর কালে পশ্চিমবঙ্গ দ্রুত সেই স্থান হারাতে থাকে ।যে সময় ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলি তাদের শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়নে ব্যস্ত, পশ্চিমবঙ্গ তখন ব্যস্ত থাকে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন বিষয নিয়ে। এর ফলে শিল্প প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ অনেকটা পিছিয়ে পড়ে। কারণ রাজ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত হয় যার ।তীব্র সামাজিক ও রাজনৈতিক অসন্তোষের জন্ম দেয়।

৪.৯.৬ উপসংহার

আলোচনার শেষে একথা বলতেই হয় যে বঙ্গ বিভাজন ও উদ্বাস্তু আগমনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের সমাজ ,অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক জীবনে বহুমুখী পরিবর্তনও ঘটেছে ।হিন্দু সমাজের পূর্বতন জাতিভেদ প্রথা ও যৌথ পরিবার ব্যবস্থা সমানভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। আবার উদ্বাস্তুদের সঙ্গে সহাবস্থানের ফলে এপার বাংলার মানুষের ভাষা খাদ্যাভ্যাস, সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কৃতিতে ধীরে ধীরে অনেকখানি বদল এনে দিয়েছে।

৪.৮.১২ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১.C.K.Ogden --- Caste and Races of India

২.D.D. Kosambi--- An Introduction to the study of Indian History

৩.S.C.Dube---Indian Society

৪.যতীন বাগচী---জাতি ধর্ম ও সমাজ বিবর্তন

৫. নীহার রঞ্জন রায় ---বাঙ্গালির ইতিহাস আদিপর্ব

৬. এন সি চৌধুরী ---বাঙালি জীবনে রমণী

৭. অপর্ণা রায় -- পুরাতনী নারী ধর্ম সমাজ ও সাহিত্য

৮. কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়---নারীরা আজ যেখানে দাঁড়িয়ে

৯. H.H. Risley-- The Tribes and Castes of Bengal

১০. Prafulla Chakraborty ----The Màrginal Men
১১. Pradip Kumar Bose(ed)----Refugees in West Bengal
১২. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়----উদ্বাস্তু
১৩. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়----দেশভাগ ও দেশত্যাগ

৪.৮.১৩ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১. জাতি বা caste ব্যবস্থা বলতে কী বোঝ? জাতি ও বর্ণ কি সমার্থক শব্দ?
২. জাতি কাস্ট(caste)বলতে কী বোঝায়? স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলায় জাতি ব্যবস্থার স্বরূপ আলোচনা কর।
৩. স্বাধীনোত্তর বাংলায় নারীর অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা কর।

৪. উদ্বাস্তুর সংজ্ঞা দাও। উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিকা আলোচনা কর।
৫. উদ্বাস্তুর আগমন বাংলার সমাজ ,অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে কি প্রভাব ফেলেছিল?

শিক্ষার উন্নয়ন **[Development of Education]**
পর্যায়-৫

১. উদ্দেশ্য
২.শিক্ষার উন্নয়ন
৩.স্কুল শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা
৪.বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন
৫.জনসাধারণেরবিজ্ঞান উপলব্ধি
৬. সহায়ক গ্রন্থ
৭.নমুনা প্রশ্নাবলী

উদ্দেশ্যঃ
পর্যায়টির উদ্দেশ্য হল শিক্ষার উন্নয়নসম্পর্কে সাধারন ধারনা পোষণ করার সাথে শিক্ষারসাথে পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন ছিল তা ছাত্র ছাত্রী দের কাছে তুলে ধরা।
পর্যায়টির উদ্দেশ্য হল স্কুল শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষাসম্পর্কে সাধারন ধারনা পোষণ করার সাথে শিক্ষারসাথে পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন ছিল তা ছাত্র ছাত্রী দের কাছে তুলে ধরা।
পর্যায়টির উদ্দেশ্য হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নসম্পর্কে সাধারন ধারনা পোষণ করার সাথে শিক্ষারসাথে পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন ছিল তা ছাত্র ছাত্রী দের কাছে তুলে ধরা।জনসাধারণেরবিজ্ঞান উপলব্ধিসম্পর্কে সাধারন ধারনা পোষণ করার সাথে শিক্ষারসাথে পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন ছিল তা ছাত্র ছাত্রী দের কাছে তুলেধরতেপারবেন।

২.শিক্ষার উন্নয়ন

শিক্ষার ইতিহাস

‘শিক্ষা’হলশান্তিপূর্ণকালেরমানবসংযোজিতবিষয়েরমধ্যেগুরুত্বপূর্ণওগুরুত্বপূর্ণবিষয়।ব্যাক্তিসমাজেরউন্নয়নযেবিষয়েরউপরভিত্তিকরেতাআরঅন্যকিছুনাশুধুমাত্রশিক্ষা, এইশিক্ষাবিজ্ঞানেরগোড়ারকথাজানতেহলেআমাদেরইতিহাসসম্পর্কেঅবগতপ্রয়োজন।তাইএই “শিক্ষার উন্নয়ন”পর্যায়টির মাধ্যমেমূল্যবোধশিক্ষারঅগ্রগতিসম্পর্কেঅবগতহবে।

প্রাগৈতিহাসিক কালে শিক্ষা শুরু হয়েছিল বয়স্ক ব্যক্তিদের দ্বারা যুবকদের সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতার প্রশিক্ষণ দেয়ার মাধ্যমে। প্রাক-শিক্ষিত সমাজ মূলত মৌখিকভাবে এবং অনুকরণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গল্প-বলার মাধ্যমে জ্ঞান, মূল্যবোধ এবং দক্ষতা এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মের কাছে স্থানান্তরিত হয়েছে। সাংস্কৃতিক দক্ষতা প্রসারিত হতে পারে অনুকরণের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা উন্নত করার মধ্যমে।

ভারতেরশিক্ষার ইতিহাসে মোটামুটি তিনটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন যুগে ভারতের শিক্ষা, মধ্যযুগে ভারতের শিক্ষা এবং আধুনিক যুগে ভারতের শিক্ষা । ইতিহাস অখন্ডও অবিভাজ্য। শিক্ষার ইতিহাসও তাই। আধুনিক ভারতে যে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার উৎস তবু খুঁজতে হবে প্রাচীন ভারতেই।

ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসকে আমরা আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য সাধারনত তিনটি যুগে ভাগ করি। কেউ কেউ শিক্ষার ইতিহাসকে হিন্দু যুগ, মুসলমান যুগ এবং আধুনিক যুগ হিসাবে ভাগ করেন । এরূপে ভাগ করা ঠিক নয়। কারণ হিন্দুযুগে কেবলমাত্র হিন্দু শিক্ষাই প্রচলিত ছিল না, বৌদ্ধ ও ভারতের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে ও শিক্ষা প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ শিক্ষা ও এক সময়ে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাকে ম্লান করে দিয়েছিল । তেমনি মুসলমান যুগে কেবলমাত্র মুসলমানী শিক্ষাই প্রচলিত ছিল না, হিন্দু শিক্ষাও প্রচলিত শিক্ষা ছিল। ব্রিটিশ যুগেও তেমনি কেবলমাত্র ইংরেজী শিক্ষাই একমাত্র শিক্ষা ছিল না, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে দেশীয় শিক্ষা ও প্রচলিত ছিল । অতএব, হিন্দু শিক্ষা, মুসলমান শিক্ষা এবং ইংরেজী শিক্ষা এইভাবে ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসকে ভাগ না করাই বাঞ্চনীয়। এরূপ ভাগ করলে শিক্ষার ইতিহাসকে বিকৃতই করা হবে।

'শিক্ষা' হল আধুনিক কালের মানব জীবনে সংযোজিত বিষয় গুলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়। পরিকল্পিত শিক্ষার মাধ্যমে যে কোন দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষার উন্নয়ন সুনিপুণভাবে আনয়ন করা যায়। শিক্ষা একটি দেশের অর্থনীতিতে মানব সম্পদ ও মানব পুঁজী তৈরী ও যোগান দিয়ে থাকে। যা কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য সামাজিক খাতের উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। পরিকল্পিত শিক্ষার সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিবিড় যোগসূত্ররয়েছে। পরিকল্পিত শিক্ষা অর্থনীতির ন্যায় দেশ ও সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও ধনাত্বক পরিবর্তন আনে । শিক্ষার মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতিসহসমাজের অন্যান্য কিছুও উপকৃত হয়। পরিকল্পিত শিক্ষায় নারীরা উৎপাদন, উন্নয়ন ও গণতন্ত্রায়নে যথার্থ ভুমিকা পালন করতে পারে। এভাবে শিক্ষা সমাজের দুর্বল জনগোষ্ঠী এবং পশ্চাৎপদ স্থান ও অঞ্চলের উন্নয়নে অবদান রেখে জাতীয় উন্নয়নের বিচার্য বিষয় দ্রুততর করে। শিক্ষা পরিকল্পনা ও জাতীয় উন্নয়নের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং বিশেষ কয়েকটি বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কিত ইউনিটকে ৪টিপাঠে বিভক্ত করে নিম্নে উপস্থাপন করা হল:শিক্ষা পরিকল্পনা, জাতীয় উন্নয়ন ও শিক্ষার উন্নয়ন; পারস্পারিক সম্পর্ক , শিক্ষা পরিকল্পনা ও উন্নয়নের বিচার্য বিষয়,শিক্ষা পরিকল্পনা ও কর্মসংস্থান, শিক্ষার উন্নয়নে শিক্ষা পরিকল্পনার ভূমিকা, স্কুল শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা ।

শিক্ষার লক্ষ্য সামাজিক উন্নয়ন ও প্রগতি (Social development and progressis the aim of Education) :

প্রতিটি শিশুকে দেশের নাগরিক হিসেবে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের সঙ্গে দেশের প্রতি আত্মত্যাগে ব্রতী হতে হবে। শিক্ষাই এইগুলির বিকাশে সাহায্য করে। বর্তমানে শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য নাগরিকতার শিক্ষা। প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল-এর সময় থেকে আজ অবধি শিক্ষার উদ্দেশ্য আবর্তিত হচ্ছে সমাজকে ঘিরেই। কারণ মানুষ সামাজিক জীব, সমাজের মধ্যেই তার জন্ম, সমাজের মধ্যেই তার ব্যাপ্তি। সমাজ ব্যতিরেকে ব্যক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। সুতরাং, বিশ্বের সমস্ত দেশের শিক্ষাদর্শন তৈরির সময় শিক্ষাবিদগণ তাদের চিন্তার বাস্তবায়নে সমাজ ও সভ্যতার ফলাফলগুলিকে সমন্বিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে হার্বার্ট স্পেনসার-এর অভিমত, "শিক্ষা হল সম্পূর্ণ ভবিষ্যত জীবনের উপযোগী সমাজ
সামাজিক উন্নয়ন ও প্রগতির ক্ষেত্রে শিক্ষার যে অবদান তা নিচে বর্ণিত হল-
(১) সামাজিক সংস্কৃতিঃ- মূল্যবোধের চর্চা ও সভ্যতার জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত সামাজিক, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের যে ধারাবাহিক অনুশীলন ও চর্চা হয়ে আসছে, সেগুলি সামাজিক অগ্রগতি ও উন্নয়নে গভীর অবদান রেখেছে। সমাজ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই সংস্কৃতি ও মূল্যবাোধের

অভিজ্ঞতার চয়ন ও তার নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় যাদুঘরে, শিল্প সংগ্রহশালায়, গ্রন্থাগারে, প্রাচীন পুঁথিপত্রে। শিক্ষার কাজ হল শিক্ষার্থীকে এমনভাবে তৈরি করা যাতে তারা নিরপেক্ষভাবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের উপযুক্ত মূল্যায়ন করতে পারে।

(২) সামাজিক মূল্যবোধের সঞ্চালনঃ- শিক্ষার অন্যতম সামাজিক লক্ষ্য হল, সমাজের মানুষের দ্বারা আহরণ করা অসংখ্য অভিজ্ঞতাকে কালের স্রোতে হারিয়ে যেতে না দিয়ে সেগুলিকে এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মের হাতে অবিকৃতভাবে তুলে দেওয়া। যা সম্ভব শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে মিথস্ক্রিয়া বা পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে, পুঁথিপত্র, পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে, গণ মাধ্যমগুলির (টিভি, সিনেমা, সংবাদপত্র, বেতার) সাহায্যে এবং রাষ্ট্রীয় ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে।

(৩) সামাজিক স্থিতিশীলতাঃ- হব মনে করতেন, মানুষ যেদিন সংঘ জীবনের ওপর তার নিরাপত্তা ও অস্তিত্ব রক্ষার ভার অর্পণ করল সেদিন থেকেই মানুষ সমাজের কাছে আত্মসমর্পণ করল। লক্ তার সামাজিক চুক্তি মতবাদে বলেন—মানব ইতিহাসে প্রাক্-সামাজিক অবস্থার অস্তিত্ব ছিল। ব্যক্তি মানুষের একাকিত্ব ছিল অসহনীয়, অথচ পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য সামাজিক সংগঠনের প্রয়াোজন ছিল। হেগেল বলেন—সমাজ হচ্ছে একটি অতি ব্যক্তিক (Super Personal) সত্তা যা ব্যক্তি জীবনের সমষ্টি নিয়ে গঠিত। তাই বলা যেতে পারে, ব্যক্তি তথা সমাজের নিরাপত্তার প্রয়োজনে সামাজিক আচরণকে আয়ত্ত করাই হল ব্যক্তির অন্যতম লক্ষ্য।

(৪) গণতান্ত্রিক আদর্শের সংরক্ষণঃ- গণতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি হল সাম্যবাদ, শ্রেণি বৈষম্যহীন সমাজ সহযোগিতাবোধ ও ভ্রাতৃত্ববোধ। আধুনিক যুগে প্রতিটি দেশ বা রাষ্ট্রেরই কাম্য হল গণতান্ত্রিক সমাজ। শিক্ষা শিক্ষার্থীকে সমাজ কল্যাণ, গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুভব করতে এবং দলগত কাজে দায়িত্বশীল সদস্য। হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

(৫) জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করাঃ- সমাজের মধ্যে যে জাতিগত ও ধর্মগত প্রভেদ, অর্থনৈতিক বিভেদ আছে, তা দূর করার মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবোধ গড়ে তোলাসম্ভব। আধুনিক প্রতিটি রাষ্ট্রের মানুষের কাছে জাতীয়তাবোধ বিষয়টি অত্যন্ত কাম্য। জাতীয়তাবোধ ছাড়া একটি সমাজ বা রাষ্ট্র কখনই আত্মগরিমায় সমগ্র বিশ্বে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। আধুনিক শিক্ষার একটি প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত সমগ্র জাতির বৈশিষ্ট্যগুলিকে তুলে ধরে শিশুদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করা।

(৬) আন্তর্জাতিকতাবোধধঃ- আন্তর্জাতিকতাবোধ হল নিরপেক্ষভাবে অন্য ব্যক্তির আচরণ পর্যালোচনার ক্ষমতা এবং এই বাোধ জাগ্রত করতে হলে প্রত্যেক মানুষকে তার নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কারে প্রভাবমুক্ত হয়ে, সমস্ত সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে, অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের নৈর্ব্যক্তিকভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা—অভিমত ডঃ লিউইস (Lewis H. C.)। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"May the whole world be a family" অর্থাৎ, সমগ্র বিশ্ব একটি পরিবার হবে। শিক্ষার লক্ষ্য হল সমগ্র বিশ্বের মধ্যে প্রতিটি জাতিকে বিশিষ্ট জাতি হিসেবে রাষ্ট্রীয় গৌরব ও সার্বভৌমিকতার ভাব অর্জনে সহায়তা করা।

(৭) শিক্ষার নিয়ন্ত্রমূলক উদ্দেশ্যঃ- সামাজিক আইন বা বিধি, লোকাচার, লোকনীতি, ধর্মীয় অনুশাসন প্রভৃতির নিয়ন্ত্রন বৃহত্তম সমাজের স্বার্থে ব্যক্তির অবদমিত ইচ্ছাগুলিকে পরিমার্জিত করে এবং সামাজিক আচার-আচরণগুলিকে আয়ত্ত করার মাধ্যমেই মানুষ সামাজিক মানুষে পরিণত হয়। মানুষ যেহেতু সামাজিক জীব তাই প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা আবেগকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে।

৩.স্কুল শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা (একক-১০)

স্কুল ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ হল ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহ স্কুল শিক্ষা বিভাগ। এটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের প্রধান কর্তৃপক্ষ।বিভাগটি হল একটি নোডাল সংস্থা যা রাজ্যের জন্য স্কুল স্তরের শিক্ষার বিভিন্ন দিক দেখাশোনা করে যেমন পাঠ্য বই নির্বাচন, বোর্ড এবং কাউন্সিল গঠন (পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ), পরিদর্শন, শিক্ষক (সরকারি)/শিক্ষা কর্মীদের নিয়োগ, প্রকল্প বাস্তবায়ন, ভাষা নীতি ও স্কিম, শিক্ষাদান, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ইত্যাদির প্রস্তুতি। নিয়মিত বাজেট, অডিট প্রোগ্রাম, স্বীকৃতি, স্কুলের আপ-গ্রেডেশন এবং আইনি বিষয়ও রয়েছে।

শিক্ষা প্রক্রিয়ায় কোন ব্যক্তির অন্তর্নিহিত গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশের জন্য উৎসাহ দেয়া হয় এবং সমাজের একজন উৎপাদনশীল সদস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য যে সকল দক্ষতা প্রয়োজন সেগুলো অর্জনে সহায়তা করা হয়। সাধারণ অর্থে জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনই শিক্ষা। ব্যাপক অর্থে পদ্ধতিগতভাবে জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়াকেই শিক্ষা বলে। তবে শিক্ষা হল সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের অব্যাহত অনুশীলন। বাংলা শিক্ষা শব্দটি এসেছে 'শাস' ধাতু থেকে। যার অর্থ শাসন করা বা উপদেশ দান করা। অন্যদিকে শিক্ষার ইংরেজি প্রতিশব্দ এডুকেশন এসেছে ল্যাটিন শব্দ এডুকেয়ার বা এডুকাতুম থেকে। যার অর্থ বের করে আনা অর্থাৎ ভেতরের সম্ভাবনাকে বাইরে বের করে নিয়ে আসা বা বিকশিত করা।

সক্রেটিসের ভাষায় "শিক্ষা হল মিথ্যার অপনোদন ও সত্যের বিকাশ।" এরিস্টটল বলেন "সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরি করাই হল শিক্ষা"। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় "শিক্ষা হল তাই যা আমাদের কেবল তথ্য পরিবেশনই করে না বিশ্বসত্তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে।"

শিক্ষা শব্দের উৎপত্তি সংস্কৃত "শাস"ধাতু থেকে। সাধারণভাবে বলা যায় মানুষের আচরণের কাঙ্ক্ষিত, বাঞ্ছিত এবং ইতিবাচক পরিবর্তনই হলো শিক্ষা। যুগে যুগে নানা মনীষী নানাভাবে শিক্ষাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। আবার সময়ের সাথে সাথে শিক্ষার সংজ্ঞা বা ধারণাও পরিবর্তন এসেছে।

ইংরেজিতে ব্যাকরণগতভাবে, "এডুকেশন"শব্দটি লাতিন ēducātiō (যার অর্থ প্রজনন এবং লালন পালন করা), ēducō (যার অর্থ আমি শিক্ষাদান করি, আমি প্রশিক্ষণ দেই) যা হোমোনিম ēdūcōএর সাথে সম্পর্কিত (যার অর্থ আমি এগিয়ে নিয়ে যাই, আমি উত্থাপন করি) এবং Dōcō (যার অর্থ আমি নেতৃত্ব দেই, আমি পরিচালনা করি) থেকে উৎপত্তি হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা/উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত স্বশাসিত দ্বাদশ শ্রেণী (উচ্চমাধ্যমিক বা প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরীয়) পরীক্ষা নিয়ামক কর্তৃপক্ষ। পশ্চিমবঙ্গে দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষাকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা বলা হয়। পশ্চিমবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ভারতে যে সকল রাজ্যে এই সংস্থা অনুমোদিত বিদ্যালয় রয়েছে সেখানে এই সংস্থা বার্ষিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার আয়োজন করে থাকে। উল্লেখ্য, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ১৯৬০-এর দশক পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত হত। পরে এই পরীক্ষা আয়োজনের দায়িত্ব সংসদের হাতে অর্পিত হয়।পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের প্রধান কার্যালয় কলিকাতার নিকটস্থ বিধাননগরে অবস্থিত।এই আইন অনুযায়ী

•৬ বছর থেকে ১৪ বছর বয়সি সমস্ত শিশু প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যালয় শিক্ষা (বুনিয়াদী শিক্ষা) পাবার অধিকারী। কোনো শিশুর কাছ থেকে এমন অর্থ কেউ নিতে বা দাবী করতে পারবেন না, যা দিতে না পারায় তার বুনিয়াদী শিক্ষা বন্ধ হয়ে যাবে।
•শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী শিশুরাও অন্যান্য শিশুদের মত সমানভাবে বিনামূল্যে বুনিয়াদী শিক্ষা পাবে।
•বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য ক্যাপিটেশন ফি (বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য অনুদান) নেওয়া যাবে না। এটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
•বুনিয়াদী শিক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন শিশুকে কোন শ্রেণিতে এক বছরের বেশি রাখা যাবে না এবং কোন কারণেই বিদ্যালয় থেকে বের করে দেওয়া যাবে না।
•কোন বিদ্যালয়ে কোন শিশুকেই শারীরিক শাস্তি দেওয়া যাবে না বা তার ওপর মানসিক অত্যাচার করা যাবে না।
•কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, নবোদয় বিদ্যালয় এবং সৈনিক বিদ্যালয় ছাড়া সরকার দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত সমস্ত বিদ্যালয়ে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী সমস্ত শিশুরা বিনামূল্যে বুনিয়াদী শিক্ষা পাবে।
•সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলি তাদের প্রাপ্ত সরকারী সাহায্যের পরিমাণের অনুপাতে তাদের মোট ছাত্রসংখ্যার একটি নির্দিষ্ট অংশকে বিনামূল্যে বুনিয়াদী শিক্ষা দিতে বাধ্য থাকবে। কিন্তু প্রাপ্ত সাহায্যের পরিমাণ যাই হোক না কেন, ঐ সমস্ত বিদ্যালয় তাদের মোট ছাত্রসংখ্যার কম করে ২৫ শতাংশকে বিনামূল্যে বুনিয়াদী শিক্ষা দেবে।
•বেসরকারী বিদ্যালয়, যারা কোনরকম সরকারী সাহায্য পায় না, প্রতি বছর প্রতি শ্রেণিতে মোট যে পরিমাণ ছাত্রছাত্রী ভর্তি করবে, কমপক্ষে তার ২৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রীকে সমাজের দুর্বলতর বা পিছিয়ে পড়া শ্রেণি থেকে নেবে এবং ঐ ছাত্রছাত্রীদের অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষা দেবে। ঐ ২৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রীর সবাই আসবে ঐ বিদ্যালয়ের প্রতিবেশি এলাকা থেকে। একটি সরকারী বিদ্যালয়ে প্রতিটি ছাত্র বা ছাত্রীর জন্য যে পরিমাণ অর্থ খরচ হয়, সরকার সেই পরিমাণ অর্থ দুর্বলতর এবং পিছিয়ে পড়া শ্রেণি থেকে আসা প্রতিটি ছাত্রছাত্রী, যারা ঐ বেসরকারী বিদ্যালয়ে বুনিয়াদী শিক্ষা পাচ্ছে, তাদের জন্য বেসরকারী বিদ্যালয়কে প্রতি বছর দেবে।
•এই আইন চালু হবার তিন বছরের মধ্যে রাজ্য/স্থানীয় সরকার প্রতিটি জনবসতির এক কিমির মধ্যে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং তিন কিমির মধ্যে একটি করে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করবে (যদি তা না থাকে)।
•এই আইন চালু হবার ছয় মাসের মধ্যে রাজ্য/স্থানীয় সরকার সমস্ত বিদ্যালয়ে ছাত্র শিক্ষক অনুপাত ৩০:১ করবে। অর্থাৎ সমস্ত বিদ্যালয়ে ৩০ জন ছাত্রছাত্রী পিছু একজন করে শিক্ষক বা শিক্ষিকা থাকবেন।
•রাজ্য সরকার প্রতিটি এলাকায় নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করবে, প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো, শিক্ষক শিক্ষিকা এবং পড়াশুনোর জিনিসের ব্যবস্থা করবে। শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকার।
•এই আইন প্রয়োগের জন্য অর্থের ব্যবস্থা করা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের যৌথ দায়িত্ব। কেন্দ্রীয় সরকার নির্দিষ্ট সময় অন্তর রাজ্য সরকারের সাথে আলোচনা করে স্থির করবে যে মোট প্রয়োজনীয় অর্থের ঠিক কত অংশ কেন্দ্রীয় সরকার দেবে আর কত অংশ রাজ্য সরকার দেবে।
•বেসরকারী বিদ্যালয় ছাড়া প্রতিটি বিদ্যালয়কে বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি তৈরি করতে হবে। ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, এলাকার কাউন্সিলর বা পঞ্চায়েত সদস্য, এবং ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের

অভিভাবক এই কমিটির সদস্য হবেন। পরিচালন সমিতির সদস্যদের অন্তত অর্ধেককে মহিলা হতে হবে। অন্তত ৭৫ শতাংশ সদস্য হবেন ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকেরা।
প্রতিটি বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি ঐ বিদ্যালয়ের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করবে। এই উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তিতেই রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় সরকার ঐ বিদ্যালয়ের উন্নয়নের অর্থ বরাদ্দ করবে।
•প্রত্যেক শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়মমত এবং সময়মত বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে হবে, সময়মত নির্দিষ্ট পাঠক্রম পড়ানো শেষ করতে হবে, ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি, শিক্ষায় উন্নতি এবং অন্যান্য বিষয়ে তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা করতে হবে, শিক্ষাদান ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে শিক্ষককে নিয়োগ করা যাবে না।(কেবলমাত্র সরকারি জনগণনা, নির্বাচনের কাজ এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ত্রাণকার্যে শিক্ষকদের নিয়োগ করা যাবে)। কোন শিক্ষক শিক্ষিকা প্রাইভেট টিউশন করতে পারবেন না।
•বাধ্যতামূলক বুনিয়াদী শিক্ষা শিশুর মৌলিক অধিকার। তাই এর প্রয়োগ না হলে বা অপপ্রয়োগ হলে হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে সরাসরি জনস্বার্থ মামলা করা যাবে।
এই আইনের বহিরঙ্গে শিক্ষায় সরকারের দায়বদ্ধতার কথা থাকলেও বেশ কিছু মৌলিক প্রশ্নে এই আইনটি শিক্ষাবিদ ও শিক্ষকদের অনেকের কাছে ভয়াবহ মনে হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমেই আসে শিক্ষার গুণমানের প্রসঙ্গটি। এই আইনটি সর্বশিক্ষা অভিযানের ধারাবাহিকতাতেই সৃষ্ট আর ঘোষিতভাবেই এর লক্ষ্য কেবলমাত্র বুনিয়াদী শিক্ষা। এর মাধ্যমে মূলত সাক্ষরতা কর্মসূচীর দিকেই নজর দিতে চেয়েছে সরকার আর সেই বুনিয়াদী সাক্ষরতা শিক্ষাতেই মূলত নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখছে সে। সাক্ষরতা কর্মসূচীর বাইরে প্রচলিত সাধারণ বা বৃত্তিমুখী শিক্ষা থেকে সরকারী দায় সরিয়ে নিয়ে সে দায় পরোক্ষে বেসরকারী হাতে তুলে দেবার আয়োজনই এখানে নানা আলঙ্কারিক কথার আড়ালে তৈরি করা হয়েছে। এই আইনে পাশ ফেল প্রথা তুলে দেবার যে কথা রয়েছে, পছন্দের স্কুলে লটারির মাধ্যমে ভর্তির যে ভাগ্যভিত্তিক পদ্ধতির কথা উঠছে, তাতে সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার মান নিয়ে ইতোমধ্যেই বিরক্ত অভিভাবকেরা বাধ্য হবেন আরো বেশি করে বেসরকারী বিদ্যালয়মুখী হতে। এই আইন সাক্ষরতা কর্মসূচীর ওপরের স্তরের সাধারণ শিক্ষাকে বেসরকারী ও পণ্যমুখী করে তুলবে, পুঁজিকে শিক্ষার মৃগয়াক্ষেত্রে আরও অবাধ বিচরণের জায়গা করে দেবে। সরকার বেসরকারী বিদ্যালয়গুলিকে নজিরবিহীনভাবে এবার ২৫ শতাংশ পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীর জন্য ভরতুকি দানের যে নীতি নিয়েছেন, তা ইঙ্গিত দেয় আগামী দিনে সাধারণ শিক্ষার অঙ্গন থেকে সরে আসার রাস্তাই সে তৈরি করছে। রেশনিং ব্যবস্থাকে কার্যত বি পি এল স্তরে সীমাবদ্ধ রেখে নিত্য প্রয়োজনীয় সব কিছুকে খোলাবাজারে নিয়ে আসা ও সে সূত্রে সেসব জিনিসের অগ্নিমূল্যের যে অভিজ্ঞতার সাক্ষী মানুষ, আগামী দিনে শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাই হতে চলেছে। সাক্ষরতার, সর্বশিক্ষার যে দায়িত্ব সরকারের বহু আগেই পালন করার কথা ছিল (এই সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের রায়টি ১৯৯৩ সালের), তার বহু বিলম্বিত আয়োজনের আছিলায় সরকার তার দায়কে শিক্ষার মূল অঙ্গন থেকেই সরিয়ে নিতে চাইছে। সাক্ষরতা/সর্বশিক্ষা নিয়ে ব্যাপক প্রচার এর আড়ালে সাধারণ শিক্ষার অঙ্গন থেকে তার দায়মুক্তির চেষ্টার দিকটি ক্রমশই সামনে আসছে।
শিক্ষা প্রক্রিয়ায় কোন ব্যক্তির অন্তর্নিহিত গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশের জন্য উৎসাহ দেয়া হয় এবং সমাজের একজন উৎপাদনশীল সদস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য যে সকল দক্ষতা প্রয়োজন সেগুলো অর্জনে সহায়তা করা হয়। সাধারণ অর্থে জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনই শিক্ষা। ব্যাপক অর্থে পদ্ধতিগতভাবে জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়াকেই শিক্ষা বলে। তবে শিক্ষা হল সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের অব্যাহত অনুশীলন। বাংলা শিক্ষা শব্দটি এসেছে 'শাস' ধাতু থেকে। যার অর্থ শাসন করা

বা উপদেশ দান করা। অন্যদিকে শিক্ষার ইংরেজি প্রতিশব্দ এডুকেশন এসেছে ল্যাটিন শব্দ এডুকেয়ার বা এডুকাতুম থেকে। যার অর্থ বের করে আনা অর্থাৎ ভেতরের সম্ভাবনাকে বাইরে বের করে নিয়ে আসা বা বিকশিত করা।
সক্রেটিসের ভাষায় "শিক্ষা হল মিথ্যার অপনোদন ও সত্যের বিকাশ।" এরিস্টটল বলেন "সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরি করাই হল শিক্ষা"। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় "শিক্ষা হল তাই যা আমাদের কেবল তথ্য পরিবেশনই করে না বিশ্বসত্তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে।"
শিক্ষা শব্দের উৎপত্তি সংস্কৃত "শাস"ধাতু থেকে। সাধারণভাবে বলা যায় মানুষের আচরণের কাঙ্ক্ষিত, বাঞ্ছিত এবং ইতিবাচক পরিবর্তনই হলো শিক্ষা। যুগে যুগে নানা মনীষী নানাভাবে শিক্ষাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। আবার সময়ের সাথে সাথে শিক্ষার সংজ্ঞা বা ধারণাও পরিবর্তন এসেছে।
ইংরেজিতে ব্যাকরণগতভাবে, "এডুকেশন"শব্দটি লাতিন ēducātiō (যার অর্থ প্রজনন এবং লালন পালন করা), ēducō (যার অর্থ আমি শিক্ষাদান করি, আমি প্রশিক্ষণ দেই) যা হোমোনিম ēdūcōএর সাথে সম্পর্কিত (যার অর্থ আমি এগিয়ে নিয়ে যাই, আমি উত্থাপন করি) এবং Dōcō (যার অর্থ আমি নেতৃত্ব দেই, আমি পরিচালনা করি) থেকে উৎপত্তি হয়েছে।

শিক্ষার ধরন

শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। মানুষ জন্মের পর থেকে মৃত্যুর আগে মূহুর্ত পর্যন্ত শেখে। তাই শিক্ষার লাভের ধরন বিভিন্ন।**যেমন:**

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এমন একটি কাঠামোগত পরিবেশে ঘটে থাকে যার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান। সাধারণত, একটি স্কুলের পরিবেশে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সঞ্চালিত হয় যেখানে শ্রেণীকক্ষে একাধিক শিক্ষার্থীদের জন্য একজন প্রশিক্ষিত এবং প্রত্যয়িত শিক্ষকের প্রয়োজন পড়ে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য।বেশিরভাগ স্কুলে একটি মানসম্মত আদর্শ ডিজাইন করা হয় যার মাধ্যমে সিস্টেমে সমস্ত শিক্ষাগত পছন্দগুলি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই ধরনের পছন্দগুলি পাঠ্যক্রম, সাংগঠনিক মডেল, শারীরিক শিক্ষার স্থানগুলির (যেমন শ্রেণীকক্ষ) নকশা, ছাত্র-শিক্ষক ইন্টারঅ্যাকশন, মূল্যায়ন পদ্ধতি, শ্রেণীর আকার, শিক্ষাগত কর্মকাণ্ড, এবং আরও অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত করে।

প্রাকস্কুল

প্রাকস্কুলগুলি প্রায় তিন থেকে সাত বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষা প্রদান করে যা দেশের উপর নির্ভর করে যখন শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। এইগুলি নার্সারি স্কুল এবং কিন্ডারগার্টেন হিসাবেও পরিচিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, যেখানে কিন্ডারগার্টেন শব্দটি প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত শব্দ। কিন্ডারগার্টেন তিন থেকে সাত বছরের জন্য একটি শিশু-কেন্দ্রিক প্রাক পাঠ্যক্রম প্রদান করে। এখানে মূলত শিশুদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং নৈতিক প্রকৃতির উদ্ঘাটন করার জন্য চেষ্টা করা হয়।

প্রাথমিক

প্রাথমিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিক ও কাঠামোগত যা প্রথম পাঁচ থেকে সাত বছর নিয়ে গঠিত। সাধারণত, প্রাথমিক শিক্ষা পাঁচ থেকে ছয় বছর এবং ছয় থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত পড়াশোনা করানো হয়ে থাকে, যদিও এর মধ্যে, মাঝে মাঝে দেশ ভেদে ভিন্নতা রয়েছে। বিশ্বব্যাপী, ছয় থেকে বারো বছর বয়সী প্রায় ৮৯% শিশু প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি হয় এবং এই অনুপাত বেড়েই চলেছে।

ইউনেস্কো দ্বারা চালিত ২০১৫ সালের মধ্যে "সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা"বেশিরভাগ দেশ এই প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে এবং অনেক দেশে এটি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে । প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে বিভাজন কিছুটা আলাদা, তবে এটি সাধারণত প্রায় এগারো বা বারো বছর বয়সের মধ্যে ঘটে। কিছু শিক্ষা ব্যবস্থায় পৃথক মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে, যেখানে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার চূড়ান্ত পর্যায়ে স্থানান্তর করা হয় । প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের স্কুলগুলি প্রাথমিকভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসাবে পরিচিত। প্রাথমিক বিদ্যালয়কে আবার শিশু এবং জুনিয়র স্কুলের মধ্যে বিভক্ত করা হয়।

ভারতে, উদাহরণস্বরূপ, বারো বছর ধরে বাধ্যতামূলক শিক্ষা, আট বছরে প্রাথমিক (elimentary) শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পাঁচ বছর এবং উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য তিন বছর করা হয়েছে। ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং দ্বারা পরিকল্পিত একটি জাতীয় পাঠ্যক্রমের কাঠামোর উপর ভিত্তি করে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ১২ বছরের বাধ্যতামূলক স্কুল শিক্ষা প্রদান করা হয়।

মাধ্যমিক

বিশ্বের বেশিরভাগ সমসাময়িক শিক্ষা ব্যবস্থায়, মাধ্যমিক শিক্ষায় বয়ঃসন্ধির সময় আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রসার ঘটে। এটি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সাধারণত "মাধ্যমিক উত্তর"বা "উচ্চতর"শিক্ষা (যেমন, বিশ্ববিদ্যালয়, বৃত্তিমূলক স্কুল) থেকে অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সাধারণত প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। এই সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে এই সময়ের জন্য বিদ্যালয়গুলি, বা এর একটি অংশকে সেকেন্ডারি বা উচ্চ বিদ্যালয়, জিমন্যাশিয়াম, লিসিম, মধ্যম স্কুল, কলেজ বা বৃত্তিমূলক স্কুল বলা যেতে পারে। এই পদগুলির কোনও সঠিক অর্থ এক সিস্টেম থেকে অন্যটিতে পরিবর্তিত হতে পারে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে সঠিক সীমাও দেশ ভেদে আলাদা হতে পারে। তবে সাধারণত সপ্তম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলে যাওয়া হয়। মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধানত কিশোর বয়সের মধ্যেই ঘটে।

উচ্চতর

উচ্চশিক্ষা হল তৃতীয় পর্যায়, বা পোষ্টসেকন্ডারি শিক্ষা, এটি একটি অ-বাধ্যতামূলক শিক্ষাগত স্তর যা উচ্চ বিদ্যালয় বা মাধ্যমিক বিদ্যালয় যেমন স্কুল সমাপ্তি অনুসরণ করে। তৃতীয়তঃ স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষা সহ বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ কে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানত উচ্চ শিক্ষা প্রদান করে।

বৃত্তিমূলক

বৃত্তিমূলক শিক্ষা হচ্ছে সরাসরি এবং বাস্তব প্রশিক্ষণের উপর নিবদ্ধ শিক্ষার একটি ফর্ম। পেশাগত শিক্ষা একটি শিক্ষানবিশ বা ইন্টার্নশিপের পাশাপাশি চলতে পারে এমন একটি কাঠামো যেমন, কৃষি, প্রকৌশল, ঔষধ, স্থাপত্য এবং কলা এর অন্তর্ভুক্ত।

আদিবাসী

আদিবাসী শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আদিবাসী জ্ঞান, মডেল, পদ্ধতি, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে । উপনিবেশ উত্তর প্রেক্ষাপটে, উপনিবেশবাদ প্রক্রিয়ায় আদিবাসী শিক্ষা পদ্ধতির বর্ধিত স্বীকৃতি এবং ব্যবহারের মাধ্যমে আদিবাসী জ্ঞান জ্ঞান চর্চা বেড়ে যেতে পারে। অধিকন্তু, এটি আদিবাসী সম্প্রদায়গুলিকে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির পুনর্নির্মাণ এবং পুনর্বিন্যস্ত করতে পারে এবং আদিবাসী ছাত্রদের শিক্ষাগত সাফল্যের উন্নতি সাধন করতে পারে।

স্ব-নির্দেশিত শিক্ষা

যেখানে "নিজে নিজে শেখা"বা "নিজের দ্বারা"বা স্ব-শিক্ষক হিসাবে ভূমিকা পালন করতে হয় । কিছু অটোডাইডেক্টস(স্ব-শিক্ষায় শিক্ষিত) প্রচুর সময় ব্যয় করে লাইব্রেরী ও শিক্ষাগত

ওয়েবসাইটগুলির সম্পদগুলি পর্যালোচনা করার মাধ্যমে । একজন লোক তার জীবনের প্রায় যেকোনো সময় অটোডাইডেক্ট হতে পারে। যদিও কেউ কেউ একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এবং একটি প্রচলিত পদ্ধতিতে তারা নিজেদেরকে আনরিলেটেড বিষয় অবহিত করতে পারে । উল্লেখযোগ্য অটোডাইডেক্টসের(স্ব-শিক্ষায় শিক্ষিত) মধ্যে আব্রাহাম লিঙ্কন (ইউএস প্রেসিডেন্ট), শ্রীনিবাস রামানুজন (গণিতবিদ), মাইকেল ফ্যারাডে (রসায়নবিদ ও পদার্থবিজ্ঞানী), চার্লস ডারউইন (প্রফেসর), টমাস আলভা এডিসন (আবিষ্কারক), তাদো আন্ডো (স্থপতি), জর্জ বার্নার্ড শ (নাট্যকার), ফ্রাঙ্ক জাপ্পা (সুরকার, রেকর্ডিং প্রকৌশলী, চলচ্চিত্র পরিচালক) এবং লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি(প্রকৌশলী, গণিতবিদ) অন্যতম ।

উন্মুক্ত শিক্ষা ও ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি

২০১২ সালে ইলেকট্রনিক শিক্ষাগত প্রযুক্তি (ই-লার্নিং নামেও পরিচিত) এর আধুনিক ব্যবহারটি প্রথাগত শিক্ষার হার থেকে ১৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে । ওপেন এডুকেশন ক্রমবর্ধমান শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে পরিণত হয়েছে । ঐতিহ্যগত শিক্ষা পদ্ধতির তুলনায় তার দক্ষতা এবং ফলাফলই তার মূল কারণ । শিক্ষার খরচ সমগ্র ইতিহাস জুড়ে একটি সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে, এবং এটি এখন বেশিরভাগ দেশের একটি প্রধান রাজনৈতিক বিষয় । অনলাইন কোর্স প্রায়ই মুখোমুখি ক্লাসের চেয়ে বেশি ব্যয়বহুল হতে পারে। ২০০৯সালে মোট ১৮২ টিরও বেশি কলেজের উপর জরিপ করে দেখা যায় যে প্রায় অর্ধেক সংখ্যক লোকই বলেছে যে অনলাইন ভিত্তিক শিক্ষার খরচ ক্যাম্পাস ভিত্তিক শিক্ষার চেয়ে উচ্চতর ছিল । অনেক বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠানগুলি বর্তমানে হার্ভার্ড, এমআইটি এবং বার্কলে যেমন ফ্রি বা প্রায় বিনামূল্যে বিনামূল্যে কোর্স অফার করছে।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯৪৮-৪৯) (Indian University Commission, 1948-49):

স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষা-কমিশন হল রাধাকৃষ্ণন কমিশন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃয়নের সভাপতিত্বে এই কমিশন ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত হয়। ড. তারাচাঁদ, ড. জাকির হোসেন, ড. এ লক্ষ্মণ স্বামী মুদালিয়র, ড. মেঘনাদ সাহা, ড. করমনারায়ণ, ড. নির্মল কুমার সিদ্ধান্ত এই কমিশনের সদস্য ছিলেন। এছাড়া এই কমিশনের তিনজন বিদেশি শিক্ষাবিদ সদস্য হল— ড. আর্থার ই মরগ্যান, ড. জেমস এফ ডাফ এবং ড. টি গার্ট। কমিশনের সভাপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃয়নের নামানুসারে এই কমিশন রাধাকৃষ্ণন কমিশন নামে পরিচিত।

এই কমিশনের মূল লক্ষ্য হল ভারতীয় উচ্চতর শিক্ষার সার্বিক উন্নতিসাধন। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উদ্দেশ্য, পাঠক্রম, শিক্ষার মাধ্যম, শিক্ষক, শিক্ষার মান, ধর্মশিক্ষা, নারীশিক্ষা, মূল্যায়ন, ছাত্র কল্যাণ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রভৃতি বিষয়ে যেসব প্রয়োজনীয় সুপারিশ করেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল—

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩) (মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন):

ভূমিকা:স্বাধীন ভারতে বুনিয়াদি শিক্ষার প্রসারের জন্য অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। কারিগরি শিক্ষার প্রসারে গতি গৃহীত হয়েছিল। শিক্ষার জন্য রাধাকৃষন পরিষদ করা হয়েছিল এবং আলোচনার কার্যকরী করার জন্য বিভিন্ন উচ্চতর গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের জন্য তখন কোনো পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি। নিজস্ব জাতীয় শিক্ষার গোটা লিখতে মিডিয়াক স্তরের মান নীতি। মিডিয়াক শিক্ষা হল প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষা যোগসূত্র। আরও ভাগের ভাগ এই স্তরের শিক্ষা শেষ করে জীবিকা অর্জন করা হয়। বৃত্তিমূলক শিক্ষা লাভের চেষ্টা করে। আবার এই শিক্ষা শেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাবৃত্তিতে নিযুক্ত হয়। মাধ্যমিক স্তরকে উচ্চশিক্ষাকে গ্রহণ করা কোনো প্রকার সম্ভব নয়। কারণ আক্ষরিক শিক্ষা হল উচ্চ শিক্ষার

ভিত্তি। তাই মিডিয়াক শিক্ষা যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তবে জাতীয় অবক্ষয় দেখাতে। মিডিয়া শিক্ষার সংস্কার একান্ত প্রয়োজন।এ যাত্রা রাধাকূল আপনার সিদ্ধান্তের কথা।প্রশাসনের ভাষায়, "আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা আমাদের শিক্ষাগত যন্ত্রের সবচেয়ে দুর্বল লিঙ্ক এবং জরুরী সংস্কার প্রয়োজন।"অন্য দেশের সমগ্র শিক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যবস্থায় যোগসূত্র। অবিলম্বে এর সংস্কার প্রয়োজন। তাই জাতীয় শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার একটি মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) (ভারতীয় শিক্ষা কমিশন 1964-66):

ভূমিকা: আমার শিক্ষামন্ত্রী এম সি চাগলারে ড. ডি. এস. কোঠারি শিক্ষাবিদ ও দেশের শিক্ষাবিদদের নিয়ে ভারতবর্ষের শিক্ষা নিয়ে একটি সঠিক অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে জুলাই একটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। স্বাধীনতা শিক্ষার ইতিহাসে এটি ছিল তৃতীয় শিক্ষা। এটি একটি শিক্ষা কমিশন বাঠারি কমিশন পরিচিত। ড. ডি. এস. কোঠারি ছিলেন। কমিটি ২১ ধরে পরিশ্রম করে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুন "শিক্ষা ও জাতীয় মাস বিকাশ"(শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন) শিনামে তৎকালীন আমার শিক্ষারোমনের কাছে একটি রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্টে প্রাক্-প্রাথমিক কোট থেকে পথ প্রশাসক এবং এক ধরনের শিক্ষার কথা ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব সকলের কাছে এবং লক্ষ্যের কথা বলার স্থান। চারটি বৃহৎ অংশে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে শিক্ষা সমস্যাগুলি আলোচিত হয়েছে এবং সমাধানের পথ দেখানো হয়েছে। কেবলমাত্র অংশে কতকগুলি 'ওয়ার্কিং পেপার' হয়েছে।এই কমিশন হল এই যে এখানে শিক্ষার নিম্নস্তর থেকে বিশেষ ও সর্ব শিক্ষার বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করা হয়েছিল।

জাতীয় শিক্ষানীতি-১৯৯২ (প্রোগ্রাম অ্যাকশন ১৯৯২): -

১৯৮৬ খ্রিস্টব্দের জাতীয় শিক্ষানীতি মূল্যায়নের জন্য কমিটি গঠিত হয়েছিল— রামমূর্তি কমিটি (১৯৯০ খ্রি:) এবং জনারন রেডডি কমিটি (১৯৯১)। এই সংবিধান আলোচনা ও উত্তরের কবিতা ১৯৮৬ জাতীয় ঐক্যের কিছু সাধন করে পেশ করা হয়। এটি ১৯৯২ খ্রিস্টব্দে জাতীয় শিক্ষানীতি (জাতীয় নীতি একটি শিক্ষা সংশোধিত নীতি প্রণয়ন, 1992) চরিত্র অভিহিত।

১৯৯৯ সালে নাগরিক সরকার অন্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। এটির নাম জনার্দন কমিটি। শ্রী এন.জনার্দন রেড্ডি তৎৎকালন্ধপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। জনার্দন সমন্বয় সামগ্রীকভাবে মূর্তির চিত্র সংশোধিত খসড়া করেন। কেবলমাত্র জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তব রূপায়নের জন্য জনার্দন জোট কতগুলি নূতন শক্তি যোগ অন্তর্ভুক্ত।

১৯৮৬ খ্রিস্টব্দের জাতীয় শিক্ষানীতির বাইরে খসড়াটি ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় শিক্ষা রূপায়নের জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ তাকে প্লাস্ট-ব-অ্যাকসান (কর্মসূচী সংক্ষেপে POA-192) বলা হয়।

একক-১১

৪.বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (Science and Technology) একটি সমৃদ্ধ সংস্কৃতির লালনভূমি হিসেবে ভারতবর্ষঅতি প্রাচীনকাল থেকেই সুপরিচিত। প্রাচীন কাল থেকেইংরেজ শাসন এবংস্বাধীনতা লাভের সময় পর্যন্তভারতবর্ষভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয় জন্ম দিয়েছে বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্যের অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব। এই বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের নবজাগরণ, পুনর্জাগরণ ও সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংগঠন স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষের অর্থনীতি ও অন্যান্য অবকাঠামো ছিল বিপর্যস্ত। সার্বিকভাবে ভারতবর্ষের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কর্মকান্ড পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়- প্রথমত, সরাসরি সরকারি অনুদানে পরিচালিত হয় এমন প্রতিষ্ঠান, যেগুলি মূলত গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্যই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে; দ্বিতীয়ত, প্রকৌশল ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগগুলি পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহ। জাতীয় গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ সরাসরি জাতীয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়ে গবেষণাগার ও মাঠ পর্যায়ের উভয় ধরনের বৈজ্ঞানিক গবেষণা কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পেশার দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক গবেষণা কর্মকান্ডও পরিচালনা করে থাকে।

দেশের প্রাতিষ্ঠানিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা কর্মকান্ডের ধারাবাহিকতা শুরু হয় ১৯৪২ সালে ভারতে ব্রিটিশ কর্তৃক 'কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, যা ১৮৯০ সালের সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট-২১-এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আইনটি ছিল একটি মাইল ফলক যা আজও ভারতবর্ষের বিজ্ঞান সমাজ এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে ব্যয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে ভারতবর্ষের ব্যয় খুবই সামান্য । জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি একটি সুস্পষ্ট ব্যাপক দলিল যাতে স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল স্তরে বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষার মান উন্নয়নের বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটিকে কার্যকরী করার জন্য স্কুল পর্যায়ের পাঠ্যক্রম থেকেই বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে পরিচিতি ঘটানোর সুপারিশ করা হয়েছে এবং এ লক্ষ্যে মানসম্পন্ন শিক্ষক, ভৌত সুযোগ-সুবিধা, যন্ত্রপাতি, বইপুস্তক, জার্নাল, শিক্ষা উপকরণ প্রভৃতি নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে বিজ্ঞান শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য একাধিক উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশও করা হয়েছে।

ভারতবর্ষের আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে প্রবেশের পর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিকল্পনায় বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। কিন্তু দেশের মুক্তবাজার অর্থনীতিতে উত্তরণের সঙ্গে অভিযোজন মোটেই স্বাভাবিক হয়নি এবং বর্তমানেও এই অভিযোজন প্রক্রিয়ার পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্তি বহু দূর বলে বিবেচিত। পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিতে সম্ভাব্য পরিমার্জনের লক্ষ্যে এই নীতির কিছু কিছু বিষয় বর্তমানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে।

ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ তম বছর শুরুতে, ডঃ জিতেন্দ্র সিং, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ও পৃথিবী বিজ্ঞান মন্ত্রকের জন্য রাজ্য মন্ত্রী (স্বাধীন চার্জ), বলেছেন, "আমরা বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটি ফ্রন্টলাইন দেশ, এবং এর জন্য অনেক ক্রেডিট আমাদের বৈজ্ঞানিক ভ্রাতৃত্বের কঠোর পরিশ্রম এবং সমর্পণকে দেয়. তারা গত *৭৫*বছরে ভারতের দ্রুত উন্নতিতে অসাধারণভাবে অবদান রেখেছে." এক বছর পরে, যেহেতু ভারত ৭৫বছরের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ করার উদযাপন করেছিল এবং নতুন অনুপ্রেরণার সাথে ভবিষ্যতের দিকে নজর দিয়েছিল, দেশের সাফল্যে এই গর্ব, দেশের মানুষের এই বিশ্বাস, সত্যি অব্যাহত রেখেছিল. প্রকৃতপক্ষে, ১৯৪৭সালে, স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের পরে, ভারত নিজেকে সামাজিক-অর্থনৈতিকভাবে ভেঙে গেছে এবং দ্রুত পুনর্গঠনের প্রয়োজন হয়েছে. সরকার এবং জনগণ বিভিন্ন ক্ষেত্র জুড়ে একত্রিত হয়েছিল, এবং নীতি ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে, পদক্ষেপ অনুযায়ী, ভারত শক্তিশালী হয়ে গেছে, অনেক মাইলস্টোন অর্জন করছে এবং বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি পেয়েছে।

দ্য ফাউন্ডেশনস

এই গল্পটি বিস্তৃতভাবে শুরু হয় এর ফর্মুলেশন দিয়ে ১৯৫১সালের প্রথম ৫-বছরের প্ল্যান, যা কৃষি, বিজ্ঞান, অবকাঠামো এবং শিক্ষার উপর ফোকাস করেছে এবং গুরুত্বপূর্ণভাবে, মৌলিক গবেষণার ভিত্তি স্থাপনের উপর ফোকাস করেছে. প্রথম কয়েক দশকের মধ্যে, সারা দেশে ভারত নির্মিত এবং উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ল্যাবরেটরি এবং গবেষণা কেন্দ্র. এই প্রচেষ্টাগুলি বৃদ্ধি করা এবং দেশের গবেষণার দিক প্রদান করা, বিভিন্ন সরকারী সংস্থাও স্থাপন করা হয়েছিল, যেমন ১৯৪২সালে কাউন্সিল ফর সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (সিএসআইআর), ১৯৫৪সালে অ্যাটমিক এনার্জি ডিপার্টমেন্ট (ডিএই), ১৯৫৮সালে ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও), ১৯৭১সালে ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগ, ১৯৭২সালে স্পেস বিভাগ এবং ১৯৮০সালে পরিবেশ বিভাগ. এছাড়াও, ১৯৭৬সালে, অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল: ভারত এটির সংবিধানে একটি "বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্র"গ্রহণ করেছে, প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের কর্তব্য হিসাবে একটি বৈজ্ঞানিক মনোযোগ, মানবতা এবং অনুসন্ধানের উত্সাহ ঘোষণা করা।

কৃষি

১৯৭৬এর মধ্যে, ভারত ইতিমধ্যে দুটি প্রধান মাইলস্টোন অর্জন করেছে আত্মনির্ভরশীলতায়, সবুজ বিপ্লব এবং সাদা বিপ্লব. ১৯৬০এর মধ্যে, ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউটে হাই-ইল্ডিং হুইট ভেরাইটির উপর রিসার্চ, যা দেশীয় উন্নয়ন দ্বারা সমর্থিত প্রযুক্তি সিএসআইআর এবং ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (আইসিএআর) দ্বারা ট্র্যাক্টর এবং কৃষি-কীটনাশক, ভারতকে তার গম এবং চালের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে সাহায্য করেছে. এটিদেশকে বড় আকারের আমদানি থেকে স্থায়ীভাবে দূরে যেতে সক্ষম করেছে. একই সাথে, ডঃ ভার্গীজ কুরিয়েন এবং গুজরাটের আনন্দ তাঁর টিম দুধের শিল্পকে বিপ্লব করেছেন এবং বিশ্বের প্রথমবারের জন্য দুধ আমদানির প্রয়োজনীয়তা অপসারণ করেছেন, যা প্রমাণ করেছে মহিষের দুধ প্রক্রিয়া করা যেতে পারে এবং দুধের পাউডার হিসাবে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।ডঃ কুরিয়েন দেশব্যাপী ডেয়ারি কোঅপারেটিভ তৈরি করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন যাতে কোনও দুধ বর্জ্য হয়নি. এর পরে এটি ছিল হলুদ বিপ্লব এবং নীল বিপ্লব ১৯৮০সালের শেষ পর্যন্ত, যা খাদ্য তেলের বীজ উৎপাদনকে বাড়ায় এবং ভারতকে দ্বিতীয় বৃহত্তম মাছ উৎপাদনকারী দেশ হিসাবে গড়ে তুলেছে. ১৯৯০এর মধ্যে আসেন সোনালী বিপ্লব, যার লক্ষ্য হনি আর হর্টিকালচারাল উৎপাদনকে বাড়ানো ।

এই বছর এবং ২১ম শতাব্দীতে, ভারত স্ব-পর্যাপ্ত হয়ে উঠেছে বিভিন্ন মশলা, মেডিসিনাল প্ল্যান্ট এবং অ্যারোম্যাটিক প্ল্যান্টের চাষ এটি ভারতীয় সংস্কৃতি এবং লাইফস্টাইলে গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি যেমন অ্যাসাফোটাইডা, মেন্থা, ল্যাভেন্ডার এবং স্যাফরন. এবং সত্যি এমন একটি ঐতিহ্য যা সবুজ বিপ্লবের সাথে শুরু হয়, ভারত এগিয়ে যাচ্ছে এগ্রি-জিনোমিক্স এবং জিনোম এডিটিং ফলন উন্নত করা এবং পরিবর্তনশীল সময়ে কৃষি বিভিন্ন প্রকারের খাপ খাওয়ার জন্য ।

প্রতিরক্ষা

১৯৬০ - সবুজ বিপ্লবের সময়- হল এক দশক যার মধ্যে ভারত তার প্রথম প্রতিরক্ষা মাইলস্টোনে পৌঁছেছে: প্রথম দেশীয় নৌসেনা সাবমেরিনের লঞ্চ, INS কালভারি. এটি শুধুমাত্র প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেই নয় বরং বিভিন্ন ক্ষেত্রেই 'মেড-ইন-ইন্ডিয়া' প্রযুক্তির দীর্ঘ তালিকার শুরু ছিল. তবে, প্রতিরক্ষা খাতে, ভারত সফলভাবে তৈরি, পরীক্ষা এবং প্রয়োগ করতে চলেছে অগ্নি এবং পৃথ্বী মিসাইল, সুপারসোনিক ফাইটার বিমান যেমন তেজস, নিউক্লিয়ার মিসাইলস (পোখরান II), বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত সুপারসোনিক ক্রুজ মিসাইল ব্রহ্মস, ব্যালিস্টিক মিসাইল

সাবমেরিন আইএনএস আরিহান্ত, এবং এয়ারক্রাফ্ট ক্যারিয়ার INS বিক্রান্ত, কিছু নাম দিতে. এগুলি এর মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে স্বদেশী উন্নয়ন, প্রায়শই প্রতিরক্ষা বিমান এবং সরঞ্জামের উপাদানগুলির জন্য ব্যক্তিগত অত্যাধুনিক প্রযুক্তির স্ক্র্যাচ থেকে, যেমন অটোক্লেভ প্রযুক্তি আধুনিক-দিনের সিভিল এবং মিলিটারি এয়ারফ্রেম এবং হেড-আপ ডিসপ্লে (এইচইউডিএস)-এ ব্যবহৃত হাল্কা কম্পোজিটগুলি প্রক্রিয়া করার জন্য.

বিমান, মিসাইল এবং সাবমেরিন ছাড়াও, এখানে রয়েছে সাম্প্রতিককালে অন্যান্য বিভিন্ন মূল উন্নয়ন, যেমন শক্তি মিশনের অধীনে উন্নত অ্যান্টি-স্যাটেলাইট প্রযুক্তি, যা ভারতকে তৈরি করেছে 4তম দেশ দেশীয় প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে এই ক্ষমতাটি প্রদর্শন করুন; অ্যাস্ট্রা, ভিজুয়াল রেঞ্জ এয়ার-টু-এয়ার মিসাইলের বাইরে প্রথম দেশীয়, যা এই প্রযুক্তির সাথে যুক্ত কিছু দেশের মধ্যে ভারতকে রেখেছে; অ্যাটাগ ১৫৫মিমিমি গান, যার বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ ফায়ারিং রেঞ্জ রয়েছে; পর্বতে অ্যাপ্লিকেশনের জন্য রডার স্বাধীন অস্ত্র এবং নিম্ন-স্তরের ট্র্যাকিং রাডার; ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার সিস্টেম; আন্ডারওয়াটার ওয়েপন এবং কাউন্টারমেজার সিস্টেম; এবং ড্রোন এবং অ্যান্টি-ড্রোন সিস্টেম ।

বর্তমানে, ডিআরডিও কোয়ান্টাম সিস্টেম, হাইপারসনিক সিস্টেম, অ্যাডভান্সড মেটিরিয়াল এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টালিজেন্সের মতো প্রযুক্তিগুলিকে প্রতিরক্ষা খাতে একত্রিত করার উপায়ে গবেষণা পরিচালনা করছে. প্রকৃতপক্ষে, হাইপারসনিক টেকনোলজি ডেমনস্ট্রেটর ভেহিকেল (এইচএসডিটিভি) ২০২০সালে সফলভাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল, যার ফলে ভারত তৈরি হয়েছিল ৪তম দেশ এই প্রযুক্তির ব্যবহার প্রদর্শন করার জন্য।

মহাকাশ

স্পেস সেক্টর হল অন্য একটি ক্ষেত্র যেখানে ভারত দেশীয়ভাবে প্রযুক্তি তৈরি করেছে এবং বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি পেয়েছে. এই সাগা ১৯৭৫সালে শুরু হয় আর্যভট্ট চালু করা, প্রথম ভারতীয় স্যাটেলাইট- যা এক্স-রে অ্যাস্ট্রোনমি এবং সোলার ফিজিক্সে পরীক্ষা পরিচালনার উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল- এবং সাইটের লঞ্চ (স্যাটেলাইট নির্দেশাবলী টেলিভিশন পরীক্ষা), যা ভারতের দূরবর্তী অঞ্চলেও কমিউনিটি টিভি সেট নিয়ে এসেছে. এগুলি, এবং পরে, ৮০সালে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল স্যাটেলাইট (আইএনএসএটি) এবং ইন্ডিয়ান রিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইট (আইআরএস) চালু হওয়ার পরে, বিশাল যোগাযোগ, রিমোট সেন্সিং, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, বায়ুমণ্ডলীয় এবং স্পেস গবেষণা এবং আরও অনেক কিছুর মাধ্যমে সমৃদ্ধির যুগ শুরু করেছিল ।

১৯৮০সালে, ভারত সফলভাবে তার প্রথম স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল, এসএলভি-৩লঞ্চ করেছে. ১৯৮৪সালে, ভারত পাঠানো হয়েছে রাকেশ শর্মা, এটির প্রথম জ্যোতির্বিদ, বাইরের জায়গায়. ২০০০সালে, ভারত নিজস্ব রকেট তৈরি করতে শুরু করেছিল, যা শুধুমাত্র দেশীয় স্যাটেলাইট এবং গবেষণা সরঞ্জামগুলি নিয়ে এসেছে না, বরং অন্যান্য উন্নত দেশগুলির কাছ থেকেও যন্ত্রপাতি পাঠায়. এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভারতীয় রকেট দ্বারা পরিচালিত মিশনগুলি হল চন্দ্রযান ১ (চন্দ্রের ভারতের প্রথম মিশন; যার মাধ্যমে ভারত হয়েছিল 4তম দেশ লুনার পৃষ্ঠতলে একটি অনুসন্ধান পাঠানোর জন্য; এবং যেখানে, ভারত লুনার পৃষ্ঠতলে জলের অণুর অনুসন্ধান করা হয়েছিল), মার্স অর্বিটার মিশন (যেখানে ভারত তার প্রথম প্রচেষ্টায় মার্শিয়ান অর্বিটে প্রবেশ করার প্রথম দেশ ছিল), GSLV-D5 চালু করা (যা প্রথম ভারতীয় তৈরি ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল) এবং দ্বারা নির্ধারিত বিশ্ব রেকর্ড ১০৪স্যাটেলাইট সফলভাবে প্লেস করা হয়েছে একটি চালু হওয়ার সময় অর্বিটে আছে ।

এই মিশনগুলি ছাড়াও, ২১ম শতাব্দীতে, ভারত এর স্পেস সেক্টর তৈরি করতে থাকে এর তৈরি স্পেস ডিপার্টমেন্টের অধীনে ভারতীয় জাতীয় স্পেস প্রমোশন এবং অনুমোদন কেন্দ্র (ইন-স্পেস) এর মতো সংস্থাগুলি, এই সেক্টরে আরও বেশি বেসরকারী এবং নাগরিক অংশগ্রহণকে প্রচার করার জন্য- এর ফলে চারটি শিক্ষার্থী স্যাটেলাইট সফলভাবে চালু হয়েছে - এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তিরুবনন্তপুরমে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ স্পেস সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির মতো ভারতীয় স্পেস প্রোগ্রামের জন্য ইঞ্জিনিয়ারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া ।

আসন্ন বছরগুলিতে, ভারত বিভিন্ন উচ্চাকাঙ্ক্ষী মিশনের জন্য তৈরি হচ্ছে, যার মধ্যে চন্দ্রযান (চন্দ্রযান 3), একটি হিউম্যান স্পেসফ্লাইট মিশন (গগনযান), একটি সোলার মিশন (আদিত্য এল ১), এবং একটি ভেনাস অর্বিটার মিশন (শুক্রয়ান) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে. একটি বিশেষ সাক্ষাৎকারে পিএসএ অফিসের জন্য, শ্রী এস. সোমনাথ, সেক্রেটারি, ডিপার্টমেন্ট অফ স্পেস (ডিওএস) এবং চেয়ারপার্সন, ইসরো এই মিশনগুলি কীভাবে সম্পর্কে কথা বলেছেন "২১ম শতাব্দী বিশ্বে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী স্পেস প্রোগ্রামগুলির মধ্যে একটির নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রযুক্তি-নির্মাণকারী দেশ হিসাবে আমাদের পরিচয়কে সংজ্ঞায়িত করুন." দেশটিও এখানে অসাধারণ অবস্থায় থাকে গবেষণা ছোট স্যাটেলাইট লঞ্চ গাড়ি, এয়ার-ব্রিদিং রকেট প্রপালশন সিস্টেম, পুনর্ব্যবহারযোগ্য রকেট প্রযুক্তি এবং আরও অনেক কিছু তৈরি করার জন্য. "এই মিশনগুলি হল একটি তরুণ বৈজ্ঞানিক কর্মশক্তিকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার সুযোগ যা নিয়মিত কাজগুলির বাইরে দেখায় এবং মৌলিক জ্ঞান সৃষ্টি করার চেষ্টা করে. আমাদের লক্ষ্য হল জাতীয় মিশন এবং বাণিজ্যিক অর্থনৈতিক উদ্যোগের ক্ষমতা তৈরির জন্য ইঞ্জিনিয়ার, গণিতজ্ঞ, জ্যোতিষবিদ, জ্যোতিষবিদ এবং উদ্যোক্তাদের সাথে জড়িত করা," বলেছেন শ্রী সোমনাথ ।

সামাজিক কল্যাণ এবং স্থায়িত্ব

১৯৮০এবং ৯০এর দশক থেকে, ভারত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক সাফল্য অর্জন করেছে যেখানে অগ্রগতি কেবলমাত্র ভূমিতে জীবনকে উন্নততর করার উপর ফোকাস করা হয়েছিল ৮০-এর দশকের পরে, ভারত গ্রহণ করেছিল মার্ক-II হ্যান্ডপাম্প গ্রামীণ অঞ্চলগুলিতে, একটি প্রধান উপায়ে খরা পরিণত হচ্ছে. ১৯৮৩সালে, প্রথম অ্যান্টার্কটিকায় ভারতীয় বৈজ্ঞানিক বেস স্টেশন স্থাপন করা হয়েছিল. ১৯৮৪সালে, C-ডট সেট আপ করা হচ্ছে (সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অফ টেলিম্যাটিক্স) একটি ছাদের অধীনে দেশের টেলিকম গবেষক এবং সম্পদ পুল করেছে, যা টেলিকম বিপ্লব শুরু করেছে. ১৯৮৬সালে, প্রথম রেলওয়ে যাত্রী সংরক্ষণ সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছিল, যা তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগের সম্ভাবনা প্রদর্শন করার মত বৃহত্তম প্রোজেক্ট ছিল ।

১৯৮৬সালের বছরটিও চিহ্নিত করা হয়েছে দেশের প্রথম টেস্ট টিউব শিশুর জন্ম, হর্ষ; এই বৈশিষ্ট্যটি, এই দশকের আগে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকাল রিসার্চ (আইসিএমআর) দ্বারা ভিট্রো ফার্টিলাইজেশনের অগ্রণী সংমিশ্রণে, সহায়ক প্রজননের ক্ষেত্রে ভারতকে বিশ্বমানচিত্রে রেখেছিল. ১৯৯১তে, ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং প্রথমে একটি আইনী বিবাদে প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল- ফরেনসিক, জিনোম রিসার্চ এবং স্বাস্থ্যসেবায় জেনেটিক টেস্টিং-এ নতুন সম্ভাবনাগুলির দরজা খুলে দেওয়া - এবং ভারতের প্রথম সুপারকম্পিউটার, প্যারাম তৈরি করা হয়েছিল. ১৯৯৮তে, কল্পক্কম, ভারতের নিউক্লিয়ার পাওয়ার জেনারেশন এবং ফুয়েল রিপ্রসেসিং প্ল্যান্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল.

কল্পক্কম শুরু হওয়ার পর থেকে দশকে দেশের দীর্ঘস্থায়ী লক্ষ্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব অর্জন করেছে. সম্প্রতি, এটি এর জন্য লোকেশন হয়ে গেছে টু ওয়াটার ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্ট ডিএই দ্বারা

নির্মিত, যা একটি কাছাকাছি শহরে পানীয় জল সরবরাহ করে. এটি একটির জন্যও লোকেশন নভেল সিওয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট DAE দ্বারা. এমনভাবে, এটি সাইট হয়ে উঠছে যা মনে করে ডিএই পরিচালনা করে এমন গবেষণার বিস্তৃত বিন্যাস, রিসার্চ নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর তৈরি করা থেকে শুরু করে রেডিওথেরাপির জন্য কার্যকরী আইসোটোপ আবিষ্কার করা, এবং কম-খরচে জল পরিশোধন ব্যবস্থা আবিষ্কার করা পর্যন্ত যার জন্য কোনও বিদ্যুৎ প্রয়োজন নেই।

২১ম শতাব্দীতে যাওয়া, ভারত ২০০৪সালে তার প্রথম ইলেকট্রনিক-ভোটিং-মেশিন-ভিত্তিক নির্বাচন পরিচালনা করেছিল; ২০০৯সালে সমস্ত বাসিন্দাদের জন্য একটি ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন নম্বর তৈরি করা হয়েছিল; ২০১৪সালে পোলিও-ফ্রি ঘোষণা করা হয়েছিল; এবং ২০১৫সালে আর্কটিক অবজারভেশন স্টেশন, ইন্ডার্ক স্থাপন করা হয়েছিল. ২০২০এর মধ্যে, গতি এই উন্নয়নের সাথে চলে এসেছে হাইড্রোজেন-পাওয়ার্ড গাড়ি, প্রথম স্বদেশী সোশ্যাল হিউম্যানয়েড রোবট, প্রথম স্বদেশী সার্ভার রুদ্র, একটি ম্যানড সাবমার্সিবেল সমুদ্রযন, এবং দেশীয় কোভিড-19 ভ্যাকসিন, অন্যান্য উদ্ভাবনের মধ্যে।

বর্তমানে, ভারতের অনেকগুলি ঋণ আছে স্বদেশী ডায়াগনস্টিক কিট, এইচআইভি এর জন্য সহ; বিভিন্ন ভ্যাক্সিন, রোটাভাইরাস, মাল্টিবেসিলারি লেপ্রোসি, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, চিকনগুনিয়া এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো; ড্রাগ, অ্যান্টি-ফাঙ্গাল কম্পোজিশন এবং পশ্চিমী ব্র্যান্ডের সাশ্রয়ী জেনেরিক ভার্সন; এবং মেডিকেল ডিভাইস যেমন সোহম, শিশুদের ক্ষতিগ্রস্ততা শুনে দ্রুত সনাক্ত করার জন্য, এবং নিওব্রেথ, নিওন্যাটাল কেয়ারের জন্য একটি ফুট-অপারেটেড রেজাসিটেশন ডিভাইস. এগুলি, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রিক নীতিগুলি দ্বারা সমর্থিত, এগুলি অনেক অবদান রেখেছে প্রত্যাশিত জীবনে উন্নতি ১৯৪৭সালে ৩২বছর থেকে ২০২১সালে 69.4 বছর পর্যন্ত. তারাও সাহায্য করেছে মাতৃত্বকালীন মৃত্যু হ্রাস করুন ২০০০থেকে ১১৩প্রতি 100,000 লাইভ জন্ম এবং শিশুদের মৃত্যু একই সময়ের মধ্যে ১৪৫থেকে 28.7 প্রতি ১০০০জন্ম পর্যন্ত লাইভ বার্থ।

সামগ্রিকভাবে, ভারত হল পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ইনস্টলেশনের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় দেশগুলি, 3য় বৃহত্তম বিকাশ লাভ করেছে স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম বিশ্বে, এবং বাড়ি বিশ্বের সবচেয়ে বড় ভ্যাকসিন প্রোডিউসার. এই দেশটি বিশ্বব্যাপী অংশগ্রহণের জন্য বিখ্যাত আন্তর্জাতিক মেগা-সায়েন্স প্রোজেক্ট যেমন লেজার ইন্টারফেরোমিটার গ্র্যাভিটেশনাল-ওয়েভ অবজারভেটরি (এলআইজিও), লার্জ হ্যাড্রন কলিডার (এলএইচসি, সিইআরএন), ইন্টারন্যাশনাল থার্মোনিউক্লিয়ার এক্সপেরিমেন্টাল রিঅ্যাক্টর (আইটিইআর) এবং স্কোয়ার কিলোমিটার অ্যারে (এসকেএ)।

রাস্তায় India@100 পর্যন্ত

স্বাধীনতার পরে প্রারম্ভিক বছরগুলিতে প্রতিষ্ঠিত ভিত্তি - যা নতুন প্রতিষ্ঠান এবং গবেষণাগার, নতুন এবং বিকশিত নীতি এবং উদ্যোগ এবং জাতীয় লক্ষ্যের আকারে নতুন লক্ষ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উৎসাহিত এবং আপগ্রেড করা হয়েছে - রাষ্ট্রের আত্মনির্ভরশীলতা এবং স্থিতিশীলতার দিকে কোর্স স্থাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, ফলস্বরূপ আজ আমরা যে সাফল্য অর্জন করি তার ফলস্বরূপ.

এই সাফল্যের সাথে শিক্ষা, দক্ষতা এবং উন্নয়ন আসে, যা আমাদেরকে আমাদের দেশে যে বিশাল চ্যালেঞ্জগুলি সমাধান করতে প্রস্তুত করেছে. এখন, ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কী শুরুতে, শ্রী নরেন্দ্র মোদী, 'অমৃত কাল' বলেছেন'— বা India@১০০পর্যন্ত অবশিষ্ট ২৫বছরের শুভ যুগ-ভারতের উন্নয়নমূলক লক্ষ্য অর্জনের দিকে ইতিমধ্যে বিভিন্ন সিওজি নির্ধারণ করা হয়েছে. অটল ইনোভেশন মিশন স্টার্ট-আপগুলির জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন করেছে;

বৈজ্ঞানিক অন্বেষণ মিশন যেমন গভীর মহাসাগরের মিশন or space missions have opened doors to new discoveries; the Digital India movement has been launched to develop semiconductors, spread the network of optical fibres for 5G to rural areas, and drive transformation in education, healthcare, and agriculture through digitalisation; production-linked incentive (PLI) schemes have been set up to boost manufacturing and bring in technologies from abroad; and progressive policies regarding drones have opened up a myriad of possibilities for goods deliveries, digital mapping, surveillance, and flying taxis. এই তালিকাটি সম্পূর্ণ নয় ।
তার মধ্যে বক্তব্য ভারতের 76তম স্বাধীনতা দিবসে, প্রধানমন্ত্রী দেশকে সৌর এবং বায়ু শক্তি ব্যবহার করা, হাইড্রোজেন জ্বালানী এবং বায়োফুয়েল উৎপাদন এবং বৈদ্যুতিক গাড়িগুলিকে প্রচারের ক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য জিনিসের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতার দিকে কাজ করার জন্য অনুরোধ করেছেন. তিনি কৃষিক্ষেত্রে আরও দীর্ঘস্থায়ী অনুশীলনের প্রয়োজনের উপর জোর দিয়েছিলেন, যেমন ন্যানোফার্টিলাইজার ব্যবহার করা এবং জৈবিক এবং রাসায়নিক-মুক্ত কৃষিক্ষেত্রে পরিবর্তন করা. তিনি দেশের প্রযুক্তিগত সাফল্যও ব্যক্ত করেছিলেন এবং আগামী দশকে একটি প্রযুক্তি কেন্দ্র হওয়ার ক্ষমতা হাইলাইট করেছিলেন।
প্রকৃতপক্ষে, এটি শুধুমাত্র বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের পিছনেই যে ভারত বিশ্বব্যাপী পর্যায়ে গণনা করার জন্য একটি শক্তি হয়ে উঠবে ।

পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

১৯৮৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ স্থাপিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সংসদ একটি স্বশাসিত সংস্থা যেটি সমিতি আইন দ্বারা রেজিস্ট্রিকৃত এবং এই বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের অধীন, যা সর্বভারতীয় আঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ অনুসারে এই বিভাগের কার্যাবলী সাবলীল ভাবে পরিচালনা করার জন্য। এই বিভাগ বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাবিদদের সহায়তায় নিজের কার্যাবলী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিস্তৃত করেছে।

গত দু-দশক ধরে এই বিভাগ বিভিন্ন ক্ষেত্রের বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপে উৎসাহ প্রদানের জন্য বহু কঠিন পথ অতিক্রম করেছে এবং বিভিন্ন নামী বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা কেন্দ্র, কলেজ এবং নাগরিক সমাজের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ও উদ্ভাবনমূলক প্রকল্পের উন্নতিসাধনের পথে সহায়তা প্রদান করেছে।

এই বিভাগের 'রিমোট সেনসিং এণ্ড জিও-ইনফরমেশন সিস্টেমস্'- এর মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন বিভাগ এবং সংস্থার পরিকল্পনাগুলির উন্নতি সাধন এবং কলাকৌশলের নজরদারির জন্য সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি এবং মূল তথ্যের সরবরাহ করার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই ক্ষেত্রের কিছু প্রকল্প ভারত সরকারের ''ন্যাশনাল রিমোট সেনসিং সেন্টার *এবং ''ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অরগানাইজেশন-* এর সঙ্গে অংশীদার হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

এই রাজ্যের বিভিন্ন সুপ্রতিষ্ঠিত সংস্থার সঙ্গে অংশীদার হিসাবে এই বিভাগ বিভিন্ন জরুরী ক্ষেত্র যেমন: বিশ্ব উষ্ণায়ণ ও আবহাওয়া পরিবর্তন, সবুজ প্রযুক্তি, জল সংরক্ষণ, বর্জ্য পদার্থের পরিশোধন, জীব বৈচিত্র্য, উদ্ভাবনী গ্রামীণ প্রযুক্তি, কৃষি উন্নয়ন, মেধাসত্ব অধিকার, - প্রসঙ্গে সেমিনার, কর্মশালা এবং সচেতনতা প্রকল্পগুলির উদ্যোগে সহায়তা দেয়।

জৈবপ্রযুক্তি

২০০৬-২০০৭ সালে জৈবপ্রযুক্তি বিভাগ খোলার ফলে পশ্চিমবঙ্গে 'স্টেট অফ আর্ট' ও প্রথাগত জৈবপ্রযুক্তির উন্নয়নে নতুন জোয়ার এলো যার লক্ষ্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন।বিভাগের লক্ষ জৈবপ্রযুক্তির উন্নতির বিপণন,পরিপোষণ এবং আরো যা গুরুত্বপূর্ণ সৌন্দর্যসাধন করা।যেহেতু জৈবপ্রযুক্তি একটি জ্ঞান-নির্ভর কেন্দ্র,যেখানে উন্নয়ন সম্পূর্ণভাবে 'গবেষণা ও উদ্ভাবনের' ওপর নির্ভরশীল, সেই কারণে এই বিভাগ সক্রিয়ভাবে গবেষণা ও উন্নয়নে সহায়তা করে, উন্নত মানব সম্পদে প্রেরণা যোগায় এবং জৈবপ্রযুক্তি নির্ভর শিল্পের পরিকাঠামোগত সুযোগসুবিধা যোগায়।কৃষি, স্বাস্থ্যপরিষেবা, পশু বিজ্ঞান, পরিবেশ এবং শিক্ষা-শিল্প মিলিত উদ্যোগ ইত্যাদিতে জৈবপ্রযুক্তির বৃদ্ধি ও স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে এই বিভাগ উল্লেখযোগ্য কাজ করে।

অ্যাসোচাম (অ্যাসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ড্রাস্টি অব ইন্ডিয়া) পশ্চিমবঙ্গকে সম্ভাবনাময় বাণিজ্য বিকাশ কেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত করেছে, যার মধ্যে জৈবপ্রযুক্তি হচ্ছে সম্ভাবনাময় লগ্নির ক্ষেত্র। বিনিয়োগের আকর্ষণীয় ফেরত এবং সামাজিক বিকাশের বড় সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লক্ষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জৈবপ্রযুক্তি ভিত্তিক কাজকর্মকে আরো ছড়িয়ে দেওয়া যেমন স্বাস্থ্য পরিষেবা (জেনোমিকস,প্রোটিওমিকস, ডায়গোনসটিকস, দেশীয় ঔষধটির ডি.এন.এ ফিংগারপ্রিন্টিং ইত্যাদি) কৃষি (ফুল চাষ,রেশম চাষ ইত্যাদি),বাংলার জীববৈচিত্রের মানচিত্র তৈরি এবং পরিবেশ সুরক্ষা।

একক-১২

৫) জনসাধারণের বিজ্ঞান উপলব্ধি

ভুমিকাঃ- আকাশ পথে উড়ে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যাওয়া, কম্পিউটারের এক একটি বোতাম টিপে পৃথিবীরযে কোনো স্থানে অবস্থানকারী আগ্রহী ব্যক্তি হিসেবে প্রয়োজনীয় সব তথ্য আহরণ করার মত প্রযুক্তি ব্যবহারকরতে পারা, টেলিভিশনের পর্দায় পৃথিবীর সব ধরণের গুরুত্তৃপূর্ণ খবর বা বিনোদনের উপকরণ খোঁজা, প্রচগরমে ফ্যান বা এ.সি. চালিয়ে ঠাভার পরশ পাওয়া, জটিল রোগের ক্ষেত্রেও সঠিক অনুসন্ধান ও চিকিৎসা পদ্ধতিরমাধ্যমে বেঁচে থাকার আশ্বাস পাওয়া হয়তো গত শতাব্দীর মানুষের কাছে ছিল চরম বিস্ময় অথবা রূপকথার বুলি,কিন্ত এসবই আজকের যুক্তি নির্ভর মানুষের কাছে অতি সাধারণ ঘটনা । যার মূলে রয়েছে বিজ্ঞান কিংবা বিশেষজ্ঞানের প্রয়োগ । বিজ্ঞানের এ সফল প্রয়োগই উন্নত সভ্যতার চাবিকাঠি । এ যুগের মানুষ বিজ্ঞান ছাড়া চলতেপারে না, আমাদের জীবনের প্রতিটি কাজে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে বিজ্ঞান, ব্যক্তি জীবন থেকে জাতীয়জীবনের অগ্থগতিতে বিজ্ঞানের দান অপরিসীম ।
বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতি

বিজ্ঞান
বিজ্ঞান শব্দের অর্থ 'বিশেষ জ্ঞান। আমাদের চারপাশের পরিবেশে সব সময়ই কিছু না কিছু ঘটছে এবং আমরা যদি তা দেখতে, উপলব্ধি করতে বা বুঝতে পারি তবে বলা চলে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়ছে। কিন্তু এ জ্ঞান হলো সাধারণধর্মী জ্ঞান। বিজ্ঞান হলো পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে

পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলি থেকে প্রাপ্ত ও যাচাইকৃত জ্ঞান। বিভিন্ন মনিষী বিজ্ঞানের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। রবার্ট সান্ডের মতে, "বিজ্ঞান হল জ্ঞানের সমাবেশ ও একটি পদ্ধতি।কুলসন ও স্টোনের মতে, "বিজ্ঞান হল সুসংবদ্ধ জ্ঞান।"আমরা বলতে পারি বিজ্ঞান হলো, কোনো সমস্যা সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান।আর যিনি উপরের পদ্ধতি অনুসরণ করে কোনো সমস্যার সমাধান করেন তিনিই বিজ্ঞানী।

সকল বিজ্ঞানীই তাদের গবেষণার কাজ পরিচালনার জন্য এক বা একাধিক নির্দিষ্ট ধারাবাহিক পদ্ধতি অনুসরণ করেন। এই পদ্ধতিকেই বৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে এবং সবগুলোই ধারাবাহিক।
বৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতির প্রথমেই বিজ্ঞানীএকটি সমস্যা চিহ্নিত করেন।সমস্যাটি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেন।যাবতীয় তথ্যের ভিত্তিতে বিচার বিশ্লেষণ করে সমস্যাটি সম্পর্কে আনুমানিক সিদ্ধান্ত নেন।এ আনুমানিক সিদ্ধান্ত সঠিক কিনা তা যাচাইয়ের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন।
•পরীক্ষার শেষে আনুমানিক সিদ্ধান্ত এবং পরীক্ষার সাহায্যে প্রাপ্ত তথ্যের তুলনা করেন। যদি সিদ্ধান্ত দুটি না মিলে তবে নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।
সবশেষে গৃহীত সিদ্ধান্ত অন্যের যাচাইয়ের জন্য তার পরীক্ষার ধারাবাহিক পদ্ধতি ও সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। "সমস্যা চিহ্নিতকরণ,তথ্য সংগ্রহ,তথ্যের বিশ্লেষণ,আনুমানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ
নতুন আনুমানিক সিদ্ধান্ত প্রাপ্তি, সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ফলাফল প্রকাশ, প্রাপ্ত তথ্যেল পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, ফলাফল বিশ্লেষণ,সিদ্ধান্ত গ্রহণ,সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ফলাফল প্রকাশ, বৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতির প্রবাহচিত্র, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ছাড়া সাধারণ মানুষও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে ।
উদাহরণ : একজন চিকিৎসকের চিকিৎসা পদ্ধতি লক্ষ্য করলে আমরা এর বাস্তব প্রয়োগ দেখতে পাই। মনে করুন, একজন রোগী একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে আসলেন। এখানে রোগীর অসুখটাই চিকিৎসকের সমস্যা। প্রথমে চিকিৎসক রোগীর অসুখ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য রোগীর কাছ থেকে সংগ্রহ করেন। এ তথ্যের ভিত্তিতে তিনি রোগীর অসুখ সম্পর্কে একটি আনুমানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ সিদ্ধান্ত সঠিক কিনা তা যাচাইয়ের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা (যেমন : রক্ত পরীক্ষা, মল-মূত্র পরীক্ষা) করেন, অবশ্য এ পরীক্ষা তিনি নিজ হাতে করেন না। এ পরীক্ষা নিরীক্ষা হতে প্রাপ্ত তথ্যের সাথে তিনি আনুমানিক সিদ্ধান্তের তুলনা করেন। সবশেষে তিনি একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং রোগীর সে অনুযায়ী চিকিৎসা পদ্ধতি নির্দিষ্ট করেন। রোগীর ভবিষ্যৎ শারিরীক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখেন যতদিন না পর্যন্ত সে সুস্থ হয়ে ওঠে। আমরা সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করলেন।
আমরা উপরের বাস্তব উদাহরণটির মাধ্যমে বলতে পারি যে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে আমরা সুষ্ঠু সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি এবং সমস্যার সমাধান করতে পারি।

বিজ্ঞান চর্চার গুরুত্ব

বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্য ছাড়া আমরা এক পা চলতে পারি না। আমরা যে খাদ্য খাচ্ছি, যে পোশাক পরছি, যে ঘরে বাস করছি, যে চিকিৎসা সুবিধা পাচ্ছি, সবই বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও এর প্রযুক্তি ভিত্তিক প্রয়োগের অবদান। বর্তমান কৃষি, শিল্প-কারখানা, সংবাদ আদান-প্রদান, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, মহাকাশ গবেষণা সবই বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল, আর এসব সাফল্যের কারণেই মানুষ আজ গতকালের চেয়ে অধিক আত্মবিশ্বাসের সাথে পৃথিবীতে বাস করছে। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের কারণেই আজ আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ

সংগঠিত হওয়ার আগেই তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে পারছি। গত কয়েক শতকের আলোচনা থেকেই আমরা বিজ্ঞানের জয়যাত্রা সম্পর্কে জানতে পারি।
জেমস ওয়াটের বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার আঠার শতাব্দীতে মানব সমাজের এক বহু কল্যাণকর আবিষ্কার। এরপর রেলগাড়ি আবিষ্কৃত হলো। ক্রমান্বয়ে উড়োজাহাজ আবিষ্কৃত হলো। মাইকেল ফ্যারাডে বিদ্যুৎ আবিষ্কার করলেন। বিদ্যুৎ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ তার আরাম-আয়েশ, সুখ-সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করে নিলেন, ফলে আলো জ্বললো, পাখা ঘুরলো, শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হলো ।
•উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হতে বিজ্ঞানের আবিষ্কার অতি দ্রুত গতিতে চলতে থাকে। এ সময় পদার্থ বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েলের (Maxwell) বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গবাদ, প্ল্যাংক (Planck) -এর কণিকা তত্ত্ব, আইনস্টাইন (Einstein)-এর আপেক্ষিক তত্ত্ব বিস্ময়কর আবিষ্কার, এসময়ে মার্কনি এবং আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু বিদ্যুৎ তরঙ্গের সাহায্যে বার্তা প্রয়োগ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এভাবে বেতারের আবিষ্কার সম্ভব হয়।
•রকেট চালিত মহাকাশযানে চড়ে মানুষ অনেক বছর আগেই চাঁদে পৌঁছেছে। পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে ভেঙ্গে যে বিপুল পরিমাণ শক্তি পাওয়া যাচ্ছে তা রিয়্যাক্টরের মাধ্যমে ধনাত্মকভাবে বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে। কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানা যাচ্ছে।
চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষ এখন অনেক জটিল রোগ থেকে সহজেই মুক্তি পাচ্ছে। পেনিসিলিন, ক্লোরোমাইসিন, স্ট্রেপটোমাইসিনসহ, এইডস রোগের প্রতিরোধমূলক ঔষধ বা ক্যান্সার রোগের নিরাময় মূলক চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কারের ফলে কোটি কোটি মানুষ রক্ষা পেয়েছে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি হতে। রঞ্জন রশ্মির সাহায্যে আমরা শরীরের ভিতরের চিত্র দেখে বুঝতে পারি কোনো অংশে কি ধরনের অসুস্থতা দেখা দিয়েছে। রেডিয়ামের সাহায্যে অনেকাংশে ক্যান্সারকে প্রতিহত করা যায়।
•কৃষি বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এখন অনেক উন্নতজাতের ধান ও পাটের চাষ হচ্ছে। ভালো সার জমিতে প্রয়োগের ফলে আমরা প্রচুর ফসল পাচ্ছি। আরো আবিষ্কৃত হয়েছে কলের লাঙল, পানি সেচের যন্ত্র, স্প্রে মেশিন ।
কাজেই মানব সভ্যতাকে উন্নতির উচ্চতর শিখরে পৌঁছে দিতে বিজ্ঞানের অবদান অপরিসীম, এবং একারণেই নিজেদের প্রয়োজনে তথা মানবজাতির কল্যাণে প্রত্যেকের উচিৎ বিজ্ঞান চর্চা করা।
সারসংক্ষেপ
বিজ্ঞান হলো কোনো সমস্যা সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান। জীবনে সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞান চর্চায় আমরা সুক্ষ্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি এবং সমস্যার সমাধান করতে পারি।

সহায়ক গ্রন্থাবলীঃ-

১) West Bengal Budget Analysis 2020-2021
২)School Education wb.gov.in। সংগ্রহের তারিখ জুন ৭, ২০১৭।
৩) Department of School Education, Govt. of West Bengal"। wbsed.gov.in।৮, জুন, ২০১৭ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ জুন ৭, ২০১৭।
৪)Department of School Education, Govt. of West Bengal" ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ২৪ জুলাই ২০১৯ তারিখে. wbsed.gov.in.

৫)কঠিন অসুখ, কঠিন সময়ে শিক্ষায় প্রত্যাবর্তন ব্রাত্যর"। Ei Samay। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-০৫-১৭।

১) Apple, M. (2004). Ideology and Curriculum, 3rd edn, London, Routledge Falmer All India Survey On Higher Education 20l7-l8 (Government of India, Ministry ofHuman Resource Development, Department of Higher Education, New Delhi, 2018
২)Ball, S.(1993). 'Education policy, power relations and teachers' work', British Journalof Educational Studies, 41(2): 106–21. — (1994).
৩) Education Reform: A Critical and Post-structural Approach, Buckingham: Open University Press. Barber, M. (1992). Education and the Teacher Unions, London: Cassell.
৪) Delors. J.(1996). Learning: The treasure within, Report to UNESCO's InternationalCommission on Education for the 21st century.
৫)Green, A. (1997). 'Education, Globalization and the Nation State' University College• London, P.186
৬)Iyengar, K. R.S.(1972.) Sri Aurobindo – A Biography and a history. Pondicherry, Sri• Aurobindo Ashram. p.441.

৭) Majumdar, R.C. (1999). Swami Vivekananda: A historical review. Calcutta।

৮)https://en.wikisource.org/wiki/The_Philosophy_of_Rabindranath_Tagore• Journal of Value Education', NCERT January and July ,2005

৯) Singh,D.P (2019). UGC in recent circulars 11th July, 2019 New Delhi formulates some• prescriptions which are also relevant and could be implementing for the interest of the nation Mahatma Gandhi's speech on Nayee Talim, November 1945, CWMG, 82, p.14S.

১) ভারতের এস অ্যান্ড টি যাত্রার 75 বছর উদযাপন: ডিএসটির প্রধান সাম্প্রতিক অবদান"আশুতোষ শর্মা, অখিলেশ গুপ্তা এবং জেনিস জিন গোভিয়াস দ্বারা
২)সাউন্ডিং রকেট থেকে লঞ্চ করার জন্য গাড়ি: স্পেস বিভাগের সাফল্য"কে. শিবন দ্বারা
৩)75 বছরে পাবলিক হেলথ সিস্টেমে টাইড পরিবর্তন করা: বলরাম ভার্গব এবং রজনী কান্তের ভূমিকা"
৪)"দ্য জার্নি অফ বিল্ডিং ডিফেন্স টেকনোলজিকাল ক্যাপাবিলিটি"বাই জি. সতীশ রেড্ডি
৫)"অ্যাটমিক এনার্জি বিভাগ: কে.এন. ব্যাস এবং এম. রামনমূর্তির দ্বারা আত্মনির্ভর ভারতের একটি গর্বিত প্রতীক"
ও "ডিবিটি: রেনু স্বরূপ এবং এ. বামসি কৃষ্ণার দ্বারা একটি শক্তিশালী বায়োটেকনোলজি রিসার্চ এবং অনুবাদ ইকোসিস্টেম"তৈরি করা
৬)পৃথিবী বিজ্ঞান মন্ত্রক: এম. রাজীবন, গোপাল আয়ঙ্গর এবং ভাব্য খন্নার দ্বারা একটি আবহাওয়া-প্রস্তুত এবং জলবায়ু-স্মার্ট ভারতের জন্য অবদান "ইন্ডিয়া টুডে 41ম অ্যানিভার্সারি: ইন্ডিয়া টুডে ডেস্ক দ্বারা 1975–2016"থেকে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিতে একটি নজর. https://www.indiatoday.in/magazine/cover-story/story/20161226-india-today-41st-anniversary-science-technology-progress-830064-2016-12-15
৭)সাতটি সংজ্ঞায়িত বৈজ্ঞানিক অবদান যা প্রতিটি ভারতীয়কে প্রভাবিত করেদিনেশ সি. শর্মা

দ্বারা পৃথিবীর উপর নিচের দিকে. https://www.downtoearth.org.in/news/science-technology/seven-defining-scientific-contributions-that-impact-every-indian-58467
৮)প্রধানমন্ত্রীর বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনী উপদেষ্টা কাউন্সিল (পিএম-এসটিআইএসি). https://www.psa.gov.in/pm-stiac

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলীঃ-

১)রণজিৎ রায়- ধ্বংসের পথে পশ্চিমবঙ্গ -নিউ এজ পাব্লিকেশন
২) রাহুল রায়- পশ্চিমবঙ্গ ফিরে দেখা
৩) সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়-বিজ্ঞান যখন আন্দোলন
৪) রাখহরি চ্যাটার্জি এবং পার্থপ্রতিম বসু- ওয়েস্ট বেঙ্গল আন্ডার দ্যা লেফট রুৎলেজ পাব্লিকেশন

১)শিক্ষার উন্নয়নেরমূলনীতি গুলি আলোচনা করুন।
২)সামাজিক উন্নয়ন ও প্রগতির ক্ষেত্রে শিক্ষার যে অবদান তা ব্যাখ্যা করুন।
৩) শিক্ষারবিস্তারেসামাজিকউন্নয়নগুরুত্বআলোচনাকরুন।

১)বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন মধ্যে সম্পর্ক কি ?
২) সামাজিক কল্যানে কল্যাণে বিজ্ঞানের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
৩) বর্তমান শিক্ষা বিস্তারে বিজ্ঞান- প্রযুক্তির ভুমিকা কি

১)মানব জীবনে বিজ্ঞান চর্চার গুরুত্ব উল্লেখ ব্যাখ্যা করুণ।
২)উদাহরণসহ বৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতি বর্ণনা করুন।
৩) জনসাধারণের মধ্যেবিজ্ঞান সচেতনার উপায় গুলি কি কি?
৪)শিক্ষার বিস্তারে জনসাধারণের ভুমিকা আলোচনা করুন।
১)গ্রামীণ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সংস্থার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন কী পরামর্শ করে?
২)গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ কী ছিল?
৩)মুদালিয়র কমিশনের পরামর্শ অনুযায়ী পাঠক্রম রচনা মূলরনীতি আলোচনা করুন।
৪)মুদালিয়ার কমিশন অনুসারে মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো এবং পাঠ্যক্রম আলোচনা করুন।
৫)কোঠারি কমিশন অনুসারে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য কী?
৬)শিক্ষক-শিক্ষা বিষয়ে কোঠারি কমিশনের সুপারিশ লিখুন।
৭)১৯৯২ খ্রিস্টব্দের জাতীয় শিক্ষানীতির প্রধান সুপারিশগুলি কী ছিল?
৮)রাধাকৃষ্ণন কমিশন অনুসারে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন।
৯)মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষার মাধ্যম এবং পাঠ্যক্রম সম্পর্কিত কোঠারি কমিশনের সুপারিশ আলোচনা করুন।
১২। ১৯৮৬ জাতীয় শিক্ষানীতির প্রধান ব্যাখ্যাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করুন।
১৩। শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় নীতি, 1986 এবং শিক্ষা সংক্রান্ত সংশোধিত জাতীয় নীতি, 1992-এর মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

Block / পর্যায় – ৬

Culture

সংস্কৃতি

সূচিপত্র

২১১.৬.১৪.০ উদ্দেশ্য

২১১.৬.১৪.১ স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যচর্চা

২১১. ৬.১৫.২ বিনোদনমূলক কার্যকলাপ

২১১. ৬.১৫.২.১ বাংলা নাটকের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

২১১. ৬.১৫.২.১ চলচ্চিত্র

২১১. ৬.১৬.৩ ক্রীড়া

২১১. ৬.১৬.৪ উপসংহার

২১১. ৬.১৬.৫ সহায়ক গ্রন্থাবলী

২১১. ৬.১৬.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

২১১.৬.১৪.০ উদ্দেশ্যঃ- এই পর্যায়ের উদ্দেশ্য হল স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক বিকাশের ইতিহাস তুলে ধরা। তার মধ্যে যেমন পড়বে সাহিত্য, তেমনি শিল্পকর্ম এবং তার সঙ্গে ক্রীড়াক্ষেত্রে সাফল্যের ইতিহাস উপস্থাপনের মাধ্যমে একটি অঙ্গরাজ্যরূপে পশ্চিমবঙ্গের বিকাশ তুলে ধরা হচ্ছে।

২১১.৬.১৪.১ স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যচর্চাঃ- পশ্চিমবঙ্গে সাহিত্যের ইতিহাস দীর্ঘকালীন। চর্যাপদের সময় থেকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত অনেক গুণী সাহিত্যিক বাংলাসাহিত্যকে অলঙ্কৃত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্যের গতিপথ রুদ্ধ হয়ে যায়নি, বরং তা আরও নতুন দিশা লাভ করেছিল। এই আলোচনাতে আমরা স্বাধীন পশ্চিমবাংলার সাহিত্যিক বিকাশ উল্লেখ করতে বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিকদের সম্পর্কে আলোচনা করব। বিভিন্ন সাহিত্যিকদের মধ্যে নতুন ধরনের চিন্তাভাবনা এই সময়ের সাহিত্যে ফুটে ওঠে।

আনুমানিক খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনার সূত্রপাত হয়। খ্রিষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত বৌদ্ধ দোঁহা-সংকলন চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য ছিল কাব্যপ্রধান। হিন্দুধর্ম, ইসলাম ও বাংলার লৌকিক ধর্মবিশ্বাসগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এই সময়কার বাংলা সাহিত্য। মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, বৈষ্ণব সন্তজীবনী, রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের বঙ্গানুবাদ, পীরসাহিত্য, নাথসাহিত্য, বাউল পদাবলী এবং ইসলামি ধর্মসাহিত্য ছিল এই সাহিত্যের মূল বিষয়। বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত হয় খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণের যুগে কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। এই সময় থেকে ধর্মীয় বিষয়বস্তুর বদলে মানুষ, মানবতাবাদ ও মানব-মনস্তত্ত্ব বাংলা সাহিত্যের প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর বাংলা সাহিত্যও দুটি ধারায় বিভক্ত হয়: কলকাতা-কেন্দ্রিক পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য ও ঢাকা-কেন্দ্রিক পূর্ব পাকিস্তান-বাংলাদেশের সাহিত্য। বর্তমানে বাংলা সাহিত্য বিশ্বের একটি অন্যতম সমৃদ্ধ সাহিত্যধারা হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে।
রবীন্দ্র-প্রভাবের সময়েই কল্লোল নামের একটি সাময়িক পত্রের মাধ্যমে একদল তরুণ কবি-সাহিত্যিকের হাতে পাশ্চাত্য আধুনিকতার পত্তন হয়। অন্যান্য সাময়িক ও সাহিত্য পত্রেও এই আধুনিকতার অগ্নিস্পর্শ লাগে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে ১৯৩০-এর দশক কল্লোর যুগের সমার্থক। কবি বুদ্ধদেব বসু এই নবযুগের অন্যতম কাণ্ডারী। যে সময়ে কল্লোলের আবির্ভাব তখন বাঙলা সাহিত্যের দিগন্ত সর্বকোণে কবি রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে প্রোজ্জ্বল। কল্লোল যুগের নাবিকদের মূল লক্ষ্য ছিল রবীন্দ্র বৃত্তের বাইরে সাহিত্যের একটি মৃত্তিকাসংলগ্ন জগৎ সৃষ্টি করা। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তিতকল্লোল পত্রিকার কর্ণধার ছিলেন দীনেশরঞ্জন দাশ ও গোকুলচন্দ্র নাগ। কল্লোল পত্রিকার আবহে দ্রুত অনুপ্রাণিত হয় প্রগতি, উত্তরা, কালিকলম, পূর্বাশা ইত্যাদি পত্রপত্রিকা। অন্যদিকে আধুনিকতার নামে যথেচ্ছাচারিতা ও অশ্লীলতার প্রশ্রয় দেয়া হচ্ছে এই রকম অভিযোগ এনে শনিবারের চিঠি পত্রিকাটি ভিন্ন বলয় গড়ে তোলে মোহিতলাল মজুমদার, সজনীকান্ত দাস, নীরদ চৌধুরী প্রমুখের সক্রিয় ভূমিকায়। কবিতার ক্ষেত্রে যাদের নাম কল্লোল যুগের শ্রেষ্ঠ নায়ক বিবেচনায় প্রচারিত তাঁরা হলেন কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে। তবে কাজী নজরুল ইসলাম, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত,সঞ্জয় ভট্টাচর্য প্রমুখ অনেকেরই ভূমিকা কোন অংশে খাটো করে দেখবার উপায় নেই।
অচ্যিন্তকুমার সেন রচিত কল্লোল যুগ এ বিষয়ে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ।
একদল প্রতিভাবান তরুণ, যাদের কেন্দ্রে ছিলেন কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের

জগতে একটা ঝড় নিয়ে এলেন ‘কৃত্তিবাস’এর হাত ধরে। কৃত্তিবাস প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালে। বুদ্ধদেব বসুর ‘কবিতা’ পত্রিকা তখনও চলছে। তবু এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যের একটি আন্দোলন তৈরি হয়েছিল এবং কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর কবি বলে একদল নতুন প্রতিভা সামনের সারিতে চলে এসেছিল। সেই সময়ে জীবনানন্দ দাস, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তীর মত আধুনিক ও প্রথম সারির কবিরা বর্তমান। এক দুঃসহ স্পর্ধায় এঁদের থেকে কবিতা না নিয়ে নিতান্ত তরুণদের কবিতা নিয়ে প্রকাশ হতে থাকল কৃত্তিবাস। কবি শঙ্খ ঘোষের খাতা কৃত্তিবাসের জন্য জোর করে নিয়ে এসেছিলেন সুনীল। দেড় দশক ধরে চলা এই পত্রিকাটি নিজেই একটি বিস্ফোরক প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে। পনেরো বছর পরে কৃত্তিবাসের পঁচিশতম সংখ্যা প্রকাশ পায়। ১-২৫ সংখ্যাই কৃত্তিবাসের প্রথম পর্ব বলে ধরা হয়। ষাটের দশকের শুরুতে অ্যালেন গিনসবার্গ এলেন কলকাতায়। কৃত্তিবাসের কবিরা বীটনিক কাব্যের অনুরক্ত হয়ে পড়লেন এবং তাঁদের কবিতা হয়ে উঠল তীব্র, উদাসীন, উন্মত্ত, ক্রুদ্ধ, ভয়ংকর চতুর এবং অতৃপ্ত। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, উৎপল কুমার বসু, তারাপদ রায় প্রমুখরা এই নতুন কবিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেন। ১৯৬৯ সালের পর কৃত্তিবাস দীর্ঘদিন বন্ধ থাকে। এরপর আবার চালু হয় মাসিক পত্রিকা হিসেবে। তখন থেকে কৃত্তিবাস আর শুধু কবিতার পত্রিকা থাকে না, গদ্যও সমান তালে ছাপা হতে থাকে। বর্তমানেও সুনীলের প্রয়াণের পরে কয়েক বছর কৃত্তিবাস পত্রিকা চলার পর একদম পাকাপাকি ভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার গুজব ছড়িয়েছে। কিন্তু এতদিনে কৃত্তিবাস তার সেই দুরন্ত ছেলের তকমা হারিয়েছে। প্রথম পর্বের কৃত্তিবাস নিয়েও অশ্লীলতার অভিযোগ ওঠে। অতি চিৎকারের অভিযোগ ওঠে। সেই বোহেমিয়ানার ঘোর কেটে গিয়ে কৃত্তিবাস তার গৌরব হারায়।
বাংলা সাহিত্যে স্হিতাবস্হা ভাঙার আওআজ তুলে, ইশতাহার প্রকাশের মাধ্যমে, শিল্প ও সাহিত্যের যে একমাত্র আন্দোলন হয়েছে, তার নাম হাংরি আন্দোলন, যাকে অনেকে বলেন হাংরিয়ালিস্ট, ক্ষুধিত, ক্ষুৎকাতর, ক্ষুধার্ত আন্দোলন। আর্তি বা কাতরতা শব্দগুলো মতাদর্শটিকে সঠিক তুলে ধরতে পারবে না বলে, আন্দোলনকারীরা শেষাবধি হাংরি শব্দটি গ্রহণ করেন। হাংরি আন্দোলন, এই শব্দবন্ধটি বাংলাভাষায় ঠিক সেভাবে প্রবেশ করেছে যে ভাবে মুসলিম লিগ, কম্যুনিস্ট পার্টি বা কংগ্রেস দল ইত্যাদি সংকরায়িত শব্দবন্ধগুলো। উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে ডিসকোর্সের সংকরায়ণকে স্বীকৃতি দেয়া তাঁদের কর্মকাণ্ডের অংশ ছিল। ১৯৬১ সালের নভেম্বরে পাটনা শহর থেকে একটি ইশতাহার প্রকাশের মাধ্যমে হাংরি আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন সমীর রায়চৌধুরী, মলয় রায়চৌধুরী, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং হারাধন ধাড়া ওরফে দেবী রায়। কবিতা সম্পর্কিত ইশতাহারটি ছিল ইংরেজিতে, কেন না পাটনায় মলয় রায়চৌধুরী বাংলা প্রেস পাননি। আন্দোলনের প্রভাবটি ব্যাপক ও গভীর হলেও, ১৯৬৫ সালে প্রকৃত অর্থে হাংরি আন্দোলন ফুরিয়ে যায়। নকশাল আন্দোলনের পর উত্তরবঙ্গ এবং ত্রিপুরার তরুণ কবিরা আন্দোলনটিকে আবার জীবনদান করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাত্ত্বিক ভিত্তিটি জানা না থাকায় তাঁরা আন্দোলনটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি । হাংরি আন্দোলনকারীরা হাংরি শব্দটি আহরণ করেছিলেন ইংরেজি ভাষার কবি জিওফ্রে চসারের ইন দি সাওয়ার হাংরি টাইম বাক্যটি থেকে, অর্থাৎ দেশভাগোত্তর বাঙালির কালখণ্ডটিকে তাঁরা হাংরিরূপে চিহ্নিত করতে চাইলেন। হাংরি আন্দোলনকারীদের মনে হয়েছিল দেশভাগের ফলে ও পরে পশ্চিমবঙ্গ এই ভয়ংকর অবসানের মুখে পড়েছে, এবং উনিশ শতকের মণীষীদের পর্যায়ের বাঙালির আবির্ভাব আর সম্ভব নয়। সেকারণে হাংরি

আন্দোলনকে তঁরা বললেন কাউন্টার কালচারাল আন্দোলন, এবং নিজেদের সাহিত্যকৃতিকে কাউন্টার ডিসকোর্স।

কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর দিকে তাকালে দেখা যাবে যে পুঁজিবলবান প্রাতিষ্ঠানিকতার দাপটে এবং প্রতিযোগী ব্যক্তিবাদের লালনে শতভিষা গোষ্ঠী যেন অস্তিত্বহীন। এমনকি কৃত্তিবাস গোষ্ঠিও সীমিত হয়ে গেছে মাত্র কয়েকজন মেধাসত্তবাধিকারীর নামে। পক্ষান্তরে, ঔপনিবেশিক গণতন্ত্রের আগেকার প্রাকঔপনিবেশিক ডিসকোর্সের কথা ভাবা হয়, তাহলে দেখা যায় যে পদাবলী সাহিত্য নামক ম্যাক্রো পরিসরে সংকুলান ঘটেছে বৈষ্ণব ও শাক্ত কাজ, মঙ্গলকাব্য নামক পরিসরে সংকুলান ঘটেছে মনসা, চণ্ডী, শিব, কালিকা বা ধর্মঠাকুরের মাইক্রো-পরিসর। লক্ষ্মণীয় যে প্রাকৌপনিবেশিক কালখণ্ডে সন্দর্ভ গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তার রচয়িতা নয় । ১৯৬২-৬৩ সালে হাংরি আন্দোলনে যোগদান করেন বিনয় মজুমদার, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, উৎপলকুমার বসু, সুবিমল বসাক, ত্রিদিব মিত্র, ফালগুনী রায়, আলো মিত্র, অনিল করঞ্জাই, রবীন্দ্র গুহ, সুভাষ ঘোষ, করুণানিধান মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ চৌধুরী, সুবো আচার্য, অরুপরতন বসু, বাসুদেব দাশগুপ্ত, সতীন্দ্র ভৌমিক, শৈলেশ্বর ঘোষ, হরনাথ ঘোষ, নীহার গুহ, আজিতকুমার ভৌমিক, অশোক চট্টোপাধ্যায়, অমৃততনয় গুপ্ত, ভানু চট্টোপাধ্যায়, শংকর সেন, যোগেশ পাণ্ডা,মনোহর দাশ, তপন দাশ, শম্ভু রক্ষিত, মিহির পাল, রবীন্দ্র গুহ, সুকুমার মিত্র, দেবাশিষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। অনিল করঞ্জাই এবং করুণনিধান মুখোপাধ্যায় ছিলেন চিত্রকর।
হাংরি আন্দোলনকারিরা প্রধানত একপৃষ্ঠার বুলেটিন প্রকাশ করতেন। যেগুলো পাটনা থেকে প্রকাশিত, সেগুলো ইংরেজিতে লেখা হয়েছিল। কখনও বা পোস্টকার্ড, পোস্টার এবং এক ফর্মার পুস্তিকা প্রকাশ করতেন। এক পাতার বুলেটিনে তঁরা কবিতা, রাজনীতি, ধর্ম, অশ্লীলতা, জীবন, ছোটগল্প, নাটক, উদ্দেশ্য, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে ইশতাহার লেখা ছাড়াও, কবিতা, গদ্য, অনুগল্প, স্কেচ ইত্যাদি প্রকাশ করেছিলেন। বুলেটিনগুলো হ্যান্ডবিলের মতন কলকাতার কলেজ স্টিট কফি হাউস, পত্রিকা দপ্তর, কলেজগুলোর বাংলা বিভাগ ও লাইব্রেরি ইত্যাদিতে তাঁরা বিতরন করতেন। হাংরি আন্দোলনের কথা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার এইটি-ই প্রধান কারণ বলে মনে করেন গবেষকরা। কিন্তু হ্যান্ডবিলের মতন প্রকাশ করায় তাঁরা ঐতিহাসিক ক্ষতি করেছেন নিজেদের, কেন না অধিকাংশ বুলেটিন সংরক্ষণ করা সংগ্রাহকদের পক্ষেও সম্ভব হয়নি।
সুবিমল বসাক, দেবী রায় ও মলয় রায়চৌধুরীর কিছু-কিছু কার্যকলাপের কারণে ১৯৬৩ সালের শেষার্ধে হাংরি আন্দোলন বাঙালির সংস্কৃতিতে প্রথম প্রতিষ্ঠানবিরোধী গোষ্ঠী হিসাবে পরিচিত হয় । এই কারণে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধায়, সতীন্দ্র ভৌমিক প্রমুখ হাংরি আন্দোলন ত্যাগ করেন ।

স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন সাহিত্যিকদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলেনঃ

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১২ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯ – ৮ জুলাই ২০০৩) ছিলেন বিংশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য বাঙালি কবি ও গদ্যকার। কবিতা তাঁর প্রধান সাহিত্যক্ষেত্র হলেও ছড়া, রিপোর্টাজ, ভ্রমণসাহিত্য, অর্থনীতিমূলক রচনা, বিদেশি গ্রন্থের অনুবাদ, কবিতা সম্পর্কিত

আলোচনা, উপন্যাস, জীবনী, শিশু ও কিশোর সাহিত্য সকল প্রকার রচনাতেই তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সম্পাদনা করেছেন একাধিক গ্রন্থ এবং বহু দেশি-বিদেশি কবিতা বাংলায় অনুবাদও করেছেন।কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম অধুনা পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে মামাবাড়িতে। তার পিতার নাম ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মা যামিনী দেবী। পিতা ছিলেন সরকারি আবগারি বিভাগের কর্মচারী; তাঁর বদলির চাকরির সুবাদে কবির ছেলেবেলা কেটেছিল পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে। তাঁর ছেলেবেলার প্রথম দিকটা, যখন তাঁর বয়স তিন-চার, সে সময়টা কেটেছে কলকাতায়, ৫০ নম্বর নেবুতলা লেনে। একটা ভাড়াবাড়ির দোতলায় যৌথ পরিবারের ভিড়ের মধ্যে। প্রথমে নওগাঁর স্কুলে এবং পরে কলকাতার মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন ও সত্যভামা ইনস্টিটিউশনে পড়াশোনা করেন। ভবানীপুরের মিত্র স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে সক্রিয় রাজনীতি করার মানসে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

তিনি বিংশ শতাব্দীর অন্যতম বাঙ্গালী কবি। আধুনিক বাংলা কাব্যজগতে চল্লিশের দশকের অন্যতম কবি হিসেবে চিহ্নিত। ১৯৪০-এ প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘পদাতিক' প্রকাশের মধ্য তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার জগতে নতুন সুর নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে মানুষের বৈষম্যলাঞ্ছিত দুর্দশার বিরূদ্ধে দ্রোহ তাঁর কবিতার মূল সুর। ‘পদাতিক' প্রারম্ভে ছিল ‘প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য কাঠফাঁটা রোদে সেঁকে চামড়া’। কথ্যরীতিতে রচিত তাঁর কবিতা সহজবোধ্যতার কারণে ব্যাপক পাঠকগোষ্ঠীর আনুকূল্য লাভ করে। মানবিক বোধ ও রাজনৈতিক বাণী তার কবিতার অন্যতম প্রধান অভিমুখ। পদাতিক কাব্যগ্রন্থের মে দিনের কবিতা কেবল শ্রমিক শ্রেণির এক বিজয়কাব্য নয়, এতে ব্যক্ত হয়েছে ঔপনিবেশবাদের উচ্ছেদসাধনের ঋজু প্রত্যয় –

“ শতাব্দী লাঞ্ছিত আর্তের কান্না
প্রতি নিঃশ্বাসে আনে লজ্জা;
মৃত্যুর ভয়ে ভীরু বসে থাকা, আর না –
পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা।
প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা,
দুর্যোগে পথ হয়, হোক দুর্বোধ্য
চিনে নেবে যৌবন আত্মা। ”

তার কাব্যভাষা নিরলংকার। নিজ উপলব্ধি ও প্রত্যয় তিনি গদ্যের সুরে ব্যক্ত করেছেন। এক স্বতন্ত্র উজ্জ্বল কণ্ঠস্বর। অগ্রজ আধুনিক কবিদের মতো তিনি দুর্বোধ্য নন, দুরূহ নন। সহজেই তাঁর কবিতা পড়া যায়, বোঝা যায় এবং অনুভব করা যায়। চল্লিশের যুদ্ধ-দাঙ্গা-তেভাগা-মন্বন্তর সঙ্কুলিত রাজনৈতিক টালমাটালের যুগসন্ধিক্ষণে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন—

“ ‘আমি আসছি—
দুহাতে অন্ধকার ঠেলে ঠেলে আমি আসছি।
সঙীন উদ্যত করেছ কে? সরাও।
বাধার দেয়াল তুলেছ কে? সরাও।
সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আমি আনছি ”

দূরন্ত দুর্নিবার শান্তি।'

জগৎজুড়ে যে পথে 'শান্তি' আনা সম্ভব, সেই পথেররেখা তাঁর কাছে ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। তাঁর কবিতায় সেই পথনির্দেশিকাও আছে। কবিতাটির নাম, 'বাঁয়ে চলো, বাঁয়ে'—

"
'বাঁয়ে চলো ভাই,
বাঁয়ে—
কালো রাত্রির বুক চিরে,
চলো
দুহাতে উপড়ে আনি
আমাদেরই লাল রক্তে রঙিন সকাল।' "

কখনো কখনো প্রতীয়মান হয় তার কবিতা চড়া সুরে বাঁধা। চল্লিশের দশক থেকে তাঁর অ-রোম্যান্টিক গদ্যপ্রধান কাব্যভঙ্গী পরবর্তীকালের কবিদের কাছে অনুসরণীয় হয়ে ওঠে। সমাজের তৃণমূল স্তরে নেমে গিয়ে সেই সমাজকে প্রত্যক্ষ করে তবেই কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হতেন তিনি। আদর্শ তাঁর কবিতাকে দিয়েছিল পরিব্যাপ্ত জনপ্রিয়তা। তবে কবিতার মাধ্যমে একটি বার্তা পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে গিয়ে তিনি অক্ষরবৃত্তের চালে আধুনিক কবিতার গদ্যঋদ্ধ নতুন রূপ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার পর কারাবন্দী হন তিনি। এ পর্যায়ে লিখেছিলেন 'শতাব্দীলাঞ্ছিত আর্তের কান্না/ প্রতি নিশ্বাসে আনে লজ্জা।' বেশ কিছু সময় পরে আবার লিখেছিলেন 'লেনিন যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললেন,/ শতাব্দী শেষ হয়ে আসছে—/ একটু পা চালিয়ে, ভাই, একটু পা চালিয়ে।।' তার কাব্যভাষায় প্রচলিত ছন্দের কাঠামো ছিল না। তবে ছিল ছন্দের প্রাণবন্ত স্পন্দন।

পদাতিক

এ গ্রন্থের বধূ কবিতায় রবীন্দ্রনাথের স্নিগ্ধ রোম্যান্টিকতার বিপরীত ধ্বনি শোনা যায়; কতকটা কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো গানের অনুষঙ্গে –

"
ইহার মাঝে কখন প্রিয়তম
উধাও; লোক লোচন উঁকি মারে
সবার মাঝে একলা ফিরি আমি
-লেকের জলে মরণ যেন ভালো। "

চিরকুট

চিরকুট কাব্যটি বাংলা ফ্যাসিবিরোধী সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। শুধু ফ্যাসিবিরোধিতাই নয়, এই কাব্যে উঠে এসেছে ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের স্মৃতি। স্ফুলিঙ্গ, জবাব চাই, প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার, ফের আসবো, এই আশ্বিনে, চিরকুট প্রভৃতি কবিতায় আছে বিশ্বাস, বলিষ্ঠতা, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ আবার আবেগের বিধুরতাও। ঘোষণা কবিতায় দেখা যায় –

"
গঙ্গার জোয়ার এসে লাগে
ভল্লার তীরের স্পর্শ, "

চোখে নব সূর্যোদয় জাগে;
মুক্তি আজ বীরবাহু
শৃঙ্খল মেনেছে পরাভব;
দিগন্তে দিগন্তে দেখি
বিস্ফোরিত আসন্ন বিপ্লব।

অগ্নিকোণ

১৯৪৮ সালে পার্টির দৈনিকের টাকা তোলার জন্য কবি লেখেন মাত্র পাঁচটি কবিতার সংকলন অগ্নিকোণ। কবির ভাষায়, "রাজনীতিকে সঙ্গে নিয়ে রাজনীতির জন্যেই অগ্নিকোণের প্রকাশ"।এই কাব্যে কবি উদ্বেল হয়েছেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুক্তিসংগ্রামের সংবাদে –

"
লক্ষ লক্ষ হাতে
অন্ধকারকে দু'টুকরো ক'রে
অগ্নিকোণের মানুষ
সূর্যকে ছিঁড়ে আনে। "

অগ্নিকোণ ও ফুল ফুটুক কাব্য রচনার মধ্যবর্তী সময়ে কবি উপলব্ধি করেন এক চরম নান্দনিক সত্য:

" সেই শিল্পই খাঁটি শিল্প, যার দর্পণে জীবন প্রতিফলিত। তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে যা কিছু সংঘাত সংগ্রাম আর প্রেরণা, জয়, পরাজয় আর জীবনের ভালোবাসা, খুঁজে পাওয়া যাবে একটি মানুষের সব কটি দিক। সেই হচ্ছে খাঁটি শিল্প যা জীবন সম্পর্কে মানুষকে মিথ্যা ধারণা দেয় না। কবিতার গদ্যের আর কথা বলবার ভাষার বিভিন্নতা নতুন কবি স্বীকার করেন না। এমন এক ভাষায় তিনি লেখেন – যা বানানো নয়, কৃত্রিম নয়, সহজ, প্রাণবন্ত, বিচিত্র গভীর, একান্ত জটিল – অর্থাৎ অনাড়ম্বর সেই ভাষা। "

এই সত্য প্রতিফলিত হয় তাঁর পরবর্তীকালের কাব্যগুলিতে। কমিউনিজমের বাঁধা বুলি ছেড়ে তিনি চিত্রকল্প নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষায় রত হন এই কাব্যগুলিতে। ফুল ফুটুক কাব্যের আরও একটা দিন কবিতায় অন্ধকারের এক আশ্চর্য ছবি আঁকেন কবি,

"
জলায় এবার ভাল ধান হবে –
বলতে বলতে পুকুরে গা ধুয়ে
এ বাড়ির বউ এল আলো হাতে
সারাটা উঠোন জুড়ে
অন্ধকার নাচাতে নাচাতে।

আশাপূর্ণা দেবী (৮ই জানুয়ারি, ১৯০৯ – ১৩ই জুলাই, ১৯৯৫) বিশিষ্ট ভারতীয় বাঙালি ঔপন্যাসিক, ছোটোগল্পকার ও শিশুসাহিত্যিক। বিংশ শতাব্দীর বাঙালি জীবন, বিশেষত সাধারণ মেয়েদের জীবনযাপন ও মনস্তত্ত্বের চিত্রই ছিল তাঁর রচনার মূল উপজীব্য। ব্যক্তিজীবনে নিতান্তই এক আটপৌরে মা ও গৃহবধূ আশাপূর্ণা ছিলেন পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা। বাংলা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও ভাষায় তাঁর জ্ঞান ছিল

না। বঞ্চিত হয়েছিলেন প্রথাগত শিক্ষালাভেও। কিন্তু গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণশক্তি তাঁকে দান করে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখিকার আসন। তাঁর প্রথম প্রতিশ্রুতি-সুবর্ণলতা-বকুলকথা উপন্যাসত্রয়ী বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির অন্যতম বলে বিবেচিত হয়। তাঁর একাধিক কাহিনি অবলম্বনে রচিত হয়েছে জনপ্রিয় চলচ্চিত্র। দেড় হাজার ছোটোগল্প ও আড়াইশো-র বেশি উপন্যাসের রচয়িতা আশাপূর্ণা সম্মানিত হয়েছিলেন জ্ঞানপীঠ পুরস্কার সহ দেশের একাধিক সাহিত্য পুরস্কার, অসামরিক নাগরিক সম্মান ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রিতে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে প্রদান করেন পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ সম্মান রবীন্দ্র পুরস্কার। ভারত সরকার তাঁকে ভারতের সর্বোচ্চ সাহিত্য সম্মান সাহিত্য অকাদেমি ফেলোশিপে ভূষিত করেন।

মহাশ্বেতা দেবী (১৪ জানুয়ারি, ১৯২৬ – ২৮ জুলাই, ২০১৬) ছিলেন একজন ভারতীয় বাঙালি কথাসাহিত্যিক ও মানবাধিকার আন্দোলনকর্মী। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল হাজার চুরাশির মা, রুদালি, অরণ্যের অধিকার ইত্যাদি। মহাশ্বেতা দেবী ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তীসগঢ় রাজ্যের আদিবাসী উপজাতিগুলির (বিশেষত লোধা ও শবর উপজাতি) অধিকার ও ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করেছিলেন। তিনি সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (বাংলায়), জ্ঞানপীঠ পুরস্কার ও র‍্যামন ম্যাগসাইসাই পুরস্কার সহ একাধিক সাহিত্য পুরস্কার এবং ভারতের চতুর্থ ও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান যথাক্রমে পদ্মশ্রী ও পদ্মবিভূষণ লাভ করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান বঙ্গবিভূষণে ভূষিত করেছিল।

সাহিত্যকর্ম

মহাশ্বেতা দেবী ১০০টিরও বেশি উপন্যাস এবং ২০টিরও বেশি ছোটোগল্প সংকলন রচনা করেছেন। তিনি মূলত বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন। তবে সেই সব রচনার মধ্যে অনেকগুলি অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে।তাঁর প্রথম উপন্যাস ঝাঁসির রানি ঝাঁসির রানির (লক্ষ্মীবাই) জীবনী অবলম্বনে রচিত। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৬ সালে। এই উপন্যাসটি রচনার আগে তিনি ঝাঁসি অঞ্চলে গিয়ে তাঁর রচনার উপাদান হিসেবে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে তথ্য ও লোকগীতি সংগ্রহ করে এনেছিলেন।

১৯৬৪ সালে মহাশ্বেতা দেবী বিজয়গড় কলেজে (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত কলেজ) শিক্ষকতা শুরু করেন। সেই সময় বিজয়গড় কলেজ ছিল শ্রমিক শ্রেণির ছাত্রীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এই সময় মহাশ্বেতা দেবী একজন সাংবাদিক ও একজন সৃজনশীল লেখক হিসেবেও কাজ চালিয়ে যান। তিনি পশ্চিমবঙ্গের লোধা ও শবর উপজাতি, নারী ও দলিতদের নিয়ে পড়াশোনা করেন। তাঁর প্রসারিত কথাসাহিত্যে তিনি প্রায়শই ক্ষমতাশালী জমিদার, মহাজন ও দুর্নীতিগ্রস্থ সরকারি আধিকারিকদের হাতে উপজাতি ও অস্পৃশ্য সমাজের অকথ্য নির্যাতনের চিত্র অঙ্কন করেছেন। তাঁর অনুপ্রেরণার উৎস সম্পর্কে তিনি লিখেছেন:

> “ আমি সর্বদাই বিশ্বাস করি যে, সত্যকারের ইতিহাস সাধারণ মানুষের দ্বারা রচিত হয়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সাধারণ মানুষ যে লোককথা, লোকগীতি, উপকথা ও কিংবদন্তিগুলি বিভিন্ন আকারে বহন করে চলেছে, তার পুনরাবির্ভাবের সঙ্গে আমি ক্রমাগত পরিচিত হয়ে এসেছি। ... আমার লেখার কারণ ও অনুপ্রেরণা হল সেই মানুষগুলি যাদের পদদলিত করা হয় ও ব্যবহার করা হয়, অথচ যারা হার মানে না। আমার কাছে লেখার উপাদানের অফুরন্ত উৎসটি হল এই আশ্চর্য মহৎ ব্যক্তিরা, এই অত্যাচারিত

মানুষগুলি। অন্য কোথাও আমি কাঁচামালের সন্ধান করতে যাব কেন, যখন আমি তাদের জানতে শুরু করেছি? মাঝে মাঝে মনে হয়, আমার লেখাগুলি আসলে তাদেরই হাতে লেখা।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯ অক্টোবর ১৯২৪-২৫ ডিসেম্বর ২০১৮) ছিলেন একজন ভারতীয় বাঙ্গালি কবি। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আবির্ভুত আধুনিক বাংলা কবিদের অন্যতম। উলঙ্গ রাজা তাঁর অন্যতম বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যগ্রন্থ লেখার জন্য তিনি ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। কবি পশ্চিমবঙ্গে বাংলা আকাদেমির সাথে দীর্ঘকাল যুক্ত।

১৯৫১ সালে যোগ দিয়েছিলেন 'আনন্দবাজার' পত্রিকায়। দীর্ঘ সময় তিনি 'আনন্দমেলা' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। নীরেন্দ্রনাথের প্রথম কবিতার বই 'নীল নির্জন', প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৪ সালে। এরপর প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লেখা 'অন্ধকার বারান্দা', 'নিরক্ত করবী', 'নক্ষত্র জয়ের জন্য', 'আজ সকালে'সহ অসংখ্য কবিতার বই। সাহিত্য অ্যাকাদেমি পুরস্কারসহ বহু পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে বঙ্গবিভূষণ সম্মান দিয়ে সম্মানিত করেছিল।

এই সময়কার সাহিত্যের মধ্যে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানা কথা যেমন উঠে এসেছে তেমনি উঠে এসেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের কথাও। কেবলমাত্র রোমান্টিকতার আবহে আটকে না থেকে সামাজিক বাস্তবতাকে নির্ভীকভাবে ফুটিয়ে তোলা এই সময়কালের সাহিত্যিকদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। কেবল সাহিত্যচর্চাতে আটকে না থেকে রাজনৈতিক ও গনতান্ত্রিক বিভিন্ন কার্যকলাপে নিজেদের যুক্ত করেছেন। সেই ভাবে পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য একটি নতুন ধরনের দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বিশ শতকের শেষভাগে সক্রিয় একজন প্রথিতযশা বাঙালি সাহিত্যিক। ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুর পূর্ববর্তী চার দশক তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব হিসাবে সর্ববৈশ্বিক বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর কাছে ব্যাপকভাবে পরিচিত ছিলেন। বাংলাভাষী এই ভারতীয় সাহিত্যিক একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটোগল্পকার, সম্পাদক, সাংবাদিক ও কলামিস্ট হিসাবে অজস্র স্মরণীয় রচনা উপহার দিয়েছেন। তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার জীবনানন্দ-পরবর্তী পর্যায়ের অন্যতম প্রধান কবি। একই সঙ্গে তিনি আধুনিক ও রোমান্টিক। তাঁর কবিতার বহু পঙ্‌ক্তি সাধারণ মানুষের মুখস্থ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় "নীললোহিত", "সনাতন পাঠক", "নীল উপাধ্যায়" ইত্যাদি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম অধুনা বাংলাদেশের মাদারীপুরে। মাত্র চার বছর বয়সে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। ১৯৫৩ সাল থেকে তিনি কৃত্তিবাস নামে একটি কবিতা পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেন। ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ একা এবং কয়েকজন এবং ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম উপন্যাস আত্মপ্রকাশ প্রকাশিত হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বই হল আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি, যুগলবন্দী (শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে), হঠাৎ নীরার জন্য, রাত্রির রঁদেভূ, শ্যামবাজারের মোড়ের আড্ডা, অর্ধেক জীবন, অরণ্যের দিনরাত্রি, অর্জুন, প্রথম আলো, সেই সময়, পূর্ব পশ্চিম, ভানু ও রাণু, মনের মানুষ ইত্যাদি। শিশুসাহিত্যে তিনি "কাকাবাবু-সন্তু" নামে এক জনপ্রিয় গোয়েন্দা সিরিজের রচয়িতা। মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত তিনি ভারতের জাতীয় সাহিত্য প্রতিষ্ঠান সাহিত্য অকাদেমি ও পশ্চিমবঙ্গ শিশুকিশোর আকাদেমির সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

নীললোহিত সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম। নীললোহিতের মাধ্যমে সুনীল নিজের একটি পৃথক সত্বা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। নীললোহিতের সব কাহিনিতেই নীললোহিতই কেন্দ্রীয় চরিত্র। সে নিজেই কাহিনিটি বলে চলে আত্মকথার ভঙ্গিতে। সব কাহিনিতেই নীললোহিতের বয়স সাতাশ। সাতাশের বেশি তাঁর বয়স বাড়ে না। বিভিন্ন কাহিনিতে দেখা যায় নীললোহিত চিরবেকার। চাকরিতে ঢুকলেও সে বেশি দিন টেঁকে না। তাঁর বাড়িতে মা এবং দাদা বৌদি রয়েছেন। নীললোহিতের বহু কাহিনিতেই দিকশূন্যপুর বলে একটি জায়গার কথা শোনা যায়। যেখানে বহু শিক্ষিত সফল মানুষ কিন্তু জীবন সম্পর্কে নিস্পৃহ একাকী জীবন যাপন করেন।

তথ্যসূত্রঃ-http://www.bombayduckmag.com/bd/Article/43/তুষ্টি_ভট্টাচার্য_স্বাধীনতা-পরবর্তী_পশ্চিমবঙ্গের_সাহিত্য_আন্দোলন

Wikipedia and other internet sources.

২১১.৬.১৫.২ বিনোদনমূলক কার্যকলাপঃ-

২১১. ৬.১৫.২.১ বাংলা নাটকের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

বাংলা নাটককে দুইভাগে ভাগ করা যায় ১.অভিনয়, ২.রচনা।

এবং বাংলা নাটকের যুগকে তিনভাগে ভাগ করা হয় ।

প্রথম যুগ — ১৮৫২ থেকে ১৮৭২ খ্রিঃ পর্যন্ত ।

দ্বিতীয় যুগ — ১৮৭২ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত ।

তৃতীয় যুগ — ১৯৪২ থেকে আজ পর্যন্ত ।

প্রথম বাংলা মৌলিক নাটক হল জি.সি.গুপ্তের—"কির্তীবিলাস" এবং তারাচরণ সিকদারের — "ভদ্রার্জুন" এগুলি প্রকাশিত হয় ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে।

বাংলা নাটকের তৃতীয় যুগ ~ ১৯৪২ খ্রিঃ থেকে আজ পর্যন্ত সময়কে বলা হয় বাংলা নাটকের তৃতীয় যুগ ।এই যুগের নাট্যকার হলেন — তুলসী লাহিড়ী,বিজন ভট্টাচার্য্য।এই যুগের শ্রেষ্ঠ নাটক

হল — "ছেঁড়া তার" —তুলসী লাহিড়ী।

"নবান্ন" — বিজন ভট্টাচার্য্য।

এই যুগের নাট্যকারদের নাটকে সাধারণ মানুষের জীবন-সমস্যাই বেশি রূপ পেয়েছে। কৃষক,শ্রমিক,বস্তিবাসী,ঝুপড়িবাসী,প্রভৃতি চরিত্র নাট্যকারের সহানুভূতির স্পর্শে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

◉আধুনিক যুগের বাংলাদেশে নবনাট্য আন্দোলনের যে সূত্রপাত তার প্রথম প্রকাশ বিজন ভট্টাচার্য্যের নাটকের মধ্যে।তাই এই শ্রেণির নাটক রচনার পথিকৃৎ তিনিই।

◉বিজন ভট্টাচার্য্যের এই শ্রেণির নাটকের দ্বারাই তাঁর ও তাঁর পরবর্তী নাটকের ধারা জনজীবনের সঙ্গে হার্দিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল।

বাংলা ভাষায় অভিনীত থিয়েটারকেই প্রাথমিকভাবে **বাংলা থিয়েটার** বুঝায়। বাংলা থিয়েটার প্রধানত পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশে সঞ্চালিত হয়। সম্ভবত এই শব্দটি কিছু হিন্দি থিয়েটারকেও বুঝাতে পারে যা বাঙালি জনগণের দ্বারা গৃহীত হয়েছে।

ব্রিটিশ শাসনের সময়ে বাংলা থিয়েটারের উৎপত্তি হয়েছে। ১৯ শতকের প্রথম দিকে ব্যক্তিগত বিনোদন হিসাবে এটি শুরু হয়েছিল।স্বাধীনতার প্রাক্কালে, বাংলা থিয়েটারগুলি ব্রিটিশ রাজের অপছন্দের বিষয়গুলি প্রকাশের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৪৭

সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী আন্দোলন থিয়েটারকে সামাজিক সচেতনতার একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিল। থিয়েটার কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য এখনো যোগ করেছে এবং সেগুলির শক্তিশালী প্রভাব আছে। এই দলগুলো বাণিজ্যিক বাংলা থিয়েটার থেকে মতাদর্শগতভাবে নিজেদের পার্থক্য বজায় রেখেছে।

পশ্চিমবঙ্গের অনেক থিয়েটারগুলিকে বিস্তৃতভাবে কলকাতা ভিত্তিক থিয়েটার এবং গ্রামীণ থিয়েটারে ভাগ করা যায়। বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের বাইরে, "বাংলা থিয়েটার" শব্দটি মূলত কলকাতা ভিত্তিক গোষ্ঠীকে বোঝায়, যেহেতু পল্লী থিয়েটার কম সুবিখ্যাত। দুই ধরনের থিয়েটারের ফর্ম এবং কন্টেন্ট অনুরূপ, কিন্তু কলকাতা-ভিত্তিক থিয়েটারগুলিতে ভাল তহবিল এবং অভিনেতা-অভিনেত্রী যুক্ত থাকে। এর প্রধান কারণ হল একটি বৃহত্তর দর্শকের কাছে অভিনয়ের জন্য কলকাতায় গ্রামাঞ্চলে থেকে দক্ষ শিল্পীদের আগমন।

এছাড়াও বাংলা লোক থিয়েটারগুলিও রয়েছে। এই সব লোক থিয়েটারগুলিতে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে কথিত বাংলা ভাষার অনেক উপভাষা উচ্চারিত হয়। বৃহত্তর বাংলা থিয়েটার কলকাতায় কথিত উপভাষা ব্যবহার করে আর বাংলা লোক থিয়েটারগুলি অন্যান্য উপভাষায় অভিনয় করা হয়ে থাকে।

বাংলার পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে চালানো যাত্রা নামে আরেকটি বাঙালি বা বাংলা থিয়েটার রয়েছে। যাত্রার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি প্রথাগত বাদ্যযন্ত্রের বিস্তৃত ব্যবহার ও অতি-অভিনব। বর্তমানে গল্পগুলির সংকটের জন্য যাত্রার আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। অনেক জনপ্রিয় বাঙালি চলচ্চিত্র শিল্পীরা যাত্রায় অংশ নেয়।

হিন্দী থিয়েটার যা বাঙ্গালী জনগণের দ্বারা গৃহীত হয়, ১৯৯৫ সালে শ্যামনান্দ্র জালানের অধীনে অনামিকা দিয়ে শুরু করে উষা গাঙ্গুলী পরিচালিত রংগাকারমী (১৯৭৬) এবং পাদটিক (১৯৭২) পদাতিক দ্বারা প্রযোজনা করা হয়েছে।

১৯ শতকের শেষের দিকে এবং ২০ তম শতাব্দীতে থিয়েটারগুলির নিজস্ব বাংলা সঙ্গীত ছিল। এই থিয়েটার সঙ্গীত বিষয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ অগ্রণী ছিল; তার আগে বাংলা থিয়েটারের যুগে থিয়েটার সঙ্গীতের ভিত্তি স্থাপন হয়েছিল, এবং তার মৃত্যুর পর বাংলা থিয়েটার সঙ্গীত আরো পরীক্ষামূলক হয়ে ওঠে। গিরিশ চন্দ্রের যুগে, সমস্ত স্তর-নাটকগুলিতে কিছু প্রথাগত বাংলা সংগীত, এবং নৃত্য-গায়ক, যেগুলি নাটকগুলি শুরু হওয়ার আগে এবং নাটকের মধ্যে ব্যবহার করা হত। পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে কীর্তনাঙ্গের গান থাকবে, মহাকাব্যগুলিতে খ্যামটার মতো আদিবাসী শৈলী অন্তর্ভুক্ত হবে, এবং কমেডি এবং নাটকীয় নাটকগুলির মধ্যে প্রায়ই নিধু বাবু দ্বারা টপ্পা গানগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়।

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি

বিজন ভট্টাচার্য ফরিদপুর জেলার খানখানাপুরে ১৯০৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ক্ষীরোদবিহারী ভট্টাচার্য ছিলেন একজন স্কুলশিক্ষক। ভূস্বামী পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতার কর্মসূত্রে বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করার সুবাদে তিনি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হন।

জন ভট্টাচার্যের নাট্যজীবনের শুরু হয় ১৯৪০ এর দশকে। প্রচলিত বাণিজ্যিক থিয়েটারের ধারার বাইরে স্বতন্ত্র নাট্য আন্দোলনের সূচনা করেন কিছু ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক শিল্পী গোষ্ঠী । এঁদেরই সাংস্কৃতিক শাখা ছিল ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বা ইণ্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার

অ্যাসোসিয়েসন যা আইপিটিএ নামে বেশি পরিচিত। বিজন ভট্টাচার্য ছিলেন এই গণনাট্য সঙেঘর প্রথম সারির নাট্যকর্মী। চিন্তা, চেতনা এবং সংগ্রামের প্রগতিশীল চিন্তা ভাবনার দিশারী ছিল ভারতীয় গণনাট্য সঙঘ। বিজন ভট্টাচার্যের নাটক রচনা, অভিনয় এবং নির্দেশনা সাফল্য লাভ করেছিল এই গণনাট্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।

গণনাট্য সঙেঘর (সেই সময় ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সঙঘ) প্রথম নাটক আগুন বিজন ভট্টাচার্যের রচনা । এই নাটকটি ১৯৪৩ সালে মঞ্চস্থ হয়েছিল। ১৯৪৪ সালে তাঁর লেখা নাটক জবানবন্দী এবং নবান্ন অভিনীত হয়েছিল। এই নাটকগুলিতে তিনি প্রধান অভিনেতা এবং নির্দেশকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

১৯৪৪ সালের ২৪ অক্টোবর শ্রীরঙ্গম মঞ্চে নবান্নের প্রথম অভিনয় হয়। এই নাটকটির পটভূমিকা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অস্থিরতা, ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন, পঞ্চাশের মন্বন্তর এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ। গণনাট্য আন্দোলন এবং বিজন ভট্টাচার্যের নাটক বাংলা নাটক রচনা এবং অভিনয়ের এক যুগবদলের সূচনা করে।

১৯৪৮ সাল থেকে গণনাট্য সঙেঘর সঙ্গে বিজন ভট্টাচার্যের মতান্তর ঘটে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ তিনি বোম্বাইতে হিন্দি সিনেমার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। ১৯৫০ সালে তিনি আবার বাংলায় ফিরে আসেন এবং নিজের নাটকের দল ক্যালকাটা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। এখানেও তিনি নাট্যকার, প্রধান অভিনেতা এবং নির্দেশকের ভূমিকা পালন করেন। এই থিয়েটারে তাঁর রচিত নাটকের মধ্যে অন্যতম ছিল কলঙ্ক, গোত্রান্তর, মরাচাঁদ, দেবী গর্জন, গর্ভবতী জননী প্রভৃতি।

১৯৭০ সালে তিনি ক্যালকাটা থিয়েটার ছেড়ে দিয়ে কবচ-কুণ্ডল নামে নতুন দল গঠন করেন। এখানে তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল কৃষ্ণপক্ষ, আজবসন্ত, চলো সাগরে, লাস ঘুইর‍্যা যাউক প্রভৃতি।

বিজন ভট্টাচার্য মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। কৃষক শ্রমিক মেহনতী মানুষের জীবন সংগ্রামের কথা ও বাঁচবার কথা তাঁর নাটকগুলির মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে তিনি এই ভাবনা থেকে সরে যান। গণনাট্য সঙঘ ত্যাগ এবং নিজের নাটকের দল একাধিক বার ভেঙে গড়ে তিনি তৈরি করেন। ক্রমে মার্কসীয় দর্শনের পরিবর্তে বা সঙ্গে তাঁর রচনায় লোকায়ত ধর্ম দর্শন, হিন্দু ধর্মের সমন্বয় প্রয়াসী মানসিকতা কাজ করেছিল। চিরকালীন মাতৃকা ভাবনা তাঁর নাটকে প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়।

অভিনেতা হিসাবে বিজন ভট্টাচার্য অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। নানারকম চরিত্রকে মূর্ত করে তুলতে তিনি দক্ষ ছিলেন । নানা উপভাষার সংলাপ উচ্চারণেও তিনি সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য চরিত্রের মধ্যে ছিল বেন্দা (জবানবন্দী), প্রধান সমাদ্দার (নবান্ন), পবন ও কেতকাদাস (মরাচাঁদ), হরেন মাস্টার (গোত্রান্তর), প্রভঞ্জন (দেবীগর্জন), মামা (গর্ভবতী জননী), কেদার (আজ বসন্ত), সুরেন ডাক্তার (চলো সাগরে) প্রভৃতি।

নাট্যনির্দেশক হিসাবেও তিনি সমান সফল ছিলেন। গণনাট্য সঙেঘ তাঁর নাটক জবানবন্দী এবং নবান্ন ছিল অসাধারণ দুটি প্রযোজনা। পরে তিনি তাঁর নিজের গ্রুপ থিয়েটারেও বহু নাটকের সফল প্রযোজক এবং নির্দেশক ছিলেন।

উৎপল দত্ত (২৯ মার্চ ১৯২৯ - ১৯ আগস্ট ১৯৯৩) হলেন একজন বাঙালি অভিনেতা, চলচ্চিত্র পরিচালক ও লেখক। তার জন্ম অবিভক্ত বাংলার বরিশালে (বর্তমানে বাংলাদেশের অংশ)। তিনি কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ইংরেজি বিষয়ে পড়াশোনা করেন।

উৎপল দত্ত প্রথম দিকে বাংলা মঞ্চ নাটকে অভিনয় করতেন। তিনি শেক্সপিয়ার আন্তর্জাতিক থিয়েটার কোম্পানির সাথে ভ্রমণ করেছেন বেশ কয়েকবার। তাঁকে গ্রূপ থিয়েটার অঙ্গনের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের অন্যতম হিসাবে গন্য করা হয়। কৌতুক অভিনেতা হিসাবেও তাঁর খ্যাতি রয়েছে। তিনি হিন্দি কৌতুক চলচ্চিত্র গুড্ডি, গোলমাল ও শৌখিনে অভিনয় করেছেন। তিনি সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় হীরক রাজার দেশে, জয় বাবা ফেলুনাথ এবং আগন্তুক সিনেমায় অভিনয় করেছেন। মননশীল ছবি ছাড়াও অজস্র বাণিজ্যিক বাংলা ছবিতে খলনায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন উৎপল দত্ত। রাজনৈতিক দর্শনের দিক থেকে তিনি ছিলেন বামপন্থী ও মার্ক্সবাদী।

উৎপল দত্তের বিখ্যাত নাটকের মধ্যে রয়েছে টিনের তলোয়ার, মানুষের অধিকার, দিল্লী চলো, ছায়ানট(১৯৫৮), অঙ্গার(১৯৫৯), ফেরারীফৌজ(১৯৬১), ঘুমনেই(১৯৬১), মেদিবস(১৯৬১), দ্বীপ(১৯৬১), স্পেশাল ট্রেন(১৯৬১), নীলকন্ঠ(১৯৬১), ভি.আই.পি (১৯৬২), মেঘ(১৯৬৩), রাতের অতিথি(১৯৬৩), সমাজতান্ত্রিক চাল(১৯৬৫), কল্লোল(১৯৬৫),হিম্মৎবাই(১৯৬৬),রাইফেল(১৯৬৮),মানুষের অধিকার(১৯৬৮),জালিয়ানওয়ালাবাগ(১৯৬৯),মাও-সে-তুং(১৯৭১),পালা-সন্ন্যাসীর তরবারি(১৯৭২),বৈশাখী মেঘ(১৯৭৩),দুঃস্বপ্নের নগরী(১৯৭৪)সীমান্ত প্রভৃতি।

শম্ভু মিত্র (২২ অগস্ট, ১৯১৫ – ১৯ মে, ১৯৯৭) ছিলেন বাংলা তথা ভারতীয় নাট্যজগতের এক কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব, স্বনামধন্য আবৃত্তিশিল্পী ও চলচ্চিত্র অভিনেতা। ১৯৩৯ সালে বাণিজ্যিক নাট্যমঞ্চে যোগ দেন। পরে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সদস্য হন। ১৯৪৮ সালে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে গড়ে তোলেন নাট্যসংস্থা বহুরূপী। ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বহুরূপীর প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সফোক্লিস, হেনরিক ইবসেন, তুলসী লাহিড়ী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নাট্যকারের রচনা তাঁর পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। শম্ভু মিত্রের স্ত্রী তৃপ্তি মিত্র ও কন্যা শাঁওলী মিত্রও স্বনামধন্য মঞ্চাভিনেত্রী। শাঁওলি মিত্রের নাট্যসংস্থা পঞ্চম বৈদিকের সঙ্গে আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন শম্ভু মিত্র। তাঁর পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল নবান্ন, দশচক্র, রক্তকরবী, রাজা অয়দিপাউস ইত্যাদি। তাঁর রচিত নাটকের মধ্যে চাঁদ বণিকের পালা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৬ সালে নাটক ও সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য তাঁকে ম্যাগসেসে পুরস্কার ও ভারত সরকারের পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত করা হয়।

শম্ভু মিত্রের জন্ম কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে মাতামহ ডাঃ আদিনাথ বসুর গৃহে। তাঁর পিতার নাম শরৎকুমার বসু ও মাতার নাম শতদলবাসিনী দেবী। শম্ভু মিত্রের পৈতৃক নিবাস ছিল হুগলি জেলার কলাছাড়া গ্রামে। বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলে বিদ্যালয় শিক্ষা সমাপ্ত করে ভরতি হন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। তবে কলেজের পাঠ সমাপ্ত করেননি। ১৯৩৯ সালে রংমহলে যোগদানের মাধ্যমে বাণিজ্যিক নাট্যমঞ্চে তাঁর পদার্পণ। পরে যোগ দিয়েছিলেন মিনার্ভায়। নাট্যনিকেতনে কালিন্দী নাটকে অভিনয়ের সূত্রে সেযুগের কিংবদন্তি নাট্যব্যক্তিত্ব শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে আলাপ হয়। পরবর্তীকালে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর প্রযোজনায় আলমগীর নাটকে অভিনয়ও করেছিলেন। কিন্তু এই সময় থেকেই শিশিরকুমারের থেকে আলাদা সম্পূর্ণ নিজস্ব এক নাট্যঘরানা তৈরিতে উদ্যোগী হন শম্ভু মিত্র।

১৯৪২ সালে ফ্যাসিবিরোধী সংঘের সঙ্গে পরিচিত হন শম্ভু মিত্র। ১৯৪৩ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশির অনুপ্রেরণায় যোগ দেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘে। ১৯৪৫ সালের ১০ ডিসেম্বর গণনাট্য সংঘে কাজ করার সময়ই প্রখ্যাত মঞ্চাভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্রের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন শম্ভু মিত্র।

১৯৪৮ সালে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে গঠন করেন বহুরূপী নাট্যগোষ্ঠী। ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বহুরূপীর প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সফোক্লিস, হেনরিক

ইবসেন, তুলসী লাহিড়ী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নাট্যকারের রচনা তাঁর পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। তাঁর এই পরিচালনাগুলি ভারতীয় নাটকের ইতিহাসে এক একটি মাইলফলক হিসেবে পরিগণিত হয়। ১৯৭০ সালে একটি আর্ট কমপ্লেক্স নির্মাণে উদ্দেশ্যে গঠন করেন বঙ্গীয় নাট্যমঞ্চ সমিতি। অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সমিতির প্রযোজনায় ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় মঞ্চস্থ মুদ্রারাক্ষসনাটকে অভিনয়ও করেন। কিন্তু রাজ্য সরকারের অসহযোগিতায় প্রয়োজনীয় জমি না পাওয়া গেলে পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হয়। ১৯৭৬ সালে নাটক ও সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য ম্যাগসেসে পুরস্কার ও ভারত সরকারেরপদ্মভূষণ সম্মান লাভ করেন। ১৯৭৭ সালে এক বছরের জন্য বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং ফেলো হয়েছিলেন। ১৯৭৮ সালের ১৬ জুন অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে দশচক্র নাটকে অভিনয় করেন। বহুরূপীর প্রযোজনায় এটিই তাঁর শেষ নাটক। এই বছরই ১৫ অগস্ট অ্যাকাডেমিতে স্বরচিত চাঁদ বনিকের পালা নাটকটি পাঠ করেন তিনি। এরপর বহুরূপীর আর কোনো প্রযোজনায় তাঁকে দেখা যায়নি।

১৯৭৯ সালে প্রায় দৃষ্টিহীন অবস্থায় নান্দীকার প্রযোজিত মুদ্রারাক্ষস নাটকে চাণক্যের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় বিশেষ সাড়া ফেলেছিল। ১৯৮০-৮১ সালে ফ্রিৎজ বেনেভিৎজের পরিচালনায় ক্যালকাটা রিপোর্টারির প্রযোজনায় গ্যালিলিওর জীবন নাটকে অভিনয় করেন। ১৯৮৩ সালে নিজের প্রযোজনায় কন্যা শাঁওলী মিত্র পরিচালিত নাথবতী অনাথবৎ নাটকে কন্যার সঙ্গে অভিনয় করেন শম্ভু মিত্র। শাঁওলী মিত্রের পরবর্তী নাটক কথা অমৃতসমান-এর সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন শম্ভু মিত্র। কন্যার নাট্যসংস্থা পঞ্চম বৈদিকের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ও আমৃত্যু কর্মসমিতি সদস্য ছিলেন। ১৯৮৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রবীন্দ্রসদনে পঞ্চম বৈদিকের প্রযোজনায় ও তাঁর পরিচালনায় দশচক্র নাটকটির পরপর ছয়টি অভিনয় পাঁচ দিনে মঞ্চস্থ হয়। অভিনেতা রূপে এর পর আর কোনোদিন মঞ্চে অবতীর্ণ হননি তিনি।

১৯৮৩ সালে বিশ্বভারতী তাঁকে দেশিকোত্তম উপাধিতে সম্মানিত করে। যাদবপুর ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডি.লিট. উপাধিতেও ভূষিত করেছিল।

১৯৯৭ সালের ১৯ মে কলকাতার বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন শম্ভু মিত্র। ইচ্ছাপত্র-এ তিনি লিখেছিলেন, "মোট কথা আমি সামান্য মানুষ, জীবনের অনেক জিনিস এড়িয়ে চলেছি, তাই মরবার পরেও আমার দেহটা যেন তেমনই নীরবে, একটু ভদ্রতার সঙ্গে, সামান্য বেশে, বেশ একটু নির্লিপ্তির সঙ্গে গিয়ে পুড়ে যেতে পারে।" এই কারণে সৎকার সমাধা হওয়ার পূর্বে সংবাদমাধ্যমে শম্ভু মিত্রের মৃত্যুসংবাদ প্রচার করা হয়নি।

বহুরূপীর প্রযোজনায় শম্ভু মিত্র পরিচালিত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল: নবান্ন, 'বিভাব' ,ছেঁড়া
তার, পথিক, দশচক্র, চারঅধ্যায়, রক্তকরবী, পুতুলখেলা, মুক্তধারা, কাঞ্চনরঙ্গ, বিসর্জন, রাজা অয়দিপাউস, রাজা, বাকি ইতিহাস, পাগলা ঘোড়া, চোপ আদালত চলছে ইত্যাদি। চাঁদ বণিকের পালা তাঁর রচিত একটি কালজয়ী নাটক। এই নাটকের প্রযোজনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে একাধিক অনুষ্ঠানে তিনি এই নাটক পাঠ করেছেন এবং রেকর্ডও করেছেন। তাঁর রচিত অন্যান্য নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য: উলুখাগড়া, বিভাব, ঘূর্ণি, কাঞ্চনরঙ্গ ইত্যাদি। এছাড়া গর্ভবতী বর্তমান ও অতুলনীয় সংবাদ নামে দুটি একাঙ্ক নাটকও রচনা করেন। নাট্যরচনা ছাড়াও শম্ভু মিত্র পাঁচটি ছোটোগল্প ও একাধিক নাট্যবিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত কাকে বলে নাট্যকলা ও প্রসঙ্গ: নাট্য দুটি বিখ্যাত প্রবন্ধগ্রন্থ।ম্ভু মিত্র ছিলেন বাংলার এক স্বনামধন্য আবৃত্তিশিল্পী। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের মধুবংশীর গলি কবিতাটি আবৃত্তি করে তিনি জনসমাজে বিশেষ সাড়া ফেলেছিলেন। রক্তকরবী, চার অধ্যায়, রাজা অয়দিপাউস, তাহার নামটি রঞ্জনা, ডাকঘর, চাঁদ বণিকের পালা ও অয়দিপাউসের গল্প তাঁর স্বকণ্ঠে রেকর্ড করা নাট্যপাঠ।

এছাড়া শম্ভু মিত্র (কবিতা আবৃত্তি), রবীন্দ্রনাথের কবিতাপাঠ, দিনান্তের প্রণাম তাঁর প্রসিদ্ধ বাংলা কবিতা আবৃত্তির রেকর্ড।নাট্যাভিনয়ের সূত্রে চলচ্চিত্র জগতেও পা রেখেছিলেন শম্ভু মিত্র। খাজা আহমেদ আব্বাসের পরিচালনায় নির্মিত হিন্দি ছবি ধরতি কে লাল-এর সহকারী পরিচালক ছিলেন তিনি। অভিনয় করেছেন মানিক, শুভবিবাহ, ৪২, কাঞ্চনরঙ্গ, পথিক, বউ-ঠাকুরাণীর হাট প্রভৃতি চলচ্চিত্রে। অমিত মিত্রের সঙ্গে একদিন রাত্রে ও তার হিন্দি জাগতে রহো-র কাহিনি, চিত্রনাট্য ও পরিচালনার কাজ করেন। রাজ কাপুর প্রয়োজিত ও অভিনীত জাগতে রহো ছবিটি গ্রাঁ পিঁ সম্মানে ভূষিত হয়েছিল।

স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গে বিনোদন কার্যকলাপ কেবল বিনোদনেই সীমাবদ্ধ ছিল না,তার একটি বৃহত্তর তাৎপর্য ছিল। সাহিত্যের পাশাপাশি মঞ্চাভিনয় সমাজের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরে।

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির ভুমিকাঃ- পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পশ্চিমবঙ্গের বাংলা নাট্যচর্চার জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি সরকারি নাট্যগবেষণা প্রতিষ্ঠান ও নাট্যচর্চা কেন্দ্র। নাট্য আকাদেমির প্রতিষ্ঠা ১৯৮৭ সালে। এই আকাদেমির উপর বাংলার প্রতিটি জেলা ও মহকুমা শহরে নাট্য কর্মশালা ও নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন, নাট্য গবেষণা এবং নাটক সংক্রান্ত পুস্তক ও নাট্য বিশ্বকোষ প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি প্রতি বছর বিভিন্ন নাট্যানুষ্ঠান আয়োজন করে থাকেন। এর মধ্যে নাট্যমেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও বেশ কয়েকটি বিশেষায়িত নাট্য উৎসবের আয়োজনও আকাদেমি কর্তৃপক্ষ করেছেন। এগুলি মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় ১৯৯৯ সালে ব্রেশ্‌ট রচিত নাটকের মেলা। আকাদেমির উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা অশোক মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিরকুমার সভা। এটি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় মঞ্চস্থ হয়েছিল। উৎপল দত্ত, হাবিব তানবীর, মনোজ মিত্র, বিভাস চক্রবর্তী, ব্রাত্য বসু প্রমুখ বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব নাট্য আকাদেমির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বা আছেন। যদিও সম্প্রতি নন্দীগ্রামে সরকারি গুলিচালনার প্রতিবাদে অনেক নাট্যব্যক্তিত্ব সরকারিভাবে নাট্য আকাদেমির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি চত্বরের অদূরে স্থিত নাট্য ভবনে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। ২০০৭ সালের ৬ মার্চ আকাদেমির বিংশতি বর্ষপূর্তির প্রাক্কালে উদ্বোধিত এই ভবনে একটি সভাঘর, প্রেক্ষাগৃহ ও অন্যান্য বিভিন্ন সুযোগসুবিধা রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য বাংলা নাট্যচর্চার সার্বিক সমৃদ্ধি। নাটকের উন্নতিকল্পে সরকারি অর্থসাহায্যে নাট্য আকাদেমি বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে যেমন রয়েছে নাট্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন, তেমনই বাংলা নাটকের ইতিহাস সংরক্ষণ, গবেষণা ও গ্রন্থ-কোষগ্রন্থ প্রকাশনাও। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে আকাদেমি বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে থাকে। আবার কলকাতার বাইরে পশ্চিমবঙ্গের জেলাশহর, মহকুমা শহর, সাধারণ মফস্বল ও গ্রামাঞ্চলের নাট্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্বও নাট্য আকাদেমি বিশেষ গুরুত্বসহকারে পালন করে থাকেন। এর ফলে নাট্যচর্চাকে সমাজের তৃণমূলস্তরে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়।

নাট্য প্রশিক্ষণ

সারা বছর ধরেই নাট্য আকাদেমি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে থাকেন। এই সব কর্মশালায় নাট্যকর্মীদের আধুনিক পদ্ধতিতে দৈহিক ভাষা বা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণ বা ভয়েস মডিউলেশন, আবৃত্তি ও স্বরভঙ্গি, অভিনয়, ছন্দ ও সংগীত, মুখাভিনয়, মঞ্চসজ্জা, আলোকসজ্জা, পোষাক ও সাজসজ্জা, নাট্যরচনা, থিয়েটার ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রযোজনার লক্ষ্যে যে কর্মশালাগুলি আয়োজিত হয় সেগুলিতে শিক্ষার্থীদের প্রযোজনা ও

নাট্য-উপস্থাপনার প্রতিটি খুঁটিনাটি দিক শেখানো হয়ে থাকে। বাংলা বিভিন্ন স্বনামধন্য নাট্য ব্যক্তিত্বগণ এই সব কর্মশালায় প্রশিক্ষণের কাজে নিযুক্ত হন। এমনকি প্রয়াত বি ভি করন্থ, এইচ কানহাইলাল ও ডক্টর মোহন আগাসের মতো ভারতের বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্বগণও বাংলা আকাদেমির নাট্য প্রশিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বা আছেন।

নাট্য উৎসব

প্রতিবছর ছোটো-বড় পেশাদার-অপেশাদার মিলিয়ে ৭৫-১০০টি শ্রেষ্ঠ নাট্যপ্রযোজনা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি নাট্যমেলার আয়োজন করে। নন্দন-রবীন্দ্রসদন-বাংলা আকাদেমি চত্বরে আয়োজিত এই মেলার অন্যতম বৈশিষ্ট্যগুলি হল আলোচনাসভা, সেমিনার, নাট্যমঞ্চায়ণ, নাটক পাঠ ইত্যাদি। এছাড়াও ভারতের বিভিন্ন শহরে বাংলা ও অন্যান্য ভাষায় এবং পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় বাংলা নাট্য উৎসবের আয়োজন করে থাকে নাট্য আকাদেমি। এছাড়াও বেশ কিছু বিশেষায়িত নাট্য উৎসব যেমন ছোটোদের নাটক, মহিলা নির্দেশকদের নাটক, পথনাটক, পুতুলনাচ প্রভৃতির আয়োজন করে থাকে।

প্রযোজনা

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি ধ্রুপদী বাংলা নাটকের প্রযোজনা করে থাকে। আকাদেমির কয়েকটি সুবিখ্যাত প্রযোজনা হল প্রয়াত উৎপল দত্ত নির্দেশিত চৈতালী রাতের স্বপ্ন (উইলিয়াম শেক্সপিয়ার বিরচিত আ মিডসামার নাইটস ড্রিমঅবলম্বনে), বিভাস চক্রবর্তী নির্দেশিত গিরিশচন্দ্র ঘোষের বলিদান এবং অশোক মুখোপাধ্যায় নির্দেশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিরকুমার সভা ইত্যাদি।

প্রকাশনা

আকাদেমি প্রকাশিত বার্ষিক নাট্য আকাদেমি পত্রিকা নিবন্ধ, শ্রদ্ধালেখ, ভাষণ, নাটকের স্ক্রিপ্ট, পুরনো লেখার পুনর্মুদ্রণ, সংবাদ ইত্যাদি প্রকাশ করে। এছাড়া নাট্য আকাদেমি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছে যোগেশ চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, কুমার রায়, খালেদ চৌধুরী, তুলসী লাহিড়ী প্রমুখের জীবনী; কলকাতার নাটক, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও বিজন ভট্টাচার্যের নাটকের চিত্র-অ্যালবাম; বিভিন্ন নাট্যকারের নির্বাচিত নাটক এবং বাংলা নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাস ও অন্যান্য গবেষণা গ্রন্থ।

অভিলেখাগার ও গ্রন্থাগার

নাট্য আকাদেমির অভিলেখাগারে সংগৃহীত রয়েছে বিভিন্ন স্বনামধন্য নাট্য ব্যক্তিত্বের ৩৬টি ভিডিও সাক্ষাৎকার, ১৬টি অসামান্য নাট্যপ্রযোজনার ভিডিও রেকর্ডিং, বহু পুরনো ও নতুন নাটক, নাট্যশালা ও নাট্য প্রশিক্ষণের ফটোগ্রাফ ইত্যাদি।

গ্রন্থাগারটি এখনও নির্মীয়মান। যদিও এই গ্রন্থাগারের জন্য অনেক নাট্যকর্মী তাঁদের সংগ্রহ দান করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেবনারায়ণ গুপ্ত, বর্ধমানের প্রশান্ত চক্রবর্তী প্রমুখ। গ্রন্থাগারটি নতুন ভবনে (নাট্য ভবন) চালু হবে।

সেমিনার ও বক্তৃতা

নাট্য আকাদেমি সারাবছরই বিভিন্ন সেমিনার ও সাধারণ বক্তৃতার আয়োজন করে থাকে। শম্ভু মিত্র ও উৎপল দত্তের নামাঙ্কিত দুটি স্মারক বক্তৃতা আকাদেমিতে প্রতিবছর আয়োজিত হয়। এই বক্তৃতাগুলি দিয়েছেন উৎপল দত্ত, হাবিব তানবীর, দীনা পাঠক, কে এন পানিক্কর, জি পি দেশপাণ্ডে, সুমিত সরকার, এম কে রায়না, বি ভি করন্থ, এইচ এস শিবপ্রকাশ, রতন থিয়াম, পবিত্র সরকার, বিভাস চক্রবর্তী, সত্যদেব দুবে, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, মনোজ মিত্র, অরুণ

মুখোপাধ্যায়, শিশিরকুমার দাশ, অশোক মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এই বক্তৃতাগুলি রেকর্ড করে রাখা হয়েছে।

সহযোগ প্রকল্প

নাট্যচর্চা প্রসার প্রকল্প নামক একটি প্রকল্পের শিরোনামে নাট্য আকাদেমি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে আলোচনা চক্র, সেমিনার, বক্তৃতা, কর্মশালা প্রভৃতি আয়োজন করে থাকে। যৌথ উদ্যোগে নাট্য প্রযোজনাও চলে।

সম্মাননা ও অনুদান

পশ্চিমবঙ্গের সর্বাপেক্ষা সম্মানজনক তিন নাট্য পুরস্কার পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি কর্তৃক প্রদত্ত হয়। এগুলি হল:

- নাট্য আকাদেমি পুরস্কার – প্রযোজনা, নাট্যরচনা, অভিনয়, নির্দেশনা, মঞ্চসজ্জা, নকশা ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রদত্ত
- দীনবন্ধু পুরস্কার – সারাজীবনের কৃতিত্বের জন্য
- গিরিশ পুরস্কার – সারা জীবনের কৃতিত্বের জন্য

এই পুরস্কারগুলি ছাড়াও দুঃস্থ নাট্যকর্মীদের সাহায্যার্থে, বিশেষ প্রকল্পে বা নতুন প্রযোজনার জন্য বিভিন্ন অনুদান নাট্য আকাদেমি দিয়ে থাকে।

২১১. ৬.১৫.২.১ চলচ্চিত্রঃ-

কলকাতার টালিগঞ্জ অঞ্চলে বাংলা চলচ্চিত্রের প্রধান কেন্দ্রটি অবস্থিত। এই কারণে এই কেন্দ্রটি হলিউডের অনুকরণে "টলিউড" নামে পরিচিত হয়ে থাকে। বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প আর্ট ফিল্ম বা শিল্পগুণান্বিত চলচ্চিত্রে সুসমৃদ্ধ। সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, তপন সিংহ, ঋত্বিক ঘটক প্রমুখ বিশিষ্ট পরিচালকের চলচ্চিত্র বিশ্ববন্দিত। সমসাময়িককালের বিশিষ্ট পরিচালকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, গৌতম ঘোষ, অপর্ণা সেন ও ঋতুপর্ণ ঘোষ। বাংলা সিনেমার পাশাপাশি এই রাজ্যে অবশ্য হিন্দি সিনেমাও অত্যন্ত জনপ্রিয়। ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে সেরা পরিচালক ও সেরা চলচ্চিত্রের পুরস্কার সবচেয়ে বেশি পেয়েছেন বাঙালি পরিচালকেরা। সত্যজিৎ রায় তার পথের পাচালি, দেবী, কাঞ্চনজঙ্ঘা এসব চলচ্চিত্রের জন্য বিশ্বজুড়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। তিনি ১৯৯২ সালে সম্মানসূচক অস্কার পান। তার প্রধান দুই অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও শর্মিলা ঠাকুর সমগ্র বিশ্বে নন্দিত তাদের অনবদ্য অভিনয়ের জন্য। শর্মিলা ২০০৯ সালে বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত চলচ্চিত্র উৎসব কান-এ বিচারকের ভূমিকা পালন করেছেন। তার অভিনীত ও সত্যজিত রায় পরিচালিত অপু ট্রিলজি চলচ্চিত্র সিরিজটি যুক্তরাষ্ট্রের সাইট এন্ড সাউন্ড ম্যাগাজিন কর্তৃক ঘোষিত পৃথিবীর ইতিহাসের সেরা ১০০ টি চলচ্চিত্রের তালিকায় স্থান পায়। সত্যজিত রায় দেবী (শর্মিলা-সৌমিত্র অভিনীত) ও কাঞ্চনজঙ্ঘা চলচ্চিত্রের জন্য বিশ্বের একমাত্র পরিচালক হিসেবে জার্মানির বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে দুবার সেরা পরিচালকের পুরস্কার পান।

সত্যজিৎ রায়ঃ-

চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে সত্যজিৎ ছিলেন বহুমুখী এবং তাঁর কাজের পরিমাণ বিপুল। তিনি ৩৭টি পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র, প্রামাণ্যচিত্র ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। তাঁর নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্র *পথের পাঁচালী* (১৯৫৫) ১১টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করে, এর মধ্যে অন্যতম ১৯৫৬ কান চলচ্চিত্র উৎসবে পাওয়া "শ্রেষ্ঠ মানব দলিল" (*Best Human Documentary*) পুরস্কার। *পথের পাঁচালী*, *অপরাজিত* (১৯৫৬) ও *অপুর সংসার* (১৯৫৯) – এই

তিনটি একত্রে *অপু ত্রয়ী* নামে পরিচিত, এবং এই চলচ্চিত্র-ত্রয়ী সত্যজিতের জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম হিসেবে বহুল স্বীকৃত। চলচ্চিত্র মাধ্যমে সত্যজিৎ চিত্রনাট্য রচনা, চরিত্রায়ন, সঙ্গীত স্বরলিপি রচনা, চিত্রগ্রহণ, শিল্প নির্দেশনা, সম্পাদনা, শিল্পী-কুশলীদের নামের তালিকা ও প্রচারণাপত্র নকশা করাসহ নানা কাজ করেছেন। চলচ্চিত্র নির্মাণের বাইরে তিনি ছিলেন একাধারে কল্পকাহিনী লেখক, প্রকাশক, চিত্রকর, গ্রাফিক নকশাবিদ ও চলচ্চিত্র সমালোচক। বর্ণময় কর্মজীবনে তিনি বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন, যার মধ্যে বিখ্যাত হল ১৯৯২ সালে পাওয়া একাডেমি সম্মানসূচক পুরস্কার (অস্কার), যা তিনি সমগ্র কর্মজীবনের স্বীকৃতি হিসেবে অর্জন করেন। তিনি এছাড়াও ৩২টি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, ১টি গোল্ডেন লায়ন, ২টি সিলভার বিয়ার লাভ করেন।

অপুর বছরগুলো (১৯৫০–৫৯)

সত্যজিৎ ঠিক করেন যে, বাংলা সাহিত্যের ধ্রুপদী "বিল্ডুংস্‌রোমান" *পথের পাঁচালী*-ই হবে তাঁর প্রথম চলচ্চিত্রের প্রতিপাদ্য। ১৯২৮ সালে প্রকাশিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা এই প্রায়-আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসটিতে বাংলার এক গ্রামের ছেলে অপু'র বেড়ে ওঠার কাহিনী বিধৃত হয়েছে।

এ ছবি বানানোর জন্য সত্যজিৎ কিছু পূর্ব-অভিজ্ঞতাবিহীন কুশলীকে একত্রিত করেন, যদিও তাঁর ক্যামেরাম্যান সুব্রত মিত্র ও শিল্প নির্দেশক বংশী চন্দ্রগুপ্ত দুজনেই পরবর্তীকালে নিজ নিজ ক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ করেন। এ ছাড়া ছবির বেশির ভাগ অভিনেতাই ছিলেন শৌখিন। ১৯৫২ সালের শেষ দিকে সত্যজিৎ তাঁর নিজের জমানো পয়সা খরচ করে দৃশ্যগ্রহণ শুরু করেন। তিনি ভেবেছিলেন প্রাথমিক দৃশ্যগুলো দেখার পরে হয়ত কেউ ছবিটিতে অর্থলগ্নি করবেন। কিন্তু সে ধরনের আর্থিক সহায়তা মিলছিল না। *পথের পাঁচালী*-র দৃশ্যগ্রহণ তাই থেমে থেমে অস্বাভাবিকভাবে প্রায় দীর্ঘ তিন বছর ধরে সম্পন্ন হয়। কেবল তখনই দৃশ্যগ্রহণ করা সম্ভব হত যখন সত্যজিৎ বা নির্মাণ ব্যবস্থাপক অনিল চৌধুরী প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান করতে পারতেন। শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের থেকে ঋণ নিয়ে ১৯৫৫ সালে ছবিটি নির্মাণ সম্পন্ন হয় ও সে বছরই এটি মুক্তি পায়। মুক্তি পাওয়ার পর পরই ছবিটি দর্শক-সমালোচক সবার অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে ও বহু পুরস্কার জিতে নেয়। ছবিটি বহুদিন ধরে ভারতে ও ভারতের বাইরে প্রদর্শিত হয়। ছবিটি নির্মাণের সময় অর্থের বিনিময়ে চিত্রনাট্য বদলের জন্য কোন অনুরোধই সত্যজিৎ রাখেননি। এমনকি ছবিটির একটি সুখী সমাপ্তির (যেখানে ছবির কাহিনীর শেষে অপুর সংসার একটি "উন্নয়ন প্রকল্পে" যোগ দেয়) জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরোধও তিনি উপেক্ষা করেন।

ভারতে ছবিটির প্রতিক্রিয়া ছিল উৎসাহসঞ্চারী। *দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া*-তে লেখা হয়, "It is absurd to compare it with any other Indian cinema ... *Pather Panchali* is pure cinema" ("একে অন্য যেকোনও ভারতীয় চলচ্চিত্রের সাথে তুলনা করা অবাস্তব... *পথের পাঁচালী* হল বিশুদ্ধ চলচ্চিত্র")।যুক্তরাজ্যে লিন্‌জি অ্যান্ডারসনচলচ্চিত্রটির অত্যন্ত ইতিবাচক একটি সমালোচনা লেখেন। তবে ছবিটির সব সমালোচনাই এ রকম ইতিবাচক ছিল না। বলা হয় যে ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো ছবিটি দেখে মন্তব্য করেছিলেন: "কৃষকেরা হাত দিয়ে খাচ্ছে - এরকম দৃশ্যসম্বলিত ছবি আমি দেখতে চাই না।" দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর সবচেয়ে প্রভাবশালী সমালোচক বসলি ক্রাউদার ছবিটির একটি কঠোর সমালোচনা লেখেন এবং সেটি পড়ে মনে করা হয়েছিল যে ছবিটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তি পেলেও ভাল করবে না। কিন্তু এর বদলে ছবিটি সেখানে প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি দিন ধরে প্রদর্শিত হয়।

সত্যজিতের পরবর্তী ছবি *অপরাজিত*-এর সাফল্য তাঁকে আন্তর্জাতিক মহলে আরও পরিচিত করে তোলে। এই ছবিটিতে তরুণ অপুর উচ্চাভিলাষ ও তাঁর মায়ের ভালবাসার মধ্যকার চিরন্তন সংঘাতকে মর্মভেদী রূপে ফুটিয়ে তোলা হয়। বহু সমালোচক, যাদের মধ্যে মৃণাল সেন ও ঋত্বিক ঘটক অন্যতম, ছবিটিকে সত্যজিতের প্রথম ছবিটির চেয়েও ওপরে স্থান দেন। *অপরাজিত* ভেনিসে গোল্ডেন লায়ন পুরস্কার জেতে। অপু ত্রয়ী শেষ করার আগে সত্যজিৎ আরও দুটি চলচ্চিত্র নির্মাণ সমাপ্ত করেন। প্রথমটি ছিল *পরশ পাথর* নামের একটি হাস্যরসাত্মক ছবি। আর পরেরটি ছিল জমিদারী প্রথার অবক্ষয়ের ওপর নির্মিত *জলসাঘর*, যেটিকে তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়।

সত্যজিৎ *অপরাজিত* নির্মাণের সময় একটি ত্রয়ী সম্পন্ন করার কথা ভাবেননি, কিন্তু ভেনিসে এ ব্যাপারে সাংবাদিকদের জিজ্ঞাসা শুনে তাঁর মাথায় এটি বাস্তবায়নের ধারণা আসে।[২৪] অপু সিরিজের শেষ ছবি *অপুর সংসার* ১৯৫৯সালে নির্মাণ করা হয়। আগের দুটি ছবির মত এটিকেও বহু সমালোচক সিরিজের সেরা ছবি হিসেবে আখ্যা দেন (রবিন উড, অপর্ণা সেন)। এ ছবির মাধ্যমেই সত্যজিতের দুই প্রিয় অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও শর্মিলা ঠাকুরেরচলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ ঘটে। ছবিটিতে অপুকে দেখানো হয় কলকাতার এক জীর্ণ বাড়িতে প্রায়-দরিদ্র অবস্থায় বসবাস করতে। এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অপর্ণার সাথে অপুর বিয়ে হয়। তাঁদের জীবনের বিভিন্ন দৃশ্যে "বিবাহিত জীবন সম্পর্কে ছবিটির ধ্রুপদী ইতিবাচকতা ফুটে ওঠে", কিন্তু শীঘ্রই এক বিয়োগান্তক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। একজন বাঙালি সমালোচক *অপুর সংসার*-এর একটি কঠোর সমালোচনা লেখেন এবং সত্যজিৎ এর উত্তরে ছবিটির পক্ষে একটি সুলিখিত নিবন্ধ লেখেন - যা ছিল সত্যজিতের কর্মজীবনে একটি দুর্লভ ঘটনা (সত্যজিতের প্রত্যুত্তরের এরকম ঘটনা আরেকবার ঘটে তাঁর পছন্দের *চারুলতা* ছবিটি নিয়ে)।

সত্যজিতের ব্যক্তিগত জীবনের ওপর তাঁর কর্মজীবনের সাফল্যের তেমন কোন প্রভাব পড়েনি। সত্যজিতের নিজস্ব কোন বাড়ি ছিল না; তিনি তাঁর মা, মামা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে এক ভাড়া বাড়িতেই সারা জীবন কাটিয়ে দেন। তাঁর স্ত্রী ও ছেলে দুজনেই তাঁর কাজের সাথে জড়িয়ে ছিলেন। বেশির ভাগ চিত্রনাট্য বিজয়াই প্রথমে পড়তেন এবং ছবির সঙ্গীতের সুর তৈরীতেও তিনি স্বামীকে সাহায্য করতেন। আয়ের পরিমাণ কম হলেও সত্যজিৎ নিজেকে বিত্তশালীই মনে করতেন, কেননা পছন্দের বই বা সঙ্গীতের অ্যালবাম কিনতে কখনোই তাঁর কষ্ট হয়নি।

দেবী থেকে *চারুলতা* (১৯৫৯–৬৪)

কর্মজীবনের এই পর্বে সত্যজিৎ নির্মাণ করেন রাজ পর্বের ওপর চলচ্চিত্র (যেমন *দেবী*), রবীন্দ্রনাথের ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র, একটি হাস্যরসাত্মক ছবি (''মহাপুরুষ'') এবং মৌলিক চিত্রনাট্যের ওপর ভিত্তি করে তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র (কাঞ্চনজঙ্ঘা)। এছাড়াও তিনি বেশ কিছু চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন, সমালোচকদের মতে যেগুলোর মত করে ছবির পর্দায় ভারতীয় নারীদের এত অনুভূতি দিয়ে এর আগে কেউ ফুটিয়ে তোলেনি। পলিন কেল মন্তব্য করেন যে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি সত্যজিৎ নারী নন, পুরুষ।

অপুর সংসার নির্মাণের পরে সত্যজিৎ *দেবী* ছবির কাজে হাত দেন। হিন্দু সমাজের বিভিন্ন মজ্জাগত কুসংস্কার ছিল ছবিটির বিষয়। ছবিটিতে শর্মিলা ঠাকুর দয়াময়ী নামের এক তরুণ বধূর চরিত্রে অভিনয় করেন, যাকে তার শ্বশুর কালী বলে পূজা করতেন। শর্মিলা পরে এই ছবিতে তাঁর অভিনয় নিয়ে মন্তব্য করেন যে দেবীতে তিনি নিজের থেকে কিছু করেননি, বরং এক জিনিয়াস তাঁকে দিয়ে সেটা করিয়ে নিয়েছিলেন। সত্যজিৎ আশঙ্কা করেছিলেন যে

ভারতীয় সেন্সর বোর্ড হয়ত ছবিটি প্রদর্শনে বাধা দেবে, বা হয়ত তাঁকে ছবিটি পুনরায় সম্পাদনা করতে বলবে, কিন্তু সেরকম কিছু ঘটে নি। ১৯৬১ সালে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর প্ররোচনায় সত্যজিৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে কবিগুরুর ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেন। রবীন্দ্রনাথের ভিডিও ফুটেজের অভাবে সত্যজিৎকে মূলত স্থিরচিত্র দিয়েই ছবিটি বানানোর চ্যালেঞ্জ হাতে নিতে হয় এবং তিনি পরে মন্তব্য করেন যে ছবিটি বানাতে তাঁর সাধারণের চেয়ে তিন গুণ বেশি সময় লেগেছিল। একই বছরে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্যের সাথে মিলে সত্যজিৎ *সন্দেশ* নামের শিশুদের পত্রিকাটি - যেটি তাঁর পিতামহ একসময় প্রকাশ করতেন - পুনরায় প্রকাশ করা শুরু করেন। সত্যজিৎ এ জন্য বহুদিন ধরে অর্থসঞ্চয় করেছিলেন। পত্রিকাটি ছিল একাধারে শিক্ষামূলক ও বিনোদনধর্মী, এবং "সন্দেশ" নামটিতে (শব্দটির দুটি অর্থ হয়: "খবর" ও "মিষ্টি") এই দ্বিত্বতার প্রতিফলন ঘটেছে। সত্যজিৎ পত্রিকাটির ভেতরের ছবি আঁকতেন ও শিশুদের জন্য গল্প ও প্রবন্ধ লিখতেন। পরবর্তী বছরগুলোতে লেখালেখি করা তাঁর আয়ের অন্যতম প্রধান উৎসে পরিণত হয়।

১৯৬২ সালে সত্যজিৎ কাঞ্চনজঙ্ঘা ছবিটি পরিচালনা করেন। এটি ছিল তাঁর বানানো প্রথম মৌলিক চিত্রনাট্যনির্ভর রঙিন চলচ্চিত্র। দার্জিলিং নামের এক পাহাড়ী রিসোর্টে একটি উচ্চবিত্ত পরিবারের কাটানো এক বিকেলের কাহিনী নিয়ে এই জটিল ও সঙ্গীতনির্ভর ছবিটি বানানো হয়, যে বিকেলে পরিবারের সদস্যরা হঠাৎ করেই পরিবারের দণ্ডমুণ্ড কর্তা ইন্দ্রনাথ রায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ছবিটি প্রথমে একটি বিরাট ম্যানশনে চিত্রায়িত করার পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু পরে সত্যজিৎ সেই বিখ্যাত রিসোর্টেই দৃশ্যগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন, যাতে তিনি চিত্রনাট্যটির উত্তেজনা আলো-আঁধারের খেলা ও কুয়াশাকে ব্যবহার করে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। সত্যজিৎ পরে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন যে তাঁর চিত্রনাট্যে যেকোন ধরনের আলোকসম্পাতেই দৃশ্যগ্রহণ সম্ভব ছিল, অথচ একই সময়ে দার্জিলিং-এ অবস্থানকারী একটি বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র নির্মাণকারী দল সূর্যালোকের অভাবে একটি শটও সম্পন্ন করতে পারেনি।[৩১]ছবিটিতে ইন্দ্রনাথ রায়ের চরিত্রে রূপদানের জন্য সত্যজিৎ ছবি বিশ্বাস-কে নির্বাচন করেন। এটিই ছিল ছবি বিশ্বাসের করা শেষ ছবি; এর কিছুদিন পরে এক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান। এর ফলে সত্যজিৎ পরবর্তীকালে কিছু চরিত্র অঙ্কনে বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়, কেননা তাঁর মনে হয়েছিল একমাত্র ছবি বিশ্বাসই সেসব চরিত্র রূপদান করার যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন।

এসময় সত্যজিৎ একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন এবং বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে বিচারক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন, যদিও তিনি অনুযোগ করতেন যে কলকাতার বাইরে তাঁর নিজেকে সৃষ্টিশীল মনে হত না। ১৯৬৩ সালে মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে তিনি বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন, ফেদেরিকো ফেলিনির *8½* ছবিটি সেরা পুরস্কার জেতে। ষাটের দশকে জাপান সফরের সময় তাঁর অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় চলচ্চিত্র পরিচালক আকিরা কুরোসাওয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেন। দেশে অবস্থানকালে কলকাতার ব্যস্ত জীবন থেকে ছুটি নিয়ে তিনি মাঝে মাঝে দার্জিলিং বা পুরি-তে চলে যেতেন ও সেখানে নির্জনে চিত্রনাট্য লিখতেন।

১৯৬৪ সালে সত্যজিৎ *চারুলতা* ছবিটি নির্মাণ করেন, যেটি ছিল তাঁর কর্মজীবনের এই পর্বের শেষ ছবি এবং অনেক সমালোচকের মতে তাঁর সবচেয়ে সফল চলচ্চিত্র। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প *নষ্টনীড়* অবলম্বনে নির্মিত ছবিটিতে ১৯শ শতকের এক নিঃসঙ্গ বাঙালি বধূ চারু ও ঠাকুরপো অমলের প্রতি তার অনুভূতির কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। মোৎসার্টীয় এই ছবিটিকে প্রায়ই "নিখুঁত" বলে অভিহিত করা হয়। সত্যজিৎ নিজেও বলেছেন যে এই ছবিটিতে তাঁর ভুলের সংখ্যা সবচেয়ে কম এবং এটিই তাঁর নির্মিত একমাত্র ছবি, যেটি আবার সুযোগ পেলে

তিনি ঠিক একইভাবে বানাতেন। ছবিটিতে চারু চরিত্রে মাধবী মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় এবং সুব্রত মিত্র ও বংশী দাশগুপ্তের কাজ উচ্চপ্রশংসা পায়। ছবিটির দুটি দৃশ্য সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমটি হচ্ছে ছবিটির নির্বাক প্রথম সাত মিনিট, যা চারুর একঘেয়েমি জীবন ফুটিয়ে তোলে এবং দ্বিতীয়টি হল "বাগানের দোলনার দৃশ্য", যেখানে চারু অমলের জন্য তার ভালবাসার মুখোমুখি হয়। এ পর্বে সত্যজিতের নির্মিত অন্যান্য চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে *মহানগর, তিনকন্যা, অভিযান* এবং *কাপুরুষ ও মহাপুরুষ*।

নতুন দিকনির্দেশনা (১৯৬৫–১৯৮২)

কাছের মানুষদের কাছে সত্যজিতের ডাকনাম ছিল "মানিক"। তিনি তাঁর সমসাময়িক চলচ্চিত্রকারদের চেয়ে সাধারণ জনগণের সাথে অনেক বেশি মিশেছেন। অচেনা লোকদের তিনি প্রায়ই সাক্ষাৎ দিতেন। কিন্তু সাক্ষাৎকারীদের অনেকেই সত্যজিৎ ও তাদের মাঝে একটা দূরত্ব অনুভব করতেন। বাঙালিরা এটাকে ভাবতেন তাঁর ইংরেজ মানসিকতার প্রকাশ, আর পশ্চিমীরা ভাবতেন তাঁর শীতল ও গম্ভীর আচরণ ছিল ব্রাহ্মণদের মত। অভিনেতাদের প্রতি তাঁর অগাধ আস্থা ছিল, কিন্তু তাদের অযোগ্যতায় বিরূপভাবও কখনো কখনো প্রকাশ করতেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সংবাদমাধ্যমে কখনোই তেমন আলোকপাত করা হয়নি, তবে কারও কারও মতে মাধবী মুখোপাধ্যায়ের সাথে ষাটের দশকে তাঁর সম্পর্ক ছিল।[৩৫]

চারুলতা-পরবর্তী বছরগুলোতে সত্যজিৎ ছিলেন বৈচিত্র্যের সন্ধানী; এসময় কল্পকাহিনী ও গোয়েন্দা কাহিনী থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক ছবিও তিনি বানান। এ পর্বে তিনি তাঁর ছবিগুলোতে প্রচুর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান এবং সমকালীন ভারতীয় জীবনের বিভিন্ন দিকগুলো তাঁর ছবিতে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেন। এ পর্বে তাঁর প্রথম প্রধান চলচ্চিত্র ছিল *নায়ক*, যার বিষয় ছিল এক চলচ্চিত্র তারকার সাথে এক সহানুভূতিশীল তরুণী সাংবাদিকের রেলযাত্রার সময়কার সাক্ষাৎ ও সংলাপ। উত্তম কুমার ও শর্মিলা ঠাকুর অভিনীত এই ছবিতে ট্রেন যাত্রার ২৪ ঘণ্টার পরিসরে এক আপাতসফল চলচ্চিত্র তারকার মনের অন্তর্সংঘাতগুলো উন্মোচন করা হয়। ছবিটি বার্লিনে সমালোচকদের পুরস্কার জিতলেও এটি নিয়ে তেমন আর কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। ১৯৬৭ সালে সত্যজিৎ *দি এলিয়েন* নামের একটি ছবির জন্য চিত্রনাট্য লেখেন। যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের যৌথ প্রযোজনার এই ছবিটির প্রযোজক ছিল কলাম্বিয়া পিকচার্স এবং পিটার সেলার্স ও মার্লোন ব্রান্ডো ছবিটির প্রধান অভিনেতা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু চিত্রনাট্য লেখা শেষ করার পর সত্যজিৎ জানতে পারেন যে সেটির স্বত্ব তার নয় ও এর জন্য তিনি কোন সম্মানও পাবেন না। পরবর্তীকালে মার্লোন ব্র্যান্ডো প্রকল্পটি ত্যাগ করেন। তাঁর স্থানে জেমস কোবার্ন কে আনার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু ততদিনে সত্যজিতের আশাভঙ্গ ঘটে এবং তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। পরে ৭০ ও ৮০-র দশকে কলাম্বিয়া বহুবার প্রকল্পটি পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। ১৯৮২ সালে যখন স্টিভেন স্পিলবার্গের *ই.টি. দ্য এক্সট্রা-টেরেস্ট্রিয়াল* মুক্তি পায়, তখন অনেকেই ছবিটির সাথে সত্যজিতের লেখা চিত্রনাট্যের মিল খুঁজে পান। সত্যজিৎ ১৯৮০ সালে *সাইট অ্যান্ড সাউন্ড* ম্যাগাজিনে লেখা একটি ফিচারে প্রকল্পটির ব্যর্থতা নিয়ে কথা বলেন ও পরে সত্যজিতের জীবনী লেখক অ্যান্ড্রু রবিনসন এ ঘটনার ওপর আরও বিস্তারিত লেখেন (১৯৮৯ সালে প্রকাশিত *দি ইনার আই*-এ)। সত্যজিৎ বিশ্বাস করতেন যে তাঁর লেখা *দি এলিয়েন*-এর চিত্রনাট্যটির মাইমোগ্রাফ কপি সারা যুক্তরাষ্ট্রে ছড়িয়ে না পড়লে স্পিলবার্গের ছবিটি বানানো হয়ত সম্ভব হত না।

সত্যজিতের ছেলে সন্দীপের অনুযোগ ছিল তিনি সবসময় বড়দের জন্য গম্ভীর মেজাজের ছবি বানান। এর উত্তরে ও নতুনত্বের সন্ধানে সত্যজিৎ ১৯৬৮ সালে নির্মাণ করেন তাঁর

সবচেয়ে ব্যবসাসফল ছবি *গুপী গাইন বাঘা বাইন*। এটি ছিল সত্যজিতের পিতামহ উপেন্দ্রকিশোরের লেখা ছোটদের জন্য একটি গল্পের ওপর ভিত্তি করে বানানো সঙ্গীতধর্মী রূপকথা। গায়ক গুপী ও ঢোলবাদক বাঘা ভুতের রাজার তিন বর পেয়ে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে ও দুই প্রতিবেশী রাজ্যের মধ্যে আসন্ন যুদ্ধ থামানোর চেষ্টা করে। ছবিটির নির্মাণকাজ ছিল ব্যয়বহুল, এবং অর্থাভাবে সত্যজিৎ ছবিটি সাদা-কালোয় ধারণ করেন। যদিও তাঁর কাছে বলিউডের এক অভিনেতাকে ছবিতে নেয়ার বিনিময়ে অর্থের প্রস্তাব এসেছিল, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এর পরে সত্যজিৎ তরুণ কবি ও লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা একটি উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে *অরণ্যের দিনরাত্রি* ছবিটি নির্মাণ করেন। বলা হয় এই ছবিটির সঙ্গীত-কাঠামো চারুলতার চেয়েও বেশি জটিল ছিল। ছবিটিতে চার শহুরে তরুণ ছুটিতে বনে ঘুরতে যায় এবং একজন বাদে সকলেই নারীদের সাথে বিভিন্ন ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে যা তাদের মধ্যবিত্ত চরিত্রের নানা দিক প্রকাশ করে। রবিন উডের মতে "[ছবিটির] একটিমাত্র দৃশ্য থেকেই...একটি ছোট গল্প লেখার রসদ পাওয়া সম্ভব। এ ছবিতে সত্যজিৎ মুম্বাই-ভিত্তিক অভিনেত্রী সিমি গারেওয়াল-কে এক আদিবাসী মহিলা হিসেবে চরিত্রায়ণ করেন; তাঁর মত শহুরে নারীকে সত্যজিৎ চরিত্রটির জন্য নির্বাচন করেছেন শুনে সিমি অবাক হয়েছিলেন।

অরণ্যের দিনরাত্রি-তে নির্মাণকুশলতা প্রদর্শনশেষে সত্যজিৎ মনোযোগ দেন তৎকালীন বাঙালি বাস্তবতার মর্মমূলে, যখন বামপন্থী নকশাল আন্দোলনের তীব্রতা সর্বত্র অনুভূত হচ্ছিল। সত্যজিৎকে প্রায়ই বলা হত তিনি সমসাময়িক ভারতীয় শহুরে অভিজ্ঞতার ব্যাপারে উদাসীন। এর জবাবে ১৯৭০-এর দশকে তিনি কলকাতাকে কেন্দ্র করে তিনটি ছবি বানান যেগুলো ''কলকাতা ত্রয়ী'' নামেও পরিচিত: *প্রতিদ্বন্দ্বী* (১৯৭০), *সীমাবদ্ধ* (১৯৭১), এবং *জন অরণ্য* (১৯৭৫)। চলচ্চিত্র তিনটি আলাদাভাবে পরিকল্পনা করা হলেও বিষয়বস্তুর মিলের কারণে এগুলোকে একটি দুর্বল ত্রয়ী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। *প্রতিদ্বন্দ্বী*-র নায়ক এক আদর্শবাদী তরুণ স্নাতক যার মোহমুক্তি ঘটলেও ছবির শেষ পর্যন্ত সে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েনি। *জন অরণ্য*-র নায়ক আরেক তরুণ যে জীবিকা নির্বাহের জন্য দুর্নীতির কাছে আত্মসমর্পণ করে। এবং *সীমাবদ্ধ*-র অর্থনৈতিকভাবে সফল প্রধান চরিত্রটি আরও লাভ করার জন্য সমস্ত আদর্শ বিসর্জন দেয়। এগুলির মধ্যে *প্রতিদ্বন্দ্বী* ছবিতে সত্যজিৎ ভিন্ন ধরনের (elliptical) বর্ণনাভঙ্গি ব্যবহার করেন, যেখানে নেগেটিভ, স্বপ্নদৃশ্য ও হঠাৎ ফ্ল্যাশব্যাকের সহায়তা নেয়া হয়। এ ছাড়া ৭০-এর দশকে সত্যজিৎ তাঁর নিজের লেখা জনপ্রিয় গোয়েন্দা কাহিনীর নায়ক ফেলুদার ওপর ভিত্তি করে *সোনার কেল্লা* ও *জয় বাবা ফেলুনাথ* ছবি দুটিও নির্মাণ করেন।

সত্যজিৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে একটি ছবি তৈরি করার কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু পরে এ পরিকল্পনা ত্যাগ করেন এই মন্তব্য করে যে একজন চলচ্চিত্রকার হিসেবে তিনি শরণার্থীদের বেদনা ও জীবন-অভিযাত্রার প্রতিই বেশি আগ্রহী ছিলেন, তাদের নিয়ে রাজনীতির প্রতি নয়। ১৯৭৭ সালে সত্যজিৎ *শতরঞ্জ কি খিলাড়ি* নামের একটি উর্দু চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। ছবিটি মুন্সি প্রেমচাঁদ-এর একটি গল্প অবলম্বনে তৈরি করা হয়; ১৮৫৭ সালের ভারতীয় বিপ্লবের এক বছর আগে অযোধ্যা রাজ্যের লক্ষ্ণৌ ছিল গল্পটির পটভূমি। ছবিটিতে ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের সূত্রপাতের ঘটনার বিবরণ দেয়া হয়েছে। এটিই ছিল বাংলা ভাষার বাইরে অন্য ভাষায় বানানো সত্যজিতের প্রথম চলচ্চিত্র। এটি আরও ছিল তাঁর সবচেয়ে ব্যয়বহুল ও তারকাসমৃদ্ধ ছবি, যাতে সঞ্জীব কুমার, সাইদ জাফরি, আমজাদ খান, শাবানা আজমি, ভিক্টর ব্যানার্জি ও রিচার্ড অ্যাটেনব্রো-র মত অভিনেতারা অংশ নেন। পরবর্তীকালে সত্যজিৎ প্রেমচাঁদের গল্পের ওপর ভিত্তি করে হিন্দি ভাষায় এক-ঘণ্টা দীর্ঘ *সদগতি* নামের একটি ছবি বানান। ছবিটিতে ভারতে বিদ্যমান অস্পৃশ্যতার ক্রূর বাস্তবতাকে তুলে ধরা

হয়। ১৯৮০ সালে সত্যজিৎ *গুপী গাইন বাঘা বাইন* ছবির পরবর্তী পর্ব *হীরক রাজার দেশে*নির্মাণ করেন, যেটিতে তাঁর রাজনৈতিক মতামতের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ছবিটির চরিত্র *হীরক রাজা* ছিল ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থা ঘোষণাকালীন সরকারের প্রতিফলন। বহুল প্রশংসাপ্রাপ্ত স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র *পিকু*নির্মাণের মধ্য দিয়ে সত্যজিতের কর্মজীবনের এই পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

শেষ পর্যায় (১৯৮৩–১৯৯২)

১৯৮৩ সালে *ঘরে বাইরে*ছবির কাজ করার সময় সত্যজিতের হার্ট অ্যাটাক ঘটে এবং এ ঘটনার ফলে জীবনের অবশিষ্ট নয় বছরে তাঁর কাজের পরিমাণ ছিল অত্যন্ত সীমিত। স্বাস্থ্যের অবনতির ফলে ছেলে সন্দীপ রায়ের সহায়তায় সত্যজিৎ ১৯৮৪ সালে *ঘরে বাইরে*নির্মাণ সমাপ্ত করেন। এরপর থেকে তাঁর ছেলেই তাঁর হয়ে ক্যামেরার কাজ করতেন। অন্ধ জাতীয়তাবাদের ওপর লেখা রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাসটি চলচ্চিত্রে রূপদানের ইচ্ছা সত্যজিতের অনেকদিন ধরেই ছিল এবং তিনি ৪০-এর দশকে ছবিটির একটি চিত্রনাট্যও লিখেছিলেন। যদিও ছবিটিতে সত্যজিতের অসুস্থতাজনিত ভুলের ছাপ দেখা যায়, তা সত্ত্বেও ছবিটি কিছু সমালোচকের প্রশংসা কুড়ায় এবং এই ছবিতেই সত্যজিৎ প্রথমবারের মত একটি চুম্বনদৃশ্য যোগ করেন। ১৯৮৭ সালে সত্যজিৎ তাঁর বাবা সুকুমার রায়ের ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেন।

শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে সত্যজিৎ তাঁর শেষ তিনটি ছবি অভ্যন্তরীণ মঞ্চে নির্মাণ করেন। এগুলি তাঁর আগের ছবিগুলির চেয়ে আলাদা ও অনেক বেশি সংলাপনির্ভর। ১৯৮৯ সালে নির্মিত *গণশত্রু*ছবিটিতে তাঁর পরিচালনা তুলনামূলকভাবে দুর্বল এবং এটিকে দীর্ঘদিনের অসুস্থতাশেষে ফিরে আসার পর সত্যজিতের চলচ্চিত্র নির্মাণের পুনঃপ্রচেষ্টা হিসেবেই গণ্য করা হয়। ১৯৯০ সালে নির্মিত *শাখা প্রশাখা*সে তুলনায় উন্নততর ছবি হিসেবে গণ্য করা হয়। এ ছবিতে এক আজীবন সততার সাথে কাটানো বৃদ্ধ ব্যক্তি জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে তাঁর তিন ছেলের দুর্নীতির কথা জানতে পারেন; ছবির শেষ দৃশ্যে তিনি তাঁর মানসিকভাবে অসুস্থ কিন্তু দুর্নীতিমুক্ত চতুর্থ সন্তানের সান্নিধ্যে সান্ত্বনা খুঁজে পান। সত্যজিতের শেষ ছবি *আগন্তুক*ছিল হালকা আবহের। এ ছবিতে বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া মামার পরিচয় দিয়ে একজন আগন্তুক এক পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর এই সাক্ষাতের অভিজ্ঞতার (যেখানে পরিবারের ছোট ছেলেটি আগন্তুকটিকে আগ্রহভরে স্বাগত জানায়, কিন্তু পরিবারের বড়রা তাঁকে অনীহা ও সন্দেহের চোখে দেখেন) ভেতর দিয়ে সত্যজিৎ দর্শকের কাছে মানুষের পরিচয়, স্বভাব-প্রকৃতি ও সভ্যতা নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের জাল বোনেন। সত্যজিতের ছবি গভীর মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ।

১৯৯২ সালে হৃদযন্ত্রের জটিলতা নিয়ে অসুস্থ সত্যজিৎ হাসপাতালে ভর্তি হন এবং সে অবস্থা থেকে তাঁর স্বাস্থ্য আর ভালো হয়নি। মৃত্যুর কিছু সপ্তাহ আগে অত্যন্ত অসুস্থ ও শয্যাশায়ী অবস্থায় তিনি তাঁর জীবনের শেষ পুরস্কার একটি সম্মানসূচক অস্কার গ্রহণ করেন। ১৯৯২ সালের ২৩ এপ্রিল সত্যজিৎ মৃত্যুবরণ করেন।

চলচ্চিত্র কুশলতা

সত্যজিৎ চিত্রনাট্য রচনাকে পরিচালনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করতেন। এ কারণেই কর্মজীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী ছিলেন না। তাঁর দুই বিদেশী ভাষায় নির্মিত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের জন্য চিত্রনাট্য তিনি ইংরেজিতে লিখেছিলেন, এবং তারপর সেগুলো তাঁর তত্ত্বাবধানে অনুবাদকেরা হিন্দি ও উর্দুতে ভাষান্তরিত করেন। সত্যজিৎ ও তাঁর শিল্প নির্দেশক বংশী চন্দ্রগুপ্ত মনে করতেন চলচ্চিত্রের "চলচ্চিত্রের রঙ্গমঞ্চের অস্তিত্বই চিত্রনাট্যের ওপর নির্ভরশীল"। সত্যজিৎ সবসময় প্রথমে ইংরেজিতে চিত্রনাট্য লিখতেন যেন অবাঙালি বংশী চন্দ্রগুপ্ত তা পড়তে পারেন। সত্যজিতের প্রথম দিকের চলচ্চিত্রগুলোর ক্যামেরার কাজ করতেন সুব্রত মিত্র, যিনি পরবর্তীকালে তিক্ততার মধ্য দিয়ে সত্যজিতের কর্মীদল থেকে বেরিয়ে যান। কিছু সমালোচকের মতে সুব্রতের প্রস্থানের কারণে সত্যজিতের চলচ্চিত্রের চিত্রধারণের মান নেমে যায়। বাইরে সুব্রতের প্রশংসা করলেও *চারুলতা*-র সময় থেকেই ক্যামেরার কাজে সত্যজিৎ নিজের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করতে থাকেন, এবং এর পরিণতিতে ১৯৬৬ সালের পর থেকে সুব্রত আর সত্যজিতের হয়ে কাজ করেননি। সুব্রত মিত্রের পথপ্রদর্শক কাজের মধ্যে রয়েছে "বাউন্স আলোকসজ্জা" কৌশল, যেখানে কাপড়ে আলো প্রতিফলিত করে অভ্যন্তরীণ সেটেও বাইরের প্রাকৃতিক আলোর আভাস তৈরি করা যায়। এছাড়া সত্যজিৎ তাঁর নিজের অনেক কারিগরি ও চলচ্চিত্র-সংক্রান্ত উদ্ভাবনের পেছনে জঁ-লুক গদার ও ফ্রঁসোয়া ত্রুফোর মত ফরাসি নবতরঙ্গের পরিচালকদের কাজের কথা স্বীকার করেছেন।

সত্যজিতের চলচ্চিত্র নিয়মিত সম্পাদনা করতেন দুলাল দত্ত, তবে বেশীর ভাগ সময় সত্যজিৎ-ই দুলালকে এ ব্যাপারে নির্দেশনা দিতেন। আর্থিক অসচ্ছলতা এবং সত্যজিতের অনুপুঙ্খ পরিকল্পনা ও পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের কারণে তাঁর বেশীর ভাগ চলচ্চিত্রের সম্পাদনা প্রকৃতপক্ষে ক্যামেরাতে দৃশ্যধারণের সময়েই সম্পন্ন হয়ে যেত (*পথের পাঁচালী* বাদে)। কর্মজীবনের শুরুতেই রবি শংকর, বেলায়েত খান ও আলি আকবর খানের মত প্রতিভাবান ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতজ্ঞদের সাথে সত্যজিতের কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু তাঁর এ অভিজ্ঞতা ছিল মূলত বেদনাদায়ক। তিনি বুঝতে পারেন যে সঙ্গীতজ্ঞেরা তাঁর চলচ্চিত্রের চেয়ে তাঁদের নিজেদের সাঙ্গীতিক ধারার প্রতিই বেশি অনুগত। সত্যজিৎ পাশ্চাত্য ধারার ধ্রুপদী সঙ্গীতের ব্যবহার পছন্দ করতেন, বিশেষত তাঁর শহুরে পটভূমিতে বানানো ছবিগুলোর জন্য। এ জন্য পরবর্তীকালে *তিন কন্যা* ছবিটির সময় থেকে তিনি নিজেই নিজের চলচ্চিত্রের জন্য সঙ্গীত স্বরলিপি রচনা করতেন। সত্যজিতের ছবিতে অভিনেতাদের কাজও সমানভাবে প্রশংসিত হয়েছে। তাঁর ছবিতে চলচ্চিত্র তারকারা যেমন অভিনয় করেছেন, তেমনি কখনো চলচ্চিত্র দেখেননি এরকম মানুষও অভিনয় করেছেন (যেমন *অপরাজিত* ছবিটিতে)। রবিন উড-সহ অনেকেই সত্যজিতকে শিশু অভিনেতাদের জন্য সেরা পরিচালক হিসেবে আখ্যা দেন, এবং উদাহরণ হিসেবে *পথের পাঁচালী* ছবিতে অপু ও দুর্গা, *পোস্টমাস্টার* ছবিতে রতন এবং *সোনার কেল্লা* ছবিতে মুকুল চরিত্রগুলোর উল্লেখ করেন। সত্যজিতের নির্দেশনার প্রকৃতি অভিনেতার প্রতিভা ও অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করত। উৎপল দত্তের মত অভিনেতাদের তেমন কোন নির্দেশনাই তিনি দেননি, অন্যদিকে অপু চরিত্রে সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়কে কিংবা অপর্ণা চরিত্রে শর্মিলা ঠাকুরকে তিনি অনেকটা "পুতুলের" মত ব্যবহার করেছেন।

সত্যজিতের চলচ্চিত্রগুলোর বিষয়বস্তু ছিল বহুমুখী। এ প্রসঙ্গে তিনি ১৯৭৫ সালে বলেন যে সমালোচকেরা প্রায়ই তাঁর বিরুদ্ধে এক বিষয় থেকে আরেক বিষয়ে, এক ধরন থেকে অন্য ধরনে ঘাসফড়িঙের মতো লাফ দেয়ার প্রবণতা প্রদর্শনের অভিযোগ করেন ও তাঁর ছবিতে চেনাজানা কোন ধরন খুঁজে পান না যাতে তাঁর গায়ে কোন একটি বিশেষ তকমা এঁটে দেয়া

যায়। এ ব্যাপারে আত্ম-সমর্থন করে তিনি বলেন যে এই বহুমুখীতা তাঁর নিজের চরিত্রেরই প্রতিফলন, এবং তাঁর প্রতিটি ছবির পেছনে ঠাণ্ডা মাথায় নেয়া সিদ্ধান্ত কাজ করেছে।

২১১. ৬.১৬.৩ ক্রীড়া

পশ্চিমবঙ্গে খেলাধূলা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। ফুটবল ও ক্রিকেট এই রাজ্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় খেলাগুলির অন্যতম।এছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন ক্রীড়াক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে। বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়াবিদরা দেশ ও রাজ্যকে প্রভুত সম্মান এনেদিতে পেরেছেন। পশ্চিমবঙ্গে খেলাধুলাকে মূলত দুই ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি, যথা- ১) মূল ধারার খেলাধুলা, ২) গ্রাম্য খেলাধুলা।

১) মূল ধারার খেলাধুলাঃ- মূল ধারার খেলাধুলা বলতে বোঝায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত যে সমস্ত খেলাধুলা, এবং যেসব খেলাধুলাতে বর্তমানে পুঁজিবিনিয়োগ এবং গণমাধ্যমের দৃষ্টি থাকে সেই সমস্ত খেলাগুলি।পশ্চিমবঙ্গের নিরিখে ফুটবল, ক্রিকেট,হকি, কাবাডি, অ্যাথলেটিক্স,টেনিস,ব্যাডমিন্টন, বিভিন্ন অলিম্পিক খেলা ইত্যাদিকে মূলধারার মধ্যে ফেলা যেতে পারে।মনে রাখা প্রয়োজন পশ্চিমবঙ্গের খেলাধুলাকে কখনই বৃহত্তর ভারতের খেলাধুলার থেকে আলদা করে দেখা ঠিক হবে না। তাই ভারতে জনপ্রিয় এবং গুরুত্ব পাওয়া খেলাধুলাগুলি এখানেও জনপ্রিয় হয়েছে।পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে ক্রীড়ার সাথে ক্লাব ব্যাবস্থার গভীর যোগাযোগ আছে।

ফুটবলঃ

পশ্চিমবঙ্গে ফুটবল অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা।এই আন্তর্জাতিক খেলাটি বাংলার সংস্কৃতির সাথে অতপ্রত ভাবে জরিয়ে আছে।ক্লাব ব্যাবস্থার সহায়তায় ফুটবল এখানে অনেক উন্নতি করেছে। বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে গন জাগরণ এবং আত্মশক্তি বৃদ্ধিতে ফুটবল ছিল সহায়ক। স্বামী বিবেকানন্দ তাই ফুটবল খেলা কে গীতাপাঠের চেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য ও করনীয় বলেছিলেন। ১৯১১ সালে কলকাতার জনপ্রিয় ক্লাব মোহনবাগান ব্রিটিশদের ইস্ট ইয়র্কশায়ার কে হারিয়ে প্রথম ভারতীয় ক্লাব হিসেবে আই এফ এ শিল্ড জয়ের অসামান্য গৌরব অর্জন করেছিল।পাশাপাশি আরও বিভিন্ন ভারতীয় ক্লাব সেই সময় থেকে বাংলার ফুটবলের উন্নতির চেষ্টা চালিয়ে যায়।স্বাধীনতার পর মোহনবাগান যেমন তার অতীত গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখে এগিয়ে চলে, তেমনি পাশাপাশি তার চেয়ে কনিষ্ঠ সমসাময়িক মহামেডান ক্লাব, উয়ারি ক্লাব, ইস্টবেঙ্গল প্রভৃতি ক্লাব ফুটবলের আঙ্গিনায় নিজেদের গুরুত্ব বাড়াতে প্রয়াসী হয়। যদিও এই ক্লাবগুলি অন্যান্য খেলাধুলার ক্ষেত্রেও প্রয়াসী, তা সত্ত্বেও তাদের ফুটবল দলগুলি বাঙালীর আবেগ ও উদ্দীপনার সাথে জড়িত।

মোহনবাগান অ্যাথলেটিক্স ক্লাবঃ ১৮৮০-এর দশকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এই সময় ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের বিদ্রোহ ভারতীয়দের কল্পনাশক্তিকে জাগরিত করে তুলেছিল। এই আন্দোলনকে সাহায্য করার জন্য উত্তর কলকাতার মোহনবাগান অঞ্চলের মিত্র ও সেন পরিবারের সাহায্যে ভূপেন্দ্রনাথ বসু ১৮৮৯ সালের ১৫ অগস্ট ‘মোহনবাগান স্পোর্টিং ক্লাব’ প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে, মোহনবাগান ভিলায় ইডেন হিন্দু হোস্টেলের বিরুদ্ধে এই দল প্রথম খেলেছিল। প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর ঠিক আগে অধ্যাপক এফ. জে. রো জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, এই দল কোনো রাইফেল শ্যুটিং বা আংলিং বা এই জাতীয় খেলার সঙ্গে যুক্ত কিনা। মোহনবাগান এই জাতীয় খেলার সঙ্গে যুক্ত নয় জেনে তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন দলের নাম পালটে ‘মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব’ রাখতে। ক্লাবের কর্মকর্তারা এই পরামর্শ মেনে নিয়ে ক্লাবের নাম পরিবর্তন করেন।১৮৯১ সালে

কলকাতার শ্যামপুকুর অঞ্চলে এই দল চলে আসে। পরে এই দল উঠে যায় শ্যাম স্কোয়ার অঞ্চলে। ১৮৯৩ সালে মোহনবাগান কোচবিহার কাপে অংশগ্রহণ করে। এটিই ছিল ক্লাবের প্রথম টুর্নামেন্ট।১৯১১ সালে মোহনবাগান ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্টকে ২-১ গোলে পরাজিত করে প্রথম ভারতীয় দল হিসেবে আইএফএ শীল্ড জয় করে। দলের অধিনায়ক ছিলেন শিবদাস ভাদুড়ী। উল্লেখ্য, এই খেলায় মোহনবাগানের ফুটবলাররা খালি পায়ে খেলেছিল। অন্যদিকে ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্টের ফুটবলারদের যথোপযুক্ত পোশাক ছিল। মোহনবাগানের এই জয়টিকে ভারতের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা আখ্যা দেওয়া হয়।কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় এই জয় উপলক্ষে একটি জনপ্রিয় গান রচনা করেছিলেন। গানটি *মানসী* পত্রিকার সেপ্টেম্বর-অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই গানটির প্রথম কয়েক লাইন ছিল এই রকম:

> জেগেছে আজ দেশের ছেলে পথে লোকের ভিড়,
> অন্তঃপুরে ফুটল হাসি বঙ্গরূপসীর।
> গোল দিয়েছে গোরার গোলে বাঙালির আজ জিত,
> আকাশ ছেয়ে উঠছে উধাও উন্মাদনার গীত।
> আজকের এই বিজয়বাণী ভুলবে নাকো দেশ,
> সাবাশ সাবাশ মোহনবাগান! খেলেছ ভাই বেশ!

১৯৮৯ সালে ক্লাবের প্রতিষ্ঠা-শতবর্ষ উপলক্ষে ভারত সরকার ১৯১১ সালের এই জয়ের একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে।স্বাধীনতার পরে এই ক্লাব ফুটবলের উন্নতিতে সচেষ্ট হয়।তারা বিভিন্ন খেতাব জয় করে।১৯৪৭ সালে মোহনবাগান আবার আইএফএ শিল্ড জয় করে। এই জয়ের সঙ্গে সঙ্গে মোহনবাগান স্বাধীনতার পর প্রথম আইএফএ শিল্ড-জয়ী ভারতীয় দলে পরিণত হয়। এই বছর মোহনবাগান তার প্রধান প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে পরাজিত জয়ে কলকাতা ফুটবল লিগও জয় করেছিল। এরপর ১৯৫২ সালে মোহনবাগান আবার আইএফএ শিল্ড জেতে। ১৯৫৪ সালে এই দল পরপর আইএফএ শিল্ড ও ফার্স্ট ডিভিশন কলকাতা ফুটবল লিগ জয় করে কলকাতার দ্বিমুকুট পায়। মোহনবাগানই প্রথম এই কীর্তি স্থাপন করেছিল। ১৯৬০ সালে মোহনবাগান আবার দ্বিমুকুট পায়। ১৯৭৭ সালে মোহনবাগান পরপর আইএফএ শিল্ড, ডুরান্ড কাপ ও রোভার্স কাপ জয় করে ত্রিমুকুট পায়। এই দলই প্রথম ভারতীয় ত্রিমুকুট জয়ী দল হিসেবে ইতিহাস গঠন করে।

১৯৭৭ সালে মোহনবাগান বিখ্যাত নর্থ আমেরিকান সকার লিগ দল নিউ ইয়র্ক কসমসের বিরুদ্ধে একটি মৈত্রী ফুটবল ম্যাচ খেলে। এই ম্যাচে পেলে নিউ ইয়র্ক কসমসের হয়ে খেলেছিলেন। ইডেন গার্ডেন স্টেডিয়ামে আয়োজিত এই ম্যাচে ৮০,০০০ দর্শক এসেছিলেন। ম্যাচটি ২-২ গোলে ড্র হয় এবং তারকাসমন্বিত কসমসের খেলোয়াড়েরা মোহনবাগান খেলোয়াড়দের বিস্তর প্রশংসা করেন।

এরপর ১৯৭৭ সালে মোহনবাগান প্রথম ফেডারেশন কাপের ফাইনালে ওঠে। কিন্তু এই ম্যাচে তারা ইন্ডিয়ান টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রিজের কাজে ১-০ গোলে পরাজিত হয়। ১৯৭৮ সালে মোহনবাগান আবার এই টুর্নামেন্টের ফাইনালে ওঠে। কিন্তু এবার তাদের প্রধান প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গল কাপের সঙ্গে ট্রফি ভাগ করে নিতে হয়। ১৯৮০ সালে আবার মোহনবাগান ফেডারেশন কাপের ফাইনালে ওঠে। এই ম্যাচও তারা ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করে।পরের বছর, ১৯৮১ সালের ফেডারেশন কাপে তারা ফাইলানে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে.২-০ গোলে পরাজিত করে প্রথম এই কাপ জেতে। এক বছর পর ফ্ফৎলাল হিলসকে ১-০ গোলে পরাজিত করে মোহনবাগান আবার ফেডারেশন কাপ জেতে।১৯৮৬ সালে ইস্টবেঙ্গলকে ১-০ গোলে পরাজিত করে এবং ১৯৮৭ সালে সালগাঁওকর স্পোর্টিং

ক্লাবকে পরাজিত করে মোহনবাগান পরপর দুই বছর ফেডারেশন কাপ জেতে। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত পরপর তিন বছর ইস্টবেঙ্গল মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা ও সালগাঁওকর স্পোর্টিং ক্লাবকে যথাক্রমে ২-০, ১-০ ও ৩-০ গোলে পরাজিত করে মোহনবাগান তিনবার ফেডারেশন কাপ জেতে।

১৯৯৮ সালে মোহনবাগান প্রথম একসঙ্গে আইএফএ শিল্ড, ফেডারেশন কাপ ও জাতীয় ফুটবল লিগ জয় করে।২০০৭ সালে মোহনবাগান.৪-০ গোলে ডেম্পো স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়ে মোহনবাগান ইন্ডিয়ান সুপার কাপ জিতেছিল। ২০০৮ সালে মোহনবাগান জার্মান আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ পায়। এফসি বায়ার্ন মিউনিখের অফিসিয়াল টেস্টিমোনিয়ালে ছিলেন অলিভার কান। কান ছাড়াও জে রোবার্তো ও মার্ক ফন বোমেল বায়ার্ন দলে উপস্থিত ছিলেন। ২০০৮ সালের ২৭ মে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ম্যাচটি আয়োজিত হয়েছিল।

এই দল সর্বাধিকবার ফেডারেশন কাপ জয় করে, ২০১৫ সালে এরা আই লীগ জয় করেছে,২০১৬ সালে শেষবার ফেডারেশন কাপ জয় করে। ২০২০ সালে করোনা মহামারী জনিত কারণে আই লিগ অসমাপ্ত অবস্থায় বন্ধ হয়ে গেলেও পয়েন্ট এর বিচারে অন্য সকল দলের ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকার কারণে মোহনবাগান দলকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। জয়সূচক খেলাটি মোহনবাগান খেলেছিল কল্যানী স্টেডিয়ামে ১০ই মার্চ ২০২০ সালে আইজল এফ সি র বিরুদ্ধে, এবং ১-০ গোলে জয়লাভ করে মোহনবাগান।

ATK Mohunbagan/ Mohunbagan Supergiant:

২০১৩ সালের ১৩ই অক্টোবর AIFF এবং FSDL এর যৌথ উদ্যোগে ISL ফুটবল লিগ চালু হলে কলকাতা শহরের দল রূপে অ্যাটলেটিকো দি কলকাতা দলটি ২০১৪ সালের ৭ ই মে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের দল হিসাবে স্থাপিত হয়। দলটির নাম স্পেনীয় ফুটবল দল অ্যাটলেটিকো দি মাদ্রিদের অনুকরণে রাখা হয়েছিল। এই দলটি ২০১৪ ও ২০১৬ মরসুমে বিজয়ী হয়েছিল। পরবর্তী সময় দলটির নাম পরিবর্তন হয়ে ATK রাখা হয়। ATK ২০১৯-২০ মরসুমে বিজয়ী হয়েছিল। অতঃপর ২০২০ সালে দলটির মালিকপক্ষ মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাবের ফুটবল বিভাগের ৮০ শতাংশ মালিকানা অধিগ্রহণ করে নবগঠিত *এটিকে মোহনবাগান প্রাইভেট লিমিটেড*-এ অর্থ বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং এটিকে এফসির নিবন্ধ বাতিল করে এটিকে এফসির অবলুপ্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পাশাপাশি মোহনবাগান ক্লাবের আবেগের কথা মাথায় রেখে তাদের পতাকা, প্রতীক ও জার্সি গ্রহণ করে।

মোহনবাগানের সাথে ATK র এই সংযুক্তি বাংলা তথা ভারতীয় ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সংযুক্তি ক্রীড়াঐতিহ্যের সাথে আধুনিকতার সংমিশ্রণের সোপান বলা যায়। ফুটবলের উন্নতিকল্পে অর্থ বিনিয়োগ একটি বাস্তব ঘটনা, উন্নত ও প্রতিভাধর পেশাদার খেলোয়াড়দের জন্য উপযুক্ত বেতন ও পরিকাঠামো প্রয়োজন, সেই বাস্তবতাই একটি ঐতিহ্যশালী দল ও একটি আধুনিক দলের মিশ্রণের সোপান। ATK-Mohunbagan হিসেবে এই দল বর্তমানে ভারতের অন্যতম সেরা একটি দল এবং ২০২২-২৩ মরসুমের ISL বিজয়ী। তাছাড়া গুণমানে সেরা হবার কারণে বাংলার ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দল ইষ্টবেঙ্গল এর বিরুদ্ধে টানা আটবার মর্যাদাপূর্ণ ডার্বি জয় করেছে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক AFC Cup টুর্নামেন্টে দেশের প্রতিনিধিত্ব করছে। তবে সমর্থক দের আবেগ ও মোহনবাগান ক্লাবের ঐতিহ্যের কথা মাথায় রেখে এই দলের প্রধান কর্তা সঞ্জীব গোয়েঙ্কা মহাশয় দলের নাম বদলে Mohunbagan Supergiant রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যা ১লা জুন ২০২৩ থেকে কার্যকরী হয়েছে।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ভারতের কলকাতাস্থিত, শতবর্ষ প্রাচীন পেশাদার ফুটবল ক্লাব (প্রধানত), এছাড়াও অন্যান্য ক্রিয়া বিভাগে ক্লাবটি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালী ভাবাবেগকে প্রাধান্য দিয়ে ১৯২০ সালের ১লা আগষ্ট সুরেশচন্দ্র চৌধুরী জোড়াবাগানের নিমতলা ঘাট স্ট্রিটের তার বাড়িতে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২২ সালে ভারতীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে ১৯২৪ সালে কলকাতা ফুটবল লিগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ১৯৪২ সালে সর্বপ্রথম লীগ জয় লাভ করে এবং বর্তমানে *রেকর্ড সংখ্যক* ৩৯টি লীগ জয় করে শীর্ষ স্থান অধিকার করেছে। ইস্টবেঙ্গল জাতীয় লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং তিন বার জাতীয় লীগ জয় করেছে। এছাড়াও ৮ বার ফেডারেশন কাপ (ফেড কাপ), তিনবার সুপার কাপ, *রেকর্ড সংখ্যক* ২৯ বার আইএফএ শীল্ড ও *রেকর্ড সংখ্যক* ১৬ বার ডুরান্ড কাপ জয় করেছে।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব মূলত ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনের প্রাক্কালে দেশ ভাগের সময় পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু বাঙ্গালী হিন্দুদের (মূলত বাঙ্গাল নামে অধিক পরিচিত) সমর্থিত ক্লাব। তাদের কাছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব পরিচিতি ও আশার প্রতীক। পূর্ববঙ্গের শরণার্থীরা দেশভাগ ও ধর্মীয় অত্যাচারের কারণে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসলে পশ্চিমবঙ্গের আর্থ-সামাজিকতাতেও প্রভাব পরে। শরণার্থীরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরী ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদ অধীনস্থ করলে এবং তাদের সন্তানেরা পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হলে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা মনক্ষুণ্ন হয় এবং সেখান থেকেই বাঙাল-ঘটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়, যা ফুটবল মাঠেও ইস্টবেঙ্গল - মোহনবাগান প্রতিদ্বন্দ্বিতা (কলকাতা ডার্বি) বা *বড় ম্যাচ* হিসাবে প্রতিফলিত। কলকাতা ডার্বি এশিয়ার প্রাচীনতম ডার্বি এবং ইস্টবেঙ্গল জয়ের নিরিখে ১২৯টি ম্যাচে জয়লাভ করে মোহনবাগানের (১২১টি জয়) থেকে এগিয়ে রয়েছে। মোহনবাগান ছাড়াও মহামেডান ক্লাবের সাথেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। কলকাতার এই তিন ক্লাব *তিন প্রধান* নামে বেশি পরিচিত। ক্লাবের জার্সির *লাল-হলুদ* রঙের জন্য ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ***লাল - হলুদ ব্রিগেড*** *নামেও সমধিক পরিচিত।*

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুনামের সাথে অনেক প্রতিযোগিতা জয় করেছে। বর্তমানে ক্লাব টি শক্তিশালী ফুটবল দল তৈরি করতে না পারায়, তাদের অতীত গৌরব কিছুটা মলিন হলেও তারা ISL প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে, এবং শক্তিশালী দল তৈরির চেষ্টা করে যাচ্ছে। তবে মহিলা ফুটবল দল সদ্য কন্যাশ্রী কাপ (২০২২) জয় করেছে।

কলকাতা ডার্বি, হল মোহন বাগানের ও ইস্ট বেঙ্গলের মধ্যে ফুটবল ম্যাচ। এই দুই দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রায় ১০০ বছরের পুরানো, এবং ফিফা এর ক্লাসিক ডার্বি তালিকার বৈশিষ্ট যুক্ত। এই ম্যাচে মুখোমুখি দর্শকদের উপস্থিতি এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়।

ক্লাব দুটি বর্তমানে আই লীগে দুবার এবং কলকাতা ফুটবল লীগে একবারে কমপক্ষে ৩ বার ডার্বিতে অংশ নেয়। ফেডারেশন কাপ, আইএফএ শিল্ড, ডুরান্ড কাপ ইত্যাদি অন্যান্য প্রতিযোগিতায় প্রায়ই এই দুটি ক্লাবকে ডার্বিতে অংশ নিতে দেখা যায়।

উভয় দলেরই বিশ্বজুড়ে বিশাল এবং অনুরাগী ভক্ত রয়েছে। উভয় ক্লাব বাঙালি জনগোষ্ঠীর একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে, মোহন বাগান বাংলারপশ্চিমাংশ -এর বিদ্যমান লোকদের প্রতিনিধিত্ব করে (যারা ঘোঁটি নামে পরিচিত), যখন ইস্ট বেঙ্গলপ্রাথমিকভাবে বাংলার পূর্বাংশের লোকের দ্বারা সমর্থিত (যারা *বাঙাল* নামে পরিচিত)

সাংস্কৃতিকভাবে, এই ডার্বি স্কটিশ প্রিমিয়ার লিগ এর পুরাতন ফর্ম ডার্বির অনুরূপ, যেহেতু মোহন বাগানের সমর্থকরা বেশিরভাগ 'ন্যাটিভিস্ট' জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করে (রেঞ্জার্স

এফসি অনুরূপ) এবং বেশিরভাগ পূর্ববঙ্গের ভক্ত 'অভিবাসী' জনসংখ্যা (সেল্টিক এফসি এর অনুরূপ) প্রতিনিধিত্ব করে। যাইহোক, বাংলাদেশে মূলত অনেক মানুষই মোহন বাগানের সমর্থন করে, কারণ এটি ভারতের প্রাচীনতম ফুটবল ক্লাব। একইভাবে, পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু লোক পূর্ববাংলাকে সমর্থন করে বলে এটা ফুটবল ক্লাব অফ ইন্ডিয়া। সুতরাং ক্রস-জাতিগত সমর্থন বেস একটি অস্তিত্ব আছে।

১৯২০ সালে, জোড়া বাগানের ক্লাবটি মোহনবাগান এর বিরুদ্ধে মাঠে খেলেছিলেন, যারা তার তারকা খেলোয়াড় সাইলেশ বোস ছাড়াও ক্লাবের সহ-সভাপতি সুরেশ চন্দ্র চৌধুরীর উৎসাহ নিয়ে খেলেন। শিল্পপতির অসন্তোষের কারণে তিনি নতুন ক্লাব গঠনের সিদ্ধান্ত নেন এবং ইস্ট বেঙ্গল এর জন্ম হয়। চৌধুরী এবং তার সহ-প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পূব বঙ্গ বা ইস্ট বেঙ্গল থেকে যা বিশেষভাবে এখনকার আধুনিক যুগের বাংলাদেশ হয়ে উঠেছে, এই ক্লাবটি এখন সাধারণভাবে সেই অঞ্চল থেকে আসা মানুষদের দ্বারা সমর্থিত। এর ফলস্বরূপ ক্লাবগুলি দুটি ভিন্ন আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠী দ্বারা সমর্থিত ছিল, যদিও এটি বেশিরভাগ সময় সময়ের মধ্যে পরিবর্তিত হয়েছে। প্রথম কলকাতা ডার্বি ১৯২৫ সালে কলকাতা লীগে অনুষ্ঠিত হয়, যা ইস্ট বেঙ্গল জয় করে ১-০ গোলে।

প্রথমবার

১৯২৫-এ প্রথমবার দু'দল মুখোমুখি হয়েছিল। মোনা দত্তের নেতৃত্বে ১-০ ম্যাচ জিতেছিল ইস্টবেঙ্গল। একমাত্র গোলটি করে ইতিহাসে নাম লিখিয়ে ছিলেন নেপাল চক্রবর্তী।১৯৬০-এর দশকে মোহন বাগানের জন্য সুবর্ণ সময়টি প্রমাণিত হয়। ইতিমধ্যে লীগ জেতার পর, মোহন বগনের তারপর আইএফএ শিল্ড ফাইনাল তাদের নিজস্ব মাঠে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী পরাজিত করে ডবলে। ৩-১ গোলে উদ্দীপক কোচ অমল দত্তের নিয়োগে বিপ্লবী ৪-২-৪ গঠনের কৃতিত্ব অর্জন করেন।

৭০ এর দশক ও পি কে ব্যানার্জী

১৯৭০ দশক ইস্ট বেঙ্গলর দশক ছিল। ছয় বছর (১৯৭০ থেকে ১৯৭৫) মধ্যে তারা একটি ডার্বি হেরেছে মাত্র । ১৯৭৫ সালের আইএফএ শীল্ড এ লাল হলুদ দল ৫-০ গোলের রেকর্ডে জিতেছে এবং এটির সাথে, পাঁচটি শিল্ড জয়লাভের রেকর্ড করে । কোচ ছিলেন বিখ্যাত ভারতীয় ফুটবলার ও প্রাক্তন ইস্ট বেঙ্গল খেলোয়াড় প্রদীপ কুমার বন্দোপাধ্যায়। এই ধরনের হিংস্রতা ছিল বিশাল পরাজয়ের পার্শ্বে যে, বহুজন বাগানের খেলোয়াড়রা সমর্থকদের ক্রোধের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রাস্তায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়।

ইস্টবেঙ্গল ৫-০ মোহনবাগান, আইএফএ শিল্ড ফাইনাল ১৯৭৫

৯৭ বছরের ডার্বির ইতিহাসে ৭৫-এর শিল্ড ফাইনাল আজীবন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ছ'বছর পর শিল্ড ফাইনালে মধুর প্রতিশোধ নিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। ফাইনালে মোহনবাগানকে পাঁচ গোলের মালাই পরিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। কোনও দলের এখনও পর্যন্ত ডার্বিতে এটাই সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয়।ম্যাচের প্রথমার্ধেই ইস্টবেঙ্গল ৩-০ গোলে এগিয়ে গিয়েছিল। তাও আবার পেনাল্টি মিস করেই। সুরজিত সেনগুপ্ত, শ্যাম থাপা ও রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় স্কোরশিটে নাম লিখিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ার্ধেও ইস্টবেঙ্গলের আগুনে ফর্ম অব্যাহত ছিল। শ্যাম থাপা দ্বিতীয়ার্ধের ৫১ মিনিটে নিজের দু'নম্বর ও ম্যাচের চার নম্বর গোলটি করেছিলেন। ৮৪ মিনিটে শুভঙ্কর স্যান্নাল বাগানের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দিয়েছিলেন।

ইডেন গার্ডেন্সে ডার্বি

১৯৮০-র ১৬ অগস্ট ইডেন গার্ডেন্সে ডার্বি দেখতে এসে প্রান হারিয়েছিলেন ১৬ জন সমর্থক। ভারতীয় ফুটবলে যা কালাদিবস হিসেবেই গণ্য করা হয়।সেই দিন থেকে এটিকে ফুটবলপ্রেমী দিবস ও বলা হয়।

হীরের দর্প চূর্ণ

১৯৯৭ সালে ফেডারেশন কাপের সেমিফাইনালে অনেকগুলি রেকর্ডের মধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয় ডার্বি অনুষ্ঠিত হয়, যখন ১৩১,০০০ জন দর্শকের একটি অসাধারণ ভিড় - ভারতে যে কোনও খেলা জন্য একটি রেকর্ড উপস্থিতি - কলকাতার বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন ভরা। ফেডারেশন কাপের সেমিফাইনালে ৪-১ ব্যবধানে ইস্ট বেঙ্গ জয়ী হয় যা ভারতের সবচেয়ে স্বীকৃত ফুটবলার বাইচুং ভুটিয়া কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নিয়ে যায়।

ইস্টবেঙ্গল ৪-১ মোহনবাগান, সেমিফাইনাল, ফেডারেশন কাপ ১৯৯৭

১৯৯৭-এর ১৩ জুলাই ফেডারেশন কাপের সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান। এই ম্যাচ দেখতে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এসেছিলেন ১ লক্ষ ৩১ হাজার দর্শক। যা এখনও পর্যন্ত রেকর্ড। বাইচুং ভুটিয়ার হ্যাটট্রিকে মোহনবাগানকে ৪-১ হারিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। মোহনবাগানের হয়ে একমাত্র গোলটি করেছিলেন চিমা ওকোরি। সেসময় নতুন ডায়মন্ড সিস্টেম নিয়ে অমল দত্ত পরীক্ষা নীরিক্ষা করছিলেন। বিপক্ষের বক্সে আক্রমণের ঝড় তুলছিলেন বাগানের ফুটবলাররা। এমনকী অমল দত্ত ম্যাচের আগে থেকেই মাইন্ড গেমও শুরু করে দিয়েছিলেন। যদিও লাল হলুদ কোচ পিকে বন্দ্যোপাধ্যায় এসব নিয়ে কোনও মাথাই ঘামাননি। ম্যান ম্যানেজমেন্টের মাস্টার ছিলেন তিনি। দলের পারফরম্যান্সে অাগুন জ্বালাতে জানতেন ধুরন্ধর পিকে। যুযুধান দুই কোচের মস্তিষ্কের লড়াইয়ে শেষ হাসি তিনিই হেসেছিলেন।

মোহনবাগান ৫-৩ ইস্টবেঙ্গল, আই-লিগ ২০০৯

৭৫-এর আইএফএ শিল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের কাছে পাঁচ গোলে হেরেই মাথা নীচু করে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল মোহনবাগানকে। ৩৪ বছর ধরে বাগান সমর্থকদের সেই যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে মুখ বুজেই। ইস্টবেঙ্গল সুযোগ পেলেই হাতের পাঁচ আঙুল দেখিয়েই মোহনবাগানিদের ব্রিদ্রুপ করত। কিন্তু ২০০৯-এ এর উত্তর দিয়েছিল মোহনবাগান। ১৯৭৫ এর ৫-০ র বদলা ৫-৩ এ নিয়েছিল মোহনবাগান। এই ম্যাচে একাই শেষ করে দিয়েছিলেন চিডি এডে। চার গোল করেছিলেন তিনি। ২৫ অক্টোবর যুবভারতীতে আরও একটা নজির গড়েছিলেন এই নাইজেরিয়ান স্ট্রাইকার। একমাত্র বিদেশি ফুটবলার হিসেবে ডার্বিতে হ্যাটট্রিক করেছিলেন তিনি। পাশাপাশি কোনও ডার্বিতে সর্বোচ্চ গোল করারও নজির গড়েন তিনি। এই ম্যাচের ৯ মিনিটে শিল্টন পালের ভুলেই প্রথমে বাগান গোল হজম করেছিল। নির্মল ছেত্রীর ফ্লাইট বুঝত পারেননি শিল্টন।এরপর চিডি সমতা ফেরান। মণীশ মাথানির গোলে স্কোরলাইন ২-১ হয়েছিল। এরপর ব্যারেটোর মাপা ক্রস থেকেই চিডি নিজের দু নম্বর ও দলের হয়ে তিন নম্বর গোলটা করেছিলেন। রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করেছিল ইস্টবেঙ্গল। প্রথমার্ধের আগেই ইয়াসুফ ইয়াকুবু বাগানের দুর্বল রক্ষণের সুযোগ নিয়ে জোড়া গোল করে স্কোরলাইন ৩-৩ করেন। দ্বিতীয়ার্ধেও চিডি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি ফুরিয়ে যাননি। আরও দুটি গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে ম্যাচ থেকে ছিটকে দিয়েছিলেন।

আই এস এল ডার্বিঃ এটিকে মোহনবাগান হিসেবে গঠিত হবার পর কলকাতা ডার্বি দুর্ভাগ্যজনক একপেশে খেলায় পরিণত হয়েছে। ইস্টবেঙ্গল এর দুর্বলতর দল পর পর আটটি খেলাতে পরাজিত হয়েছে। ২০২০ সাল থেকে ডার্বিতে মোহনবাগান অপরাজিত রয়েছে। সর্বশেষ খেলায় এটিকে মোহনবাগান ২-০ গোলে ইস্টবেঙ্গলকে পরাস্ত করে ২৫শে

ফেব্রুয়ারী ২০২৩ তারিখে। সেটা তাদের সমর্থকদের কাছে আনন্দের এবং ইস্ট বেঙ্গল সমর্থকদের দুঃখের কারণ হয়েছে। এটিকে মোহনবাগান ডার্বিতে অপরাজেয় হিসেবে তাদের যাত্রা শেষ করছে, পরবর্তীতে মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট, ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ হিসেবে ডার্বিতে অবতীর্ণ হবে।

এই ডার্বিকে ঘিরে বাংলার মানুষের মধ্যে প্রবল উন্মাদনা দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির সাথে এটি ওতপ্রত ভাবে জরিয়ে গেছে। তাই বাঙ্গালির ক্রীড়া ইতিহাসে কলকাতা ডার্বির গুরুত্ব অপরিসীম। ডার্বিকে কেন্দ্র করে আলাদা খাওয়া দাওয়া, সংগীত। সর্বোপরি সুস্থ প্রতিযোগিতার মানসিকতা বাংলার সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে।

ক্রিকেটঃ-

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো পশ্চিমবঙ্গেও ক্রিকেট অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। ভারতের বৃহত্তম ক্রিকেট স্টেডিয়াম ইডেন গার্ডেনস স্টেডিয়াম কলকাতায় অবস্থিত। এই স্টেডিয়ামের এক লক্ষেরও বেশি দর্শক খেলা দেখতে পারেন। বিশ্বে যে দু'টি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এক লক্ষ আসন রয়েছে, ইডেন গার্ডেনস তার অন্যতম। ইডেন গার্ডেনস পূর্বাঞ্চল ও বাংলা ক্রিকেট দলের কার্যালয়। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের কলকাতা নাইট রাইডার্স দলের কার্যালয়ও কলকাতায়। শাহরুখ খানের মালিকানাধীন এই দলটি ইডেন গার্ডেনকে নিজস্ব হোম টার্ফ হিসেবে ব্যবহার করে। ক্যালকাটা ক্রিকেট অ্যান্ড ফুটবল ক্লাব হল বিশ্বের দ্বিতীয় প্রাচীনতম ক্রিকেট ক্লাব।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার এবং ভারতীয় জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক।সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন ৮ই জুলাই, ১৯৭২ সালে, কলকাতার বেহালায় একটি প্রতিষ্ঠিত পরিবারে। তাঁর বাবার নাম চণ্ডীদাস গঙ্গোপাধ্যায় ও মাতার নাম নিরুপা গঙ্গোপাধ্যায়। বাঁহাতি ক্রিকেটার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় অদ্যাবধি ভারতের অন্যতম সফল অধিনায়ক বলে বিবেচিত হন; তার অধিনায়কত্বে ভারত ৪৯টি টেস্ট ম্যাচের মধ্যে ২১টি ম্যাচে জয়লাভ করে। ২০০৩ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপে তাঁর অধিনায়কত্বেই ভারত ফাইনালে পৌঁছে যায়। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কেবলমাত্র একজন আগ্রাসী মনোভাবাপন্ন অধিনায়কই ছিলেন না, তাঁর অধীনে যে সকল তরুণ ক্রিকেটারেরা খেলতেন, তাঁদের কেরিয়ারের উন্নতিকল্পেও তিনি প্রভূত সহায়তা করতেন।

একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ক্রিকেটার। একদিনের ক্রিকেটে তাঁর মোট রানসংখ্যা এগারো হাজারেরও বেশি। একদিনের ক্রিকেটে তাঁর সাফল্য সত্ত্বেও ক্যারিয়ারের শেষদিকে একদিনের ক্রিকেটে তাঁর স্থলে দলে তরুণ ক্রিকেটারদের নেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। ২০০৮ সালের ৭ অক্টোবর সৌরভ ঘোষণা করেন যে সেই মাসে শুরু হতে চলা টেস্ট সিরিজটিই হবে তাঁর জীবনের সর্বশেষ টেস্ট সিরিজ। ২০০৮ সালের ২১ অক্টোবর সৌরভ তাঁর সর্বশেষ প্রথম-সারির ক্রিকেট ম্যাচটি খেলেন।[

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় হলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের একজন বিখ্যাত ক্রিকেটার ও প্রাক্তন অধিনায়ক।

তিনি প্রথম জীবনে স্কুল ও রাজ্যের হয়ে ক্রিকেট খেলা শুরু করেন ক্রিকেট জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য পেতে থাকেন তিনি। তিনি তাঁর জীবনের প্রথম একদিনের আন্তজার্তিক ম্যাচ খেলেন ১১ই জানুয়ারী, ১৯৯২ সালে। কিন্তু তিনি সেই অভিষেক ম্যাচে মাত্র তিন (৩) রান করেন, যার ফলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে দল থেকে বাদ পড়েন। তার পরে ১৯৯৩-১৯৯৪ এবং ১৯৯৪-১৯৯৫ সালের রঞ্জি ট্রফিতে চমৎকার সাফল্য লাভ করেন যার ফলে তিনি আবার

১৯৯৬-এর ইংল্যান্ড সফরের জন্য খেলার সুযোগ পান। এরপরে সেই সফরেই তিনি তার জীবনের প্রথম টেষ্ট খেলেন ২০ই জুন, ১৯৯৬ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। তিনি সেই সফরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

তিনি শুধু একজন খেলোয়াড়ই নন, একজন বিখ্যাত অধিনায়কও ছিলেন। তিনি তাঁর ক্রিকেট জীবনে সর্বমোট ৩১১টি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন এবং ১১,৩৬৩ রান সংগ্রহ করেছেন। পাশাপাশি তিনি ১১৩টি টেস্ট খেলেছেন ও ৭,২১২ রান সংগ্রহ করেছেন। ভারতকে তিনি ৪৯টি টেস্ট ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যার মধ্যে ভারত জিতেছিল ২১টি ম্যাচে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ভারতকে ১৪৬টি একদিনের আন্তজার্তিক ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যার মধ্যে ভারত জিতেছিল ৭৬ টি ম্যাচে। তিনি ভারতের একজন মিডিয়াম পেসার বোলারও ছিলেন। তিনি একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১০০টি এবং টেস্টে ৩২টি উইকেট দখল করেন। এছাড়া তিনি একদিনের আন্তর্জাতিকে ১০০টি ও টেস্টে ৭১টি ক্যাচ নিয়েছেন।

২০০৮ সালের অক্টোবর মাসে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলার পর তিনি ক্রিকেট থেকে অবসর নেন। এরপরে ২০০৮, ২০০৯ ও ২০১০-এ আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলেন এবং ২০০৮ ও ২০১০-এ এই দলকে নেতৃত্ব দেন। ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত আইপিএলের চতুর্থ সিজনে নিলামে তিনি অবিক্রীত থেকে গেলেও শেষ পর্যন্ত পুনে ওয়ারিয়র্সের দলের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি ক্রিকেট প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। প্রবাদপ্রতিম ক্রীড়া প্রশাসক জগমোহন ডালমিয়ার প্রয়াণের পর তিনি Cricket Association of Bengal এর সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি ২০১৯-২০২২ অবধি BCCI সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি দিল্লি ক্যাপিটালের মেন্টর।

এছাড়া খো খো, ড্যাং গুলি, কাবাডি প্রভৃতি গ্রাম্য খেলাধুলা খুবই জনপ্রিয়। এছাড়া অ্যাথলেটিক্স পশ্চিমবঙ্গে খুবই জনপ্রিয়। বর্তমানকালে তিরন্দাজি,রাইফেল শুটিং, জিমন্যস্টিক প্রভৃতি অলিম্পিক খেলাতেও পশ্চিমবঙ্গ অনেক সুনাম অর্জন করেছে। বিশ্বের প্রাচীনতম পোলো ক্লাব ক্যালকাটা পোলো ক্লাব কলকাতাতেই অবস্থিত। ক্যালকাটা পোলো ক্লাব কলকাতায় অবস্থিত একটি পোলো ক্লাব। ১৮৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত এই পোলো ক্লাবটিকে বিশ্বের অদ্যাবধি বর্তমান পোলো ক্লাবগুলির মধ্যে প্রাচীনতম বলে মনে করা হয়।

পোলো খেলার জন্ম ভারতের মণিপুরে। এই অঞ্চলে 'সাগোল কাংজেই' নামে একটি খেলা প্রচলিত ছিল। এই খেলার অপর নাম ছিল 'কাঞ্জাই-বাজী' বা 'পুলু'। ব্রিটিশরা এই খেলাটিকে নিয়মায়িত ও জনপ্রিয় করে তোলেন। তাঁরা এই খেলায় কাঠের বল প্রবর্তন করেন। ইংরেজিকৃত এই খেলাটিই ধীরে ধীরে সমগ্র পাশ্চাত্য বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

১৮৬২ সালে মণিপুরের ওই খেলায় অনুপ্রেরিত হয়ে ক্যাপ্টেন রবার্ট স্টিউয়ার্ট ও মেজর জেনারেল জো শেয়ারার নামে দুই ব্রিটিশ সেনা আধিকারিক ক্যালকাটা পোলো ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। পরে ইংল্যান্ডের অভিজাত সমাজে তাঁরা এই খেলার প্রবর্তন করেছিলেন।

ক্যালকাটা পোলো ক্লাব প্রাচীনতম পোলো ট্রফি এজরা কাপ (১৮৮০) চালু করার গৌরবের অধিকারী। পাশাপাশি এই ক্লাব কারমাইকেল কাপ (১৯১০) ও স্টিউয়ার্ট কাপও চালু করেছিল। প্রথম দিকে ভারতের বিভিন্ন রাজবংশগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ আয়োজিত হত।

কিছুকাল বন্ধ থাকার পর ২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ক্যালকাটা পোলো ক্লাব বিএফএল কর্পোরেশন পোলো সিজন নামে দুই-সপ্তাহব্যাপী পোলো টুর্নামেন্টের পুনরায় আয়োজন শুরু করে। এই টুর্নামেন্ট জয়পুরের রাজমাতা গায়ত্রী দেবী, বিভিন্ন বলিউড ও টলিউড ব্যক্তিত্ব এবং কর্পোরেট ও বিনোদন দুনিয়ার নানা ব্যক্তিত্বকে আকর্ষিত করেছে।

পশ্চিমবঙ্গে একাধিক সুবৃহৎ স্টেডিয়াম অবস্থিত। সারা বিশ্বে যে দুটি মাত্র লক্ষ-আসন বিশিষ্ট ক্রিকেট স্টেডিয়াম রয়েছে কলকাতার ইডেন গার্ডেনস তার অন্যতম। অন্যদিকে বিধাননগরের বহুমুখী স্টেডিয়াম বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ফুটবল স্টেডিয়াম। ২০১৭ সালে এই স্টেডিয়ামে অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়। ক্যালকাটা ক্রিকেট অ্যান্ড ফুটবল ক্লাব বিশ্বের দ্বিতীয় প্রাচীনতম ফুটবল ক্লাব। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয় দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি ও খড়গপুর শহরেও। পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্বেরা হলেন প্রাক্তন জাতীয় ক্রিকেট অধিনায়ক তালিকা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, অলিম্পিক টেনিস ব্রোঞ্জ পদকজয়ী লিয়েন্ডার পেজ, দাবা আন্তর্জাতিক গ্র্যান্ডমাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া প্রমুখ। আবার অতীতের খ্যাতমানা ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফুটবলার চুনী গোস্বামী, পি কে বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন মান্না, সাঁতারু মিহির সেন, অ্যাথলেট জ্যোতির্ময়ী শিকদারপ্রমুখ। পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে প্রচুর সাংস্কৃতিক সংস্থা। কলকাতার জোকায় রয়েছে বাংলার ব্রতচারী সমিতি। ব্রতচারী কেন্দ্রীয় নায়কমন্ডলী, কবি সুকান্তের কিশোর বাহিনী, সব পেয়েছির আসর, মনিমেলা মহাকেন্দ্র ইত্যাদি শিশু কিশোর সংস্থা।

Source: Wikipedia and other relevant links.

২১১. ৬.১৬.৪ উপসংহার

এইভাবে দেখা গেল যে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৪৭ এর পরেও সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলাধুলার ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। যার ফলে সাংস্কৃতিক দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের গৌরব অনেক উচ্চে উঠেছে।

২১১. ৬.১৬.৫ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১) সন্দীপ দত্ত; সুভাষ মুখোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য; র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা; অক্টোবর, ২০০২।

২) *বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস,* ক্ষেত্র গুপ্ত, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, ২০০১।

৩) Neumann P, "Biography for Satyajit Ray"।

২১১. ৬.১৬.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১) স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে কি জান?

২) স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গের নাট্যচর্চা আলোচনা কর।

৩) পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমীর অবদান আলোচনা কর।

৪) কলকাতা ডার্বির গুরুত্ব কি?